মধু ও হুল

মধু ও হুল

শ্রীসজনীকান্ত দাস

রঞ্জন পাব্‌লিশিং হাউস
২৫।২ মোহনবাগান রো
কলিকাতা

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন ১৩৩৮

পরিবর্ধিত সংস্করণ—অগ্রহায়ণ ১৩৫৩

মূল্য আড়াই টাকা

শনিরঞ্জন প্রেস

২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা হইতে

শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

১১—২০. ১১. ৪৬

বাংলা সাহিত্যে 'শনিবারের চিঠি'র আবির্ভাব একটি স্মরণীয় ঘটনা। প্রথমে সপ্তাহে সপ্তাহে, তাহার পর মাসের পর মাস এই ক্ষুৎপীড়িত বঙ্গদেশে 'শনিবারের চিঠি' রসের জোগান দিয়া আসিয়াছে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থে খানিকটা রস ভাণ্ডস্থ করিয়াছেন।

রচনাগুলির প্রায় সবগুলিই সাময়িক ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় লেখা।

শ্লেষ ও ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে রচিত হইলেও কোনও কোনও রচনায় অট্টহাস্যের সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদও ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে, শ্রবণশক্তি-সমন্বিত যে-কোনও পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন। লেখক বিদ্রূপ করিয়াছেন, কিন্তু কোথাও নির্মম হইতে পারেন নাই।

অহিংস ও নিরুপদ্রব হাস্যরসে ওতপ্রোত, সাময়িক ঘটনার সম্পর্কবিহীন যে রচনাগুলি ইহাতে স্থান পাইয়াছে তাহাদের সমবায়ে একখানি বিশুদ্ধ কথাগ্রন্থ রচিত হইতে পারিত, গ্রন্থকার অতিবিনয়বশতই সম্ভবত তাহা করেন নাই। এমন রচনাও আছে যাহাকে একটু ফেনাইয়া বিংশ পরিচ্ছেদ-সংযুক্ত একটি উপন্যাসে পরিণত করা চলিতে পারে, কিন্তু অসাধারণ সংযমের সহিত গ্রন্থকার তাহাকে পাঁচ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত করিয়া দিয়াছেন।

বিদ্রূপ করিয়া থাকি বটে, কিন্তু তথাপি বাঙলা দেশের

পাঠকসাধারণের রুচির প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে। যে-দেশে কমলাকান্ত মরিয়াও মরেন নাই, সে-দেশে মধু ও হুলের আস্বাদ পর্যায়ক্রমে উপভোগ করিবার মত ক্ষমতাশালী পাঠকের অভাব হইবে না বলিয়াই আমার বিশ্বাস। আশ্বিন, ১৩৩৮ সাল

শ্রীদিবাকর শর্ম্মা
(রবীন্দ্রনাথ মৈত্র)

সূচীপত্র

রোহিণী

প্রেসিডেন্সি কলেজের বঙ্কিম-শরৎ-সমিতিতে শরৎচন্দ্রের ত্রিপঞ্চাশৎ জন্মদিনে তাঁহার প্রদত্ত বক্তৃতা পড়িতে পড়িতে ভাবিতেছিলাম, পঁচিশ, পঁয়তাল্লিশ, পঞ্চাশ গেল,—হঠাৎ তিপ্পান্ন বছরে এই কাণ্ডটি ঘটিবার মানে কি ? একবার ভাবিলাম, যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন—সম্ভবত এই ভাবটা ইহার মূলে ছিল, কিন্তু ব্যাখ্যাটা তেমন মনঃপূত হইল না। বুদ্ধির গোড়ায় একটু চুরুটের ধোঁয়া লাগাইতেই বুদ্ধিটা খোলতাই হইল, স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম, এটা পঞ্চাশৎ জন্মোৎসবই বটে, কিন্তু গাফিলতি করিয়া শরৎচন্দ্রের ভক্তেরা ব্যাপারটা দুই বৎসর ফেলিয়া রাখেন ; এই বৎসরে তিন বৎসর বাকি পড়িলেই জন্মোৎসব তামাদি হইবার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া তাড়াতাড়ি একটা কাজ-চলাগোছ উৎসব হইয়া গেল।

যাক, শরৎচন্দ্রের বক্তৃতা পড়িতেছিলাম। বক্তৃতাটি 'ভাল' লাগিতেই মনটাকে চাঙ্গা করিয়া লইবার জন্য ভাদ্রের (১৩৩৫) 'কালি কলম'-এ প্রকাশিত মামা সুরেন্দ্রনাথের "ভেলি"-নিবন্ধে অশীতিপর ভেলি (শরৎচন্দ্রের কুকুর) কেমন করিয়া তরুণী টেপীর সহিত কোর্টশিপ করিয়া সফলকাম হইল ও ফলে—যাক। বাচ্চাগুলি যে ভেলির নয়, এ বিষয়ে 'কথা-সাহিত্য-কুশল অপ্রস্তুত' শরৎচন্দ্রের তীব্র প্রতিবাদ ও নিরীহ 'ওদের বাড়ীর কুকুরের' প্রতি দোষারোপ, (বাচ্চাদের খোরপোষের দাবির জন্য নয় তো ?) ভেলিকে 'শুদ্ধ সাত্ত্বিক ব্রহ্মচর্য্যব্রতী দেখিতে' তাঁহার 'সাধ' ইত্যাদি পড়িয়া লইতেছিলাম। হঠাৎ শরৎচন্দ্রের বক্তৃতার একটা জায়গা বেশ 'ইণ্টারেষ্টিং' লাগিল—'আমাদের (বঙ্কিম

ও আমার) লেখা আলোচনার জন্য এই যে সমিতি' ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম।

হঠাৎ দেখি, কাঁঠালপাড়ার বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের বৈঠকখানায় বসিয়া আছি। বৃদ্ধ বঙ্কিম তাকিয়া ঠেসান দিয়া গড়গড়ায় তামাক টানিতে টানিতে একখানা বই পড়িতেছেন। তাঁহার সম্মুখে প্রবীণ শরৎচন্দ্র বসিয়া। শরৎচন্দ্রের বেশ একটু চঞ্চল ভাব। বুঝিলাম, তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের খাস গয়া হইতে আমদানি অম্বুরী তামাকের গন্ধে লোলুপ হইয়া উঠিয়াছেন, কিন্তু বঙ্কিমের কাছ হইতে তামাকু-প্রার্থনাটা অনুচিত বিবেচনায় তাঁহার খুব কাছ ঘেঁষিয়া তৎপরিত্যক্ত ধোঁয়া আঘ্রাণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। বঙ্কিমের গা ঘেঁষিয়া একটি বিড়াল বসিয়া। বেশ নাদুস-নুদুস গোলগাল চেহারা। উপন্যাসলব্ধ অর্থের কিঞ্চিৎ ইহার চর্বি-মাংসে পরিণত হইয়াছে নিশ্চয়ই। কমলাকান্তের মার্জারের কথা মনে পড়িল।

বঙ্কিম কিন্তু শরৎচন্দ্রকে লক্ষ্য করিতেছিলেন না, তিনি হস্তস্থিত পুস্তকে একেবারে যেন ডুবিয়া ছিলেন। গলা উঁচু করিয়া দেখি, অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে'। বইখানি পড়িতে পড়িতে বঙ্কিমের মুখমণ্ডলের মাংসপেশী কখনও কুঞ্চিত, কখনও বিস্তৃত হইতেছিল। বুঝিলাম, বঙ্কিম রসে একেবারে মজিয়া গিয়াছেন। এক জায়গায় তাঁহার উত্তেজনা এত অধিক হইল যে, তিনি আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া হাতীর দাঁতের কাগজ-কাটাটি লইয়া বইয়ের পাতায় চিহ্ন দিয়া সোজা হইয়া বসিলেন এবং হঠাৎ বলিলেন, অদ্ভুত লেখা, আমার বইগুলো আর চলল না দেখছি। তারপর ভৃত্য ভজহরিকে ডাকিয়া তাঁহার হাতবাক্সটা আনিতে হুকুম করিলেন ও চোখ বুজিয়া তামাক টানিতে লাগিলেন। আমার রাগ হইল। শরৎচন্দ্রের মত অতিথি ঘরে, অথচ তিনি আমলই

দিতেছেন না, আবার অচিন্ত্য সেনের লেখা পড়িয়া তাহার চিন্তায় অস্থির হইতেছেন! বঙ্কিমচন্দ্রও তরুণ হইয়া গেলেন নাকি!

ভজহরি হাতবাক্স আনিতেই বঙ্কিম গেঞ্জির তলা হইতে পৈতা বাহির করিয়া তাহাতে বাঁধা চাবি দিয়া হাতবাক্স খুলিলেন ও বইখানি তাহাতে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিয়া বলিলেন, বইখানা ভাল, কিন্তু বাইরে রাখবার জো নেই, ছেলেপিলের ঘর কিনা! তারপর হঠাৎ শরৎচন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমিও লেখ বলছিলে না? তুমি কি মাসিক-পত্রের সম্পাদক, লেখা চাও? আমি বাপু, লেখা-টেখা ছেড়ে দিয়েছি। এদের লেখা পড়া অবধি নিজের লেখার ওপর ঘেন্না ধ'রে গেছে।

শরৎচন্দ্র মাথা চুলকাইয়া বলিলেন, আজ্ঞে না, আমি সম্পাদক নই, তবে একটু-আধটু লিখে থাকি।

কি লেখ? প্রবন্ধ, কবিতা? হ্যাঁ হে, দেবেন ঠাকুরের সেই ছেলেটির কি হ'ল বলতে পার? ছোকরা কবিতা লিখত ভাল। তার কি একটা বই প'ড়ে ভারি খুশি হয়েছিলাম। মনে পড়েছে—সন্ধ্যাসঙ্গীত। তবে ছোকরা আমাকে আর চন্দ্রনাথকে বড্ড জ্বালাতন করেছিল। সে বেঁচে আছে তো?

শরৎচন্দ্র একটু নড়িয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিলেন, রবিবাবুর কথা জিজ্ঞেস করছেন? তাঁর খ্যাতি এখন জগদ্ব্যাপী। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, গান, প্রবন্ধ, বক্তৃতা সবেই তিনি অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

বঙ্কিম হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, দেশটা এখনও বদলায় নি দেখছি। থাক্‌গে, তুমি কি লেখ বললে?

আজ্ঞে, গল্প উপন্যাস। এই আপনাদেরই পায়ের ধুলো নিয়ে—

বেশ বেশ, বই কাটে তো?

আজ্ঞে, আমার একটা বইয়ের ষোলোটা সংস্করণ হয়েছে।

বটে, আমার কোন্ বই থেকে চুরি করেছ?

শরৎচন্দ্র চটিলেন, বলিলেন, আমার লেখা আপনি পড়েন নি বুঝি?

না বাপু।

আজ্ঞে, আজ তবে উঠি, এক সেট বই নিয়ে কাল আবার আসব।

বেশ বেশ, বড় হরপে ছাপা বই এনো, ছোট অক্ষরগুলো আমি পড়তে পারি না। তিনি আবার পৈতা বাহির করিয়া হাতবাক্স খুলিলেন। বুঝিলাম, আজ আর সুবিধা হইবে না। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমিও উঠিলাম। আমাদিগকে উঠিতে দেখিয়া বঙ্কিমের বিড়ালটি উঠিয়া ধনুকের মত পিঠ ফুলাইয়া মিউমিউ করিতে লাগিল। বঙ্কিমচন্দ্র হাঁকিলেন, রোহিণী, চুপ ক'রে ব'স্।

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বাহির হইয়া তাঁহারই সঙ্গে গুরুদাস চাটুজ্জের দোকান পর্যন্ত গেলাম। শরৎচন্দ্র সেখানে বই পাইলেন না; জবাব পাইলেন, হিসাব দেখা হয় নাই। ক্রোধে গরগর করিতে করিতে তিনি একেবারে 'বসুমতী' আপিসে গেলেন। সেখানে কমিশন-বাদ নগদমূল্যে তাঁহার উপন্যাস-গ্রন্থাবলী ক্রয় করিয়া গোলদিঘিতে আসিয়া পুঁটি ময়রার দোকানে শিঙ্গাড়া-কচুরি খাইলেন ও মির্জাপুর স্ট্রীটের দা-ঠাকুরের হোটেলে রাত্রিবাস করিলেন।

পরদিন বেলা একটার সময় উভয়েই কাঁঠালপাড়া গেলাম। দেখিলাম, বঙ্কিমচন্দ্র বৈঠকখানায় একা বসিয়া তর্জন-গর্জন করিতেছেন, আমার বই কে নিয়ে গেল? খড়ম-পেটা করব, খুন করব, গুলি করব ইত্যাদি আস্ফালন-বাক্য যেন পার্শ্বশায়িত বিড়ালটির উপরই প্রয়োগ করা হইতেছে। আমাদের ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া অভিবাদন পর্যন্ত করিলেন না। ক্ষণকাল পরে তাঁহার দৌহিত্র আসিয়া খবর দিল যে, বামনী রামমণি রান্নাঘরে লুকাইয়া বই পড়িতেছে—নিশ্চয়ই তাঁহার বই।

বঙ্কিম গর্জন করিতে করিতে উঠিয়া গেলেন। আমি ও শরৎচন্দ্র পরস্পর মুখ-তাকাতাকি করিতে লাগিলাম।

কিছুক্ষণ পরে বঙ্কিম একটি আধা-যুবতী রমণীর ঝুঁটি ধরিয়া সেখানে উপস্থিত। আমাদের লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, দেখেছেন মশায়, যা বারণ করি, তাই করবে! তুই বিধবা মাগী, তুই পড়বি 'বেদে'—এই বই প'ড়ে আমরা হালে পানি পাই না! বুড়ো বয়স পর্যন্ত হাকিমি ক'রে এলাম, বিষবৃক্ষ' লিখলাম, তাতেও হার মেনেছি, আর তুই তো রাঁধিস শুক্তো আর শাকচচ্চড়ি, তুই পড়বি এই বই! বেরো বাড়ি থেকে।

রামমণি চোখে কাপড় দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ছোটমা পড়ছিলেন যে!

কে, ছোটগিন্নী? ভজহরি!

বুঝিলাম, ব্যাপার সুবিধার নহে। শরৎচন্দ্রের গা টিপিলাম, এবং বঙ্কিমের অজ্ঞাতসারে দুইজনেই বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। তাড়াতাড়িতে শরৎচন্দ্র তাঁহার উপন্যাস-গ্রন্থাবলীটি ফরাশের উপর ফেলিয়া আসিলেন।

ঘণ্টাখানেক পরে রেল-স্টেশনের মেঠাইওয়ালাদের কৃপায় উদরপূর্তি করিয়া পুনরায় বঙ্কিমের বৈঠকখানায় দর্শন দিলাম। এইবার বঙ্কিমের মূর্তি দেখিয়া সত্যই ভয় হইল—ভীষণ গম্ভীর মূর্তি। সামনে শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর শেষ পৃষ্ঠা খোলা, তাহাতে বসুমতী-সাহিত্য-মন্দিরের বিজ্ঞাপন দেওয়া আছে। বঙ্কিম শরৎচন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন, এই যে সাহিত্য-সম্রাট মশায়, কি মনে ক'রে? বেটাদের জেলে দেওয়া উচিত।

হিতে বিপরীত হইল দেখিয়া শরৎচন্দ্র এতটুকু হইয়া গেলেন। বলিলেন, আজ্ঞে এরগোপি ক্রমায়তে, আপনারা নেই, তাই এই অধমকেই—

বঙ্কিমচন্দ্র খুশি হইলেন। বলিলেন, ব'স ব'স। বিদ্যাসাগরের নাতি সেই সুরেশ কেমন আছে? ছোকরা বেশ রসিক।

এমন সময়ে বঙ্কিমের বিড়ালটি হঠাৎ কি ভাবিয়া বঙ্কিমের পিঠে দুই পা তুলিয়া দিয়া মিউমিউ করিতে লাগিল।

বঙ্কিম বলিলেন, রোহিণী, কি হয়েছে রে?

রোহিণী! বিড়ালের নাম!

শরৎচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ওর নাম রোহিণী রাখলেন কেন?

মৃদু হাস্য করিয়া বঙ্কিম বলিলেন, সেদিন অবধি ওর নাম ছিল মেনি। কিন্তু নতুন বাংলা কখানা নবেল প'ড়ে আমার মনটা বড্ড খারাপ হয়ে যায়। ভাবলুম, তাই তো, রোহিণীকে মারাটা ঠিক হয় নি। সে তো তরুণীর উপযুক্ত কাজই করেছিল—শেষে মেনিকে রোহিণী নাম দিয়ে কতকটা প্রায়শ্চিত্ত করি।

শরৎচন্দ্র বলিলেন, আমার ভেলি বেঁচে থাকলে দুটিতে বেশ মিলত! শরৎচন্দ্রের চক্ষু ছলছল করিয়া উঠিল। তিনি বঙ্কিমের পিঠ হইতে রোহিণীকে লইয়া আদর করিতে লাগিলেন।

বঙ্কিম খুশি হইলেন, বলিলেন, জান, মেনির আমার কত গুণ! রাত্রে আমার পিঠ চুলকে দেয়। ছোটগিন্নী সইতে পারেন না, বলেন, মেরে ফেলব। আমি বলি, সে কাজ তো গোবিন্দলালই সেরে রেখেছে, তুমি আর নতুন কি করবে? রোহিণীর ওপর গিন্নীর ভারি রাগ। বলেন, অসচ্চরিত্রা।

শরৎচন্দ্র উল্লসিত হইয়া বলিলেন, আমার বইগুলো প'ড়ে দেখবেন। 'শ্রীকান্ত' পড়বেন। রাজলক্ষ্মীকে শ্রীকান্ত বিয়ে করেছিল।

পড়ব বইকি। কিন্তু অচিন্ত্যকুমার বেশ লেখে, তাকে একদিন আনতে পার?

ক্ষুব্ধ শরৎচন্দ্র বলিলেন, দেখব চেষ্টা ক'রে। আচ্ছা, এক কাজ করুন না, প্রেসিডেন্সি কলেজে আপনার আর আমার নামে একটা সমিতি হয়েছে। আমাদের উপন্যাস নিয়ে সেখানে আলোচনা হয়। যাবেন একদিন ?

এমন সময় হঠাৎ দেয়াল-আলমারির উপরের তাকের বহিগুলির উপরে একটি ইঁদুরকে দেখিয়া রোহিণী শরৎচন্দ্রের কোল হইতে বেগে সেই দিকে ধাবিত হইল। বঙ্কিমের গড়গড়াটা রোহিণীর পা লাগিয়া উল্টাইয়া গেল, ফরাশ পুড়িয়া দুর্গন্ধ উঠিতে লাগিল। বঙ্কিম হাঁকিলেন, ভজহরি !

কাপড় পোড়ার গন্ধে জাগিয়া উঠিয়াই দেখি, হাতের চুরুট কখন কোঁচার উপর পড়িয়াছে, কাপড়ে একটি আধুলি পরিমাণ ছিদ্র হইয়া গিয়াছে।

১১৭৯২

দি ফার্স্ট ব্যাট্‌ল্‌ অফ গ্যাঁড়াতলার পরে মথুরা এক্সপ্রেসে একদিন আসানসোল যাইতেছিলাম। ইণ্টার ক্লাসের টিকিট ছিল। বর্ধমান পর্যন্ত আমাদের কামরায় আমরা পাঁচজন ছিলাম; একজন কোটপ্যাণ্ট-পরিহিত, অ্যাঁও হইতে পারেন, অঁও হইতে পারেন; দুইজন ধুতিচাদর-শোভিত—সন্দেহজনক; একজন লুঙ্গি-পরিহিত, অকাট্য পয়গম্বরের অনুচর; আর আমি ক্ষীণজীবী হিন্দুসন্তান। বর্ধমান শহর পর্যন্ত কেহ ভরসা করিয়া একটিও কথা বলি নাই; জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া অলক্ষ্যে ভিতরে লক্ষ্য রাখিয়া প্রাকৃতিক শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলাম। বর্ধমানে আমাদের কামরায় একটি ভদ্রলোক উঠিয়া সুটকেসটি বাঙ্কে রাখিয়া চাদর ঘুরাইয়া বাতাস খাইতে খাইতে হ্যাটকোটধারী ভদ্রলোকটিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মশায়, দাঙ্গার খবর কি? এতক্ষণে আমাদের বাক্‌স্ফূর্তি হইল, হ্যাটধারী জিজ্ঞাসা করিলেন, মশাইরা, আপনারা? নবাগত কহিলেন, বাঁড়ুজ্জে, ফুলিয়া মেল। লুঙ্গি ছাড়া আমাদের সকলকেই প্রশ্ন করা হইল। জানা গেল, পাঁচজনই আর্য—হিন্দুবংশধর। হ্যাটধারী তখন মহাগর্বে লুঙ্গির দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, আর মশায়, কলকাতায় আর—নেই। মহোল্লাসে তখন মুসলমান-ধ্বংসের কল্পিত বাস্তব বহু গল্প শুরু হইল।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া ভাবিলাম, একবার জ্যাকেরিয়া স্ট্রীটের শিবমন্দিরটি আর হ্যারিসন রোডের দীনু মিয়ার মসজিদখানি পর্যবেক্ষণ করিয়া আসিয়া ভবিষ্যতে নাতি-নাতনীদের শীতসন্ধ্যাবিনোদনের জন্য কিছু খোরাক সংগ্রহ করিয়া রাখিব;—ওমা, বিষ্যুৎবারের ভর

বারবেলায় আবার তুর্কী-নাচন শুরু হইল। কিছু চাল ডাল কয়লা আলু আর লোহার পাইপ সংগ্রহ করিয়া ঘরের কোণা আশ্রয় করিলাম। একটি ঘরের খড়খড়ি বন্ধ করিলেও বন্ধ হইত না, অতিরিক্ত পারিশ্রমিক কবুল করিয়া সেটি মেরামত করাইয়া লইলাম। তারপর লাটসাহেবের দার্জিলিঙে বসিয়া তারযোগে দাঙ্গার খবর লওয়ার মত প্রাতঃকালে কাগজওয়ালাদের কৃপায় সমসাময়িক ইতিহাসের সহিত পরিচিত হইতে লাগিলাম। ওই রাজাবাজারে গুলি, ওই গড়পারে দাঙ্গা, কলাবাগানে খুন, সাহেববাগানে লড়াই—চোখের সামনে ছবিগুলি ফুটিয়া উঠে; আরে, প্যারীদাদের বাড়ির সামনেই যে, শচীন বাঙালের বাড়ির পাশেই, অজিতের মেসের পেছনেই! সর্বনাশ! খবর লইতে হইতেছে। বার বার মহাকালীর পাদপদ্মে নমস্কার-নিবেদন করিয়া বুকে পিঠে পিজ-বোর্ডের বর্ম আঁটিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। দুই পা যাইতেই শুনি, চলা আও। সম্মুখে চাহিয়া দেখি, লক্ষাধিক রুমের বাদশা। চক্ষে অন্ধকার দেখিলাম। কাঁহা চলা যাব রে বাবা! উর্ধ্বশ্বাসে ঘরে আসিয়া আবার খিল দিলাম।

সেকেণ্ড ব্যাট্‌ল্‌ অফ গ্যাঁড়াতলাও শেষ হইল।

দাঙ্গার ভয় তখনও কাটে নাই; ফুটপথ ছাড়িয়া পথের মাঝখান দিয়া সন্তর্পণে হাঁটি—গাড়ি-চাপা পড়িলে হাড়গোড় ভাঙিয়া পৈতৃক প্রাণটুকু টিঁকিয়া যাইতে পারে, কিন্তু কোন গলির মোড়ে বেঘোরে ছোরা খাইয়া শহীদ হইতে রাজি নহি। পথের মাঝখানে ভয়ে ভয়ে চলি—একটু অন্যমনস্ক হইলেই চারিদিকে স্কন্ধকাটা, ছিন্নমস্তা প্রভৃতির ছবি দেখি; পিছনে খক করিয়া কেহ কাসিলে চোখের সামনে ইস্পাতের ছোরা ঝকঝক করিয়া উঠে, পশ্চাতে পায়ের শব্দ শুনিলে গতি স্বতই বাড়িয়া যায়, ফিরিয়া তাকাইবার সাহস হয় না; ঘাড় না ফিরাইয়া

ঘাড়ের দিকে লক্ষ্য রাখি; ছায়া দেখিয়া পিছনে কেহ আসিতেছে কি না বুঝিয়া লই। কোন চা-খানার সামনে ফুটপাথে খলিফার বংশধরদের দেখিলে দুর্গানাম জপ করিতে করিতে অগ্রসর হই, তখন সেখানে একটি ম্যালেরিয়াগ্রস্ত শিখ, আরিয়া, মাড়োয়ারী, উড়িয়া কিংবা খোট্টাকে দেখিলেও ভাই বলিয়া বুকে জড়াইয়া ধরিতে ইচ্ছা হয়। মাঠে বিনা টিকিটে খেলা দেখিতে গিয়া যে সব দুধে-আলতা মুখ দেখিয়া চঞ্চল হইয়া উঠি, তাহাদিগকেই রাস্তার মোড়ে মোড়ে ঝিমাইতে দেখিয়া পরাণ-পক্ষী আশ্বস্ত হয়। সন্ধ্যার পর বাহির হই না; মুসলমান-পাড়ায় অধমর্ণের কাছেও যাই না। সকালের 'ছোলতান' পড়িয়া তবে পথে বাহির হই। গিন্নীর সিঁদুর আর শাঁখার জোর পরীক্ষা করিতে যদি বা কখনও সন্ধ্যার পর একটু এদিক ওদিক যাই, সে বাসে, না হয় ট্রামে। বারোদুয়ারী ট্রামে এখনও ভরসা করিয়া উঠি না।

কোনও বুদ্ধিমান বন্ধুর নির্দেশ অনুসারে আরবী উচ্চারণ-ভঙ্গী সমেত কতকগুলি মুসলমানী শব্দ আয়ত্ত করিয়াছি; একটি আদ্ধির তেরছা টুপিও সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে রাখি; প্রয়োজন হইলে পিতৃ-পিতামহের বংশ-রক্ষা করিতে তাঁহাদের নাম ভাঁড়াইতেও প্রস্তুত আছি।

সেদিন 'আনন্দবাজারে'-এ মালব্যজীর বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ পড়িয়া দশ হাত ফোলা বুক লইয়া আপিস হইতে বাড়ি ফিরিতেছিলাম। মহাকবির উক্তি মনে পড়িতেছিল—

"জাগরণ চাই
কাঁদিবে কাটিবে ভয়ে সে সময় নাই।"

বাস হইতে নামিতেই এক আরবীর সহিত ঠোকাঠুকি হইল; মটকার চোগা-চাপকান দেখিয়া ভরসা করিয়া বিনীত নমস্কারে মাপ

চাহিতে গিয়া দেখি, আমাদের মকরম। স্কুলে একসঙ্গে এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়াছি। আমাদের পাড়ার আব্বাস দপ্তরীর পুত্র। ভারি হিন্দুঘেঁষা ছেলে; মুসলমানদের সে 'নেড়ে' বলিত। আমার সঙ্গে খুব দহরম-মহরম ছিল। তাহাকে চিনিতে পারা ঠিক হইবে কি না ভাবিতে লাগিলাম; হোক বন্ধু, জাত-কেউটের বাচ্চা তো! মকরম ততক্ষণে ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে খানিকটা আগাইয়া গিয়াছে। হঠাৎ কি মনে হইতেই ডাকিয়া ফেলিলাম, মকরম, ও মকরম! মকরম থমকিয়া দাঁড়াইতেই কাছে গিয়া তাহার হাত ধরিয়া ঝাঁকানি দিতে দিতে বলিলাম, আরে, তুই যে চিনতেই পারলি না? কোথায় চলেছিস? সে বেকার হোস্টেলে থাকিয়া কলিকাতায় বেকার অবস্থায় দিন কাটাইতেছিল। আমার দিকে খানিকক্ষণ বিরক্তিকঠোর দৃষ্টিতে তাকাইয়া খাস উর্দুতে সে বলিল, তুম্ কোন্ হ্যায়, পছান্তে নেহি।

পছান্তে নাই কি রে! আমি বদি। মকরমের চোখ দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। ঘাবড়াইয়া গেলাম। অতিরিক্ত প্রীতি দেখাইতে গিয়া থার্ড ব্যাট্‌লের কারণ হইব না ভাবিয়া বোকা হাসি হাসিয়া বলিলাম, মিয়া সাহেব, কসুর হইয়াছে, মাপ করিবেন। মিয়া সাহেব চলিয়া গেলে তাঁহার উদ্দেশ্যে তিনবার মসনদী কেতায় সেলাম ঠুকিয়া তেরো মিনিটকাল সেখানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। আমাদের আব্বাস দপ্তরীর ব্যাটা মকরম! পূজাপার্বণে আজিও আব্বাস আমাদের বাড়িতে উঠানের কোণ ঘেঁষিয়া পাত পাতিয়া বসে। ধন্য রহিম সাহেব! আর ধন্য মাদ্রাসা!

বাড়ি ফিরিয়া এ বিষয়ে খবরের কাগজের জন্য মনে মনে একটা প্রবন্ধ ভাঁজিতে লাগিলাম। ইংরেজীতে লিখিব, না বাংলাতে লিখিব—ইহা লইয়া গোল বাধিল; ইংরেজীতে মোটামুটি লেখাটা খুব জোরালো হয়

বটে, কিন্তু মাতৃভাষাতে কাঁচা কাঁচা গাল দেওয়া যায়। ভাবিতে ভাবিতে ভারি গরম ঠেকিল, ছাদের এক কোণে একটা মাছুর পাতিয়া হাতের উপর মাথা রাখিয়া চিত হইয়া পড়িয়া আকাশের তারা গনিতে শুরু করিলাম। শুনিয়াছি, এক একটি তারা এক একটি মানব-আত্মা। উহার মধ্যে কোন্‌গুলি হিন্দু, কোন্‌গুলি মুসলমান, ইহা লইয়া ভারি দ্বিধায় পড়িলাম; শেষে অনেক ভাবিয়া বর্ণনির্ণয়ের একটা পন্থা আবিষ্কার করিয়া সবে হিন্দু-মুসলমান তারার বিভাগ শুরু করিয়াছি, এমন সময় ভুঁড়ি দুলাইয়া কেষ্টমামা হাজির হইয়া ফিসফিস করিয়া বলিলেন, ওহে, এস, একটা ব্যাপার দেখবে এস। 'কি, কি' বলিয়া চমকিয়া লাফাইয়া উঠিলাম। মামা বলিলেন, চুপ, আস্তে। কেষ্টমামা আমাদের সরকারী মামা; ভারি ইয়ার লোক; আমরা তাঁহাকে 'ডবল মাদার' বলিয়া ডাকিতাম। ভাবিলাম, অন্য দিনের মত কোন ইয়ারকি হইতেছে। সামান্য একটা ইয়ারকির জন্য অতবড় একটা কাজ পণ্ড হয় দেখিয়া বিরক্ত মনে মামার অনুসরণ করিলাম, ছাদের পশ্চিম ধারে আসিয়া দাঁড়াইতেই মামা শশব্যস্তে বলিয়া উঠিলেন, ব'সে পড়, ব'সে পড়। ভয় পাইয়া আলিসার ধারে টুপ করিয়া বসিয়া পড়িলাম। মামা নীচে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া মিহি সুরে বলিলেন, ওই দেখ। পাশেই একটা মসজিদ ছিল। আমাদের ছাদ হইতে মসজিদের ভিতরটা পরিষ্কার দেখা যাইত; কথাবার্তাও সেখানকার স্পষ্ট শোনা যাইত। দেখিলাম, সেখানে বিরাট ব্যাপার। ফরাশ পাতিয়া লাল টুপি মাথায় গোল হইয়া সবাই বসিয়া আছে। মাঝখানে আমাদের পাড়ার পীরু মিয়া—বিড়ি-দা-ইসলামের একমাত্র ম্যানুফ্যাক্‌চারার। বোধ হইল, সে-ই সভাপতি। সবাই হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া—নামাজ পড়িবার সময় যেমন বসে। সামনে একখানা খবরের কাগজ, দৈনিক 'ছোলতান' বলিয়া

মনে হইল ; একটি খাতা এবং পেন্সিল ; একটি খোলা পেন্সিল-কাটা ছুরিও পড়িয়া আছে। পীরু মিয়া খবরের কাগজটি নাড়িয়া-চাড়িয়া উর্দু-বাংলা মিশ্রিত ভাষায় যাহা বলিল, তাহার মর্ম এই :—কাফেররা বড়া মছজেদের সামনে বাজা বাজাইয়া যাইতে সাহস করে নাই ; তবে দীনু মিয়ার মছজেদের সামনে বাজা বাজাইয়াছে। তাহাদের গোরা বাপরা সঙ্গে না থাকিলে একবার দেখিয়া লইতাম। তবে পবিত্র এছলামের এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে হইবে। তারপর ছুরিটি হাতে লইয়া বলিল, এস, এই পবিত্র মছজেদের ভিতর এই তরবারি ও ফেজ স্পর্শ করিয়া আমরা কাফের-দলনের প্রতিজ্ঞা করি। কাল্লু বলিল, তরবারি কই ? পীরু হুঙ্কার দিয়া বলিয়া উঠিল, বিধর্মী গোরারা আসিয়া ছোরা ও তরবারি সমস্তই কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে, আপাতত এই ছুরি দিয়া কাজ চালাইয়া লওয়া যাক। কে কয়টি মন্দির ও কাফের ধ্বংস করিতে পারিবে ঠিক ঠিক বলিয়া যাও ; মিথ্যা বড়াইয়ের কাজ নয় ; 'শির' দিয়া 'সার' রক্ষা করিতে হইবে। সকলেই আল্লার নাম গুঞ্জন করিয়া উঠিল। সেই অন্ধকার ছাদে দারুণ গ্রীষ্মে আমরা কাফের দুইজন ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। মামা বলিলেন, ভাই রে, গতিক সুবিধার নয়। আমি মামার ভুঁড়ি স্পর্শ করিয়া বলিলাম, দাদা, তাই তো দেখছি। কাফের-ধ্বংস পাড়া ছাড়িয়া বেপাড়ায় শুরু হইবে না। মামাকে বলিলাম, মামা, কাল বাসা বদলাইব। শ্যামবাজার অঞ্চলে একটা মেস পাইয়াছি ; খরচ একটু বেশি, তা হোক। মামাও অনুগামী হইবেন বলিলেন।

পীরু মিয়া তারপর পেন্সিল আর কাগজ হাতে লইয়া একে একে প্রত্যেকের নাম ধরিয়া ডাকিয়া প্রতি নামের পাশে মন্দির ও কাফেরের সংখ্যা লিখিয়া যাইতে লাগিল ; যেমন করিয়া হোক, যেখানে হোক,

প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতেই হইবে। তালিকা যাহা স্থির হইল, তাহা এই—অতি ভয়ে ভয়ে শুনিয়াছিলাম, দুই-একটা একটু এদিক ওদিক হইতে পারে—

	মন্দির	কাফের
পীরু মিয়া	৭	৭৯৩
কাল্লু মিয়া	১	১১২
ইলাহীবক্স	৫	৫৭৫
একৃতিয়ার মহম্মদ (বয়স ৯০ বৎসর)		৩
*	*	*
	৩৭৩	১১৭৯২

যোগ করিয়া ৩৭৩-টি মন্দির ও ১১৭৯২-জন কাফের-ধ্বংসের প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষরিত হইল। জিহাদ ঘোষিত হইল। মামা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, ভাগনে, পুলিসে খবর দাও। আমি বলিলাম, মামা, পৈতৃক প্রাণটি অত সহজে খোয়াইতে রাজি নই। শ্যামবাজার-অঞ্চলে গিয়া তেলে-জলে কিছুদিন টি`কিয়া থাকা যাইবে ; মিয়া সাহেবদের নজরে পড়িলে তোমার ভাগ্নে-বউয়ের বৈধব্য অনিবার্য।

সংখ্যা স্থিরীকৃত হইল। ধার্মিকদল খোদার নামে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিল।

ভয়ে ভয়ে নীচে আসিয়া নামমাত্র আহারে বসিলাম, কাহাকেও কিছু বলা যুক্তিযুক্ত নয়। কাল ইহার পর মেস ত্যাগ করিয়া গেলে ভীরু অপবাদ পাইতে হইবে ; তাহা অসহ্য। যাইবার সময় সকলকে আভাসে সাবধান করিয়া দিলেই হইবে।

সেদিন মশা আর ছারপোকারাও যেন কলমা পড়িয়া কাফের-শোণিত-শোষণে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। অসহ্য গরম। কিছুতেই ঘুম আসে

না। খড়খড়ির ফাঁক দিয়া রাস্তার গ্যাসের আলো ঘরের ভিতরের দেওয়ালের গায়ে পড়িয়াছে; সেই অর্ধ-অন্ধকারে চটা-উঠা দেওয়ালে চারিদিকেই মসজিদের ছবি দেখিতে লাগিলাম। রাস্তার কুকুরগুলার চীৎকারকে জিহাদের জয়ধ্বনি বলিয়া মনে হইতে লাগিল। ঘুমের আশা ত্যাগ করিয়া কানে ঘাড়ে জল দিয়া শুইলাম। পটলির মায়ের কথা মনে হইতেই চোখ দিয়া হু-হু করিয়া জল ঝরিতে লাগিল, কে জানে, আর কখনও দেখা-সাক্ষাৎ হইবে কি না! আবার উঠিয়া খিলগুলি পরীক্ষা করিয়া শুইলাম।

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম জানি না। সহসা মাথায় তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করিয়া উঠিয়া বসিলাম। চোখ চাহিতেই যাহা দেখিলাম, তাহাতে বুকের রক্ত হিম হইয়া গেল; ইষ্টনাম পর্যন্ত ভুলিয়া গেলাম। দেখি, কাল্লু আমার চুলের মুঠি ধরিয়া ঝাঁকানি দিতেছে আর পীরু মিয়া টেবিলের উপরকার ওয়েবস্টার ডিক্‌সনারির উপর ছোরা শানাইতেছে। রোষকষায়িত চোখে আমার দিকে চাহিয়া পীরু বলিল, ইহাকে জবেহ করিব। সেদিন এই বেত্‌মিজ আমার দোকানে বিড়ি কিনিতে গিয়া বিড়ি না কিনিয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। হায় হায়, কি দুর্বুদ্ধিই যে হইয়াছিল! একটি পয়সার জন্য প্রাণ হারাইতে হইল! সেঁকো বিষের ভয়ে বিড়ি কিনি নাই,—কিনিয়া নর্দমায় ফেলিয়া দিলেই তো চুকিয়া যাইত; তাহা হইলে প্রাণটা বাঁচিতে পারিত। আশপাশ হইতে করুণ আর্তনাদ কানে আসিতে লাগিল। চাহিয়া দেখি, কেষ্টমামা, মথুরবাবু, তিনকড়ি, বিজয়, বিপিন সবাই রক্তে গড়াগড়ি দিতেছে, কাহারও পা দ্বিখণ্ডিত, কাহারও ধড়ে মাথা নাই; চারিদিকে যন্ত্রণার বীভৎস চীৎকার। আর সহ্য হইল না; আমি মূর্ছাহতের মত এলাইয়া পড়িলাম। কানে গেল, পীরু মিয়া বলিতেছে—এই কাফেরকে কাটিয়া কুটিয়া

শিক-কাবাব বানাইতে হইবে। হায় রাধারাণী! আমি সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলাম।

কতক্ষণ এই ভাবে কাটিল জানি না, কাহার যেন মৃদু স্পর্শে জাগিয়া উঠিলাম। সে বীভৎস দৃশ্য দেখিয়া ভয়ে চোখ খুলিতে সাহস হইতেছিল না। কানে আসিল, ওগো শুনছ? রাধারাণীর গলা। রাধারাণী এখানে কি করিয়া আসিল! পীরু মিয়ারাই বা গেল কোথায়? ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিতেই দেখি, আমাদের পাবনার বাসায় আমার নিজের ঘরেই বসিয়া আছি। পাশেই এক বোরকাবৃত রমণী, ইজের-টুপি পরিহিত এক ছোট্ট বালিকা; ঠিক পটলির মত। অবাক হইয়া মাথায় হাত দিয়া দেখিলাম, তাহা যথাস্থানেই আছে। রমণী বোরকা উন্মোচন করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, অবাক হয়ে কি দেখছ, আমাকে চিনতে পারছ না নাকি?

এ কি রাধারাণী, তোমার এ সাজ কেন?

সে কি গো, তুমি জান না, আমি পবিত্র এছলাম বরণ করেছি যে! মায়াদিও পবিত্র এছলামের ছায়ায় এসেছেন, পটলিকেও কলমা পড়ানো হয়েছে; তোমায় আজকে এছলাম নিতে হবে।

আমি অধীরভাবে চীৎকার করিয়া বলিলাম, রাধা, এ কি ঠাট্টা তোমার?

রাধারাণী আমার হাত ধরিয়া বলিল, ছি, ওই কাফেরী নামে আমায় আর ডেকো না, আমার এছলামী নাম হয়েছে রৌশেনারা, পটলির নাম হয়েছে পিয়ারবানু; মায়াদির নাম হয়েছে মালেকা খাতুন। আমাকে রোশেনা ব'লেই ডেকো।

আমি গভীর আর্তনাদ করিয়া উঠিলাম, না না না, হতেই পারে

না—হতেই পারে না ; তুমি চুলোয় যাও, আমি পটলির শুদ্ধি করব—শুদ্ধি করব। শ্রদ্ধানন্দ স্বামীকে এখনই টেলিগ্রাম করছি।

রাধারাণী বোরকায় মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি উন্মাদের মত ঘরে পায়চারি করিতে করিতে চীৎকার করিতে লাগিলাম, শুদ্ধি চাই, শুদ্ধি চাই।

হঠাৎ কি যেন একটা আওয়াজ শুনিয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল। দরজায় জোরে জোরে ধাক্কা দিয়া মামা 'বদি, বদি' বলিয়া ডাকিতেছেন। চকিতে উঠিয়া বসিয়া দেখি, ঘামে সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গিয়াছে—আমি আমার মেসে নিজের বিছানাতেই বসিয়া। তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিতেই মামা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, মাঝরাত্রে 'শুদ্ধি চাই, শুদ্ধি চাই' ব'লে চ্যাচাচ্ছিলে কেন হে, তোমার স্কন্ধে শ্রদ্ধানন্দের ভূত চাপল নাকি ?

স্বপ্নের কথা মামাকে বলিলাম।

পরদিন সকালেই পাবনা যাত্রা করিলাম। স্টেশনে একখণ্ড 'ছোলতান' কিনিয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিলাম, ১১৭৯২-এর কথা কোথাও নাই।

পরকীয়া-সংঘ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এবং পেয়ালা-কবি কান্তিচন্দ্র ঘোষকে দেখিয়া অনেকের ধারণা যে, কাব্য করিতে হইলে পৈতৃক কিছু সম্পত্তি এবং স্বোপার্জিত অন্তত একখানা মোটরকারও চাই। নিজে ড্রাইভ করিলেও ক্ষতি নাই। যাঁহাদের এই ধারণা, আমরা বলিব, তাঁহারা আমাদের হুটবিহারী নাথকে দেখেন নাই।

হুটবিহারী নাথ—পাঠিকা, নাসিকা কুঞ্চিত করিতেছেন হয়তো। আমাদের ধারণা অন্যরূপ। আপনাদের রবীন্দ্রনাথ কান্তিচন্দ্রের চাইতে এ নাম অনেক ভাল, নিতান্ত আপনার জনের নাম বলিয়া মনে হয়, যেন একেবারে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিয়াছে। ব্যাঙের ছাতা নয়। নামটি আমাদের প্রাঙ্গণের তুলসীগাছের মতই পরিচিত, গলায় আঁচল দিয়া ম্লান দীপহস্তে সন্ধ্যায় বাড়ির কনিষ্ঠ বধূ দীপটি গাছতলায় রাখিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করে, উপহাস করে না।

ড্রয়িং-রুম-বিহারীদের কথা স্বতন্ত্র। টবে নির্গন্ধ বিলাতী মরসুমী ফুল দেখিয়াই যাঁহারা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন, রবীন্দ্রনাথ কান্তিচন্দ্র তাঁহাদের কবি। একে অপরকে সার্টিফিকেট দেন। আমরা তাঁহাদের দলে নহি। আমাদের কবি, হুটবিহারী নাথ।

নামের মানে জিজ্ঞাসা করিতেছেন? ওই তো আপনাদের দোষ! জলধরদাদার মত নাম কি সবাই পায়? জলধরদাদা শ্রাবণের মেঘের মত উপন্যাসে কাঁদিতেছেন, গল্পে কাঁদিতেছেন, সমালোচনায় কাঁদিয়া আকুল। ভ্রমণ-কাহিনী লিখিতে বসিলেই— যাক সে কথা! রবীন্দ্রনাথও—

বাজে পুরবীর ছন্দে রবির

শেষ রাগিণীর বীণ—

কিন্তু এ রবীন্দ্রনাথের বড়াই। আমাদের ছুটাবিহারীর নামের কোন মানে নাই।

ছুটবিহারী প্রেমিক, ছুটবিহারী কবি, ছুটবিহারী আধুনিক, ছুটবিহারী একেবারে তরুণ। তবু সে একান্ত আমাদের। সে মোটর হাঁকাইয়া পেলিটির বাড়িতে লাঞ্চ খাইতে যায় না, হিন্দুস্থান রেস্টুরেন্টে এক প্লেট কারি-পরটা পাইলেই সন্তুষ্ট, ফিরপোর কেক চুলায় যাক, আর্য বেকারীর রুটি পাইলেই তাহার যথেষ্ট। মুানিসিপাল মার্কেটে আধ পাউণ্ড গ্র্যামফেড মাটন ও ফ্রেঞ্চ বীন কিনিতে ছুটে না; ছুটবিহারী মানিকতলা বাজারে বাজার করিতে ভালবাসে।

কোথায় থাকে, প্রশ্ন করিতেছেন? কেন, গড়পারে। তা আপনাদের বেনি পার্ক, সানি পার্কের চাইতে ভাল, জোড়াসাঁকোর চাইতে তো ভাল বটেই। বাড়িটা ছোট। বাড়ি বড় হইলেই যদি বড় কবি হইত, তাহা হইলে, লাহা আর শীলেদের—

যাক। রাইটার্স বিল্ডিঙের 'কীপার' কবিতা লেখে, শুনিয়াছেন? স্বামী আর স্ত্রী, 'লাভ ম্যারেজ'।

কপোত-কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে—

উচ্চও নয়, চূড়াও নয়, কিন্তু গাছ বলিয়া ভ্রম হয়। কবিগৃহিণী মালবিকার—

পৈতৃক নাম নয়, বুঝিতেই পারিতেছেন। নাম ছিল মোক্ষদা—খুখি। মোক্ষদা মালবিকা হইয়াছে, ডাক-নাম মালা।

কবিগৃহিণী মালবিকার রুচি প্রশংসনীয়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে স্নান সারিয়া আটপৌরে বস্ত্র পরিয়াই যখন তিনি বারান্দায় আসিয়া দাঁড়ান, দূরে পথের বাঁকে কবির মূর্তিখানি, নবোদিত অরুণের মত না হোক,

দ্বাদশীর চাঁদের মত দেখা দেয়, তখন সেই ছোট ছিমছাম বারান্দাটিকেই অলিন্দ বলিয়া ভ্রম হয়, এবং মনে পড়ে তাঁহাদেরই কথা, যাঁহারা

কুরুবকের পরত চূড়া
কালো কেশের মাঝে
লীলাকমল রইত হাতে
কি জানি কোন্ কাজে।
অলক সাজাত কুন্দ ফুলে
শিরীষ পরত কর্ণমূলে,
মেখলাতে দুলিয়ে দিত
নব নীপের মালা।

ফলে, কবি গৃহে ফিরিয়া বস্ত্র পরিবর্তন না করিয়াই কবিতা লিখিতে বসে। কেটলিতে জল গরম হইতে থাকে।

পাড়ার লোক হিংসায় মরে, বলে, লোকটা বাহাদুর বটে, সংসারকে বুড়ো-আঙুল দেখিয়ে বেশ নির্বিবাদে—

তারা জানে না, লোক নয়—কবি। কবি ও কবিগৃহিণী। সামান্য চাকরি—বার্মা শেল অয়েল স্টোরেজ অ্যাণ্ড ডিস্ট্রিবিউটিং কোম্পানি অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের কেরানী; দশটা-পাঁচটা কাজ।

দিন মন্দ কাটিতেছিল না, অভাব-অনটনের সংসার, তা হউক। প্রিয়ার মুখমদের ছিটার অভাব কোনদিনই হয় নাই; জরিপাড় শাড়িটা মাসে চারবার কাচাইতে হয়, চার আনা হিসাবে এক টাকা মাত্র খরচ।

কিন্তু প্রিয়ার মুখমদ হঠাৎ একদা অতিরিক্ত রকম গাঁজিয়া উঠিয়া তাড়িতে পরিণত হইল। আমাদের গল্পের আরম্ভ সেইখানে।

অফিস হইতে ফিরিয়া প্যাড-বাঁধা চিঠির কাগজে কবিতার পর

কবিতা লিখিয়া মুটবিহারী প্রেয়সীকে শোনায়। প্রেয়সীর ক্ষুধা যেন অতৃপ্ত রহিয়া যায়। সেদিন সে লিখিতেছিল—

বাবলার ডালে হাবলা বসিয়া একা
ভাজা ডালমুঠ খাবলা খাবলা খায়—
দূরে বাতায়নে হাবিরে যায় যে দেখা,
কালো এলোচুল বাতাসে উড়িয়া যায়।

কালো এলোচুল বাতাসে উড়িয়া যায়—
চোখের কাজল গজল গাহিছে মিঠি,
বাঁকা ভুরু দুটি কুঞ্চিত ইশারায়
ভেজিছে সাদরে প্রেমের রঙিন চিঠি।

ভেজিছে সাদরে প্রেমের রঙিন চিঠি
বাতাসে বিবশ শাড়ির আঁচলখানি—
শাড়ি নয়, যেন মিনতি-কাতর দিঠি,
চুমকির কাজ যেন লাল লোহু-পানি।

চুমকির কাজ যেন—

হঠাৎ কবির মনে হইল, যেন কপালের সুবিন্যস্ত কেশদাম কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খল হইয়াছে। প্যাড হাতে আয়নায় মুখ দেখিতে গিয়া কবি চমকাইয়া উঠিল। প্যাডের ব্লটিঙের ছাপ আয়নায় পড়িয়াছে। কিছু নয়, কোটেশন মার্কা দেওয়া শুধু একটা—'আমি'। উপরে 'তোমারই' কথাটা বহুকষ্টে পড়া যায়, তাহার উপর আরও অনেকগুলি দাগ পড়িয়াছে। মালবিকার হস্তলিপি। কবির আনন্দিত হইবার কথা,

ব্লটিঙেও প্রেয়সীর মনের রঙের ছোপ লাগিয়াছে। কিন্তু ফুটবিহারীর আনন্দ হইল না। কোনও চিঠির ইহা ভগ্নাংশ নিশ্চয়ই। সে বহুকাল প্রেয়সীর লিপি পায় নাই। ছয় মাসের উপর একত্র অবস্থান করিতেছে। অথচ প্যাডখানা এক সপ্তাহের আগে কেনা নয়। তবে—

'ঘরে-বাইরে'টা ভাল করিয়া পড়া ছিল। মালবিকা কাঁঠালবিচি পোড়াইতে ব্যস্ত। ফুটবিহারী আর একবার 'ঘরে-বাইরে' লইয়া বসিল। নিখিলেশ তার আত্মকথার এক জায়গায় লিখিয়াছে—'আজ ওর বিলিতি খোঁপার চূড়াকে কেবলমাত্র চুলের কুণ্ডলী বলেই দেখলুম।' বেচারা নিখিলেশ! কিন্তু, হয়তো সে ভুল করিতেছে। মালবিকার অনেক বন্ধু আছে, তাহাদের কাহাকেও— কিন্তু, কোটেশন মার্কা দিয়া 'আমি' কেন?

কবিতা এলোমেলো হইয়া গেল। কাঁঠালবিচি প্রীতিপদ মনে হইল না।

সন্দেহ বস্তুটাই হইতেছে বিধাতার সংসারে শয়তান। তাহাদের নীড়ে শয়তান বাসা বাঁধিল। দুপুরে মাঝে মাঝে ফুটবিহারীর মাথা ধরে। চুপিচুপি বাড়ি আসিয়া—

স্ত্রী হয় ঘুমায়, নয় মাসিকের গল্প পড়ে। চিঠি লেখে না বা বারান্দায় দাঁড়ায় না। সন্দেহ বাড়িতে থাকে।

কিন্তু, অত ঘন ঘন মাথা ধরিলে চাকরি থাকে না। মালবিকা বলে, তুমি ছুটি নাও কিছুদিনের। বড়বাবু মালবিকা নয়, ফুটবিহারী একেবারেই ছুটি পাইল।

বরখাস্ত হইয়া ট্রামে চাপিয়া কর্নওয়ালিস স্ট্রীট-সুকিয়া স্ট্রীটের জংশনে নামিয়া ফুটবিহারী ভাবিতে থাকে, এখন উপায়?

সামনেই মেট্রোপলিটান, পাশে প্রেসিডেন্সি ফার্মেসি। একবার

ভাবে, বামাপদবাবুকে চোখটা দেখাইয়া যাই, চোখেই হয়তো কিছু গোলমাল হইয়াছে। শেষে মেট্রোপলিটান ফার্মেসিতেই ঢুকিয়া পড়ে।—'লিট্‌ল্‌স্‌ ওরিয়েন্টাল বাম' আছে?

নিত্যকালের মত প্রেয়সী সাজিয়া-গুজিয়া অলিন্দে দাঁড়াইয়া। প্যাডখানা টেবিলে পড়িয়া থাকে। ফুটবিহারী বিছানায় একেবারে চিত।

কি হ'ল আবার?

এই ওষুধটা একটু কপালে ঘ'ষে দাও না! বড্ড মাথা ধরেছে।

চাকরি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রেয়সী আর প্রিয়ভাষিণী নয়। মুখমদ তাড়ি হইয়া গিয়াছে। অন্নাভাব, বস্ত্রাভাব—অভাবের অভাব নাই। মালবিকা আবার 'মোক্ষদা—মুখি' হইয়া যায়।

কাব্য বিদায় লইয়াছে। পাহারা দেওয়ার কাজটা ঠিক চলিতেছে, কিন্তু সেই 'তোমারই' সন্ধান মেলে না।

শেষে একটা চাকরি জুটিল, একেবারে মনের মত। মাহিনা কম বটে, কিন্তু কাব্য আছে পুরাদস্তুর। এমন চাকরি বহুভাগ্যে মেলে। তবু ফুটবিহারীর মনে সুখ নাই। সন্দেহ তো আছেই, অধিকন্তু মোক্ষদা আর প্রেয়সী হইতে পারে না। তাহার মনের কল বিগড়াইয়াছে।

বাংলার তরুণেরা তখন বোহেমিয়া আর মস্কোর তরুণদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। বিখ্যাত রুশ-জাপান যুদ্ধের পর প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে এমন সংঘর্ষ আর হয় নাই। এই সংঘর্ষে আমাদের ফুটবিহারী হইল অ্যাডমিরাল টোগো। অর্থাৎ, তরুণেরা একটা ক্লাব খুলিয়াছিল—'পরকীয়া-সংঘ', ফুটবিহারী হইল তাহার বৈতনিক সেক্রেটারি।

সামান্য কাজ। তরুণ সভ্য-সভ্যাদের নিকট নিয়মিত চাঁদা আদায়, তাহার খরচ-পত্রের হিসাব রাখা; ক্লাব-ঘরের তাকিয়া বালিশ আলমারি বইয়ের খবরদারি করা; সন্ধ্যায় ফুল চা আর সিগারেট সরবরাহ করা

এবং প্রতিদিনকার প্রোসিডিংসের একটা করিয়া সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট রাখা। ইহার মধ্যে চাঁদা আদায়ের কাজটাই যা কঠিন—তবু তাহাতে রস আছে, দুই দণ্ড নিরিবিলিতে তরুণ-তরুণীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চলে, চাঁদা আদায় নাই হইল। হুটবিহারী নিখুঁত কবিতায় প্রোসিডিংসের রিপোর্ট রাখিতে লাগিল।

পরকীয়া-সংঘের পাণ্ডা সুবিখ্যাত কবি গোবর্ধন গুঁই। তাহার সহিত হুটবিহারীর যথেষ্ট হৃদ্যতা। সে-ই হুটবিহারীকে চাকরিতে বাহাল করিয়াছে। গোবর্ধন হুটবিহারীর বিশেষ পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। কাজে অকাজে তাহার সহিত পরামর্শ করিবার জন্য তাহার বাসায় আসিতে লাগিল। ফলে—

হুটবিহারীর মনে আবার রঙ ধরে। মোক্ষদা নয়—মালবিকা। প্রোসিডিংসের রিপোর্টই অপরূপ কাব্য, যথা—

তেসরা আষাঢ়ে, মরি কি খাসা রে,
বসিল সভা;
পদ্ম বাজারে মেলে নি তাজা রে,
মিলিল জবা।
তারি সনে গোড়ে মালা গোটা দুই,
কিছু বেলফুল, কিছু কিছু জুঁই।
সভাপতি কবি শ্রীগোবর গুঁই
কহে, 'কি দবা
বিরহ-রোগের, স্থির হোক ফের—
চলুক সভা।'

মিত্র মালতী সকরুণ অতি
কহিল তবে,
'এ কি শুনি হায়, বিরহ কোথায়
বিরাট ভবে!
প্রিয়জন যদি দূরে চ'লে যায়—
নেচার অ্যাভরস্ ভ্যাকুয়াম, হায়,
জান না এ কথা? অন্যে ত্বরায়
প্রিয় যে হবে।
বিরহের কথা স্রেফ বাতুলতা
মোদের ভবে।'

ইত্যাদি। কখনও বা লেখা হয়—

বাইশে ফাল্গুন অদ্য ক্লাব-ঘরে খোলা বাতায়ন,
নক্ষত্র-হীরক-হারে শোভিতেছে নির্মল গগন,
সুগন্ধি কুসুমাকীর্ণ বিস্তৃত ফরাশে ব'সে সবে,
বীরভদ্র সভাপতি। আজিকার বসন্ত-উৎসবে
হবে স্থির রমণীর কেশরাশি নিরর্থক কি না!
প্রথমে প্রস্তাব আনে শিলেটের শ্রীমতী মলিনা,
'আমরা কাটিব চুল, ঘুচাব এ দাসত্ব-বন্ধন'—

ছুটবিহারীর রিপোর্ট দেখিয়া সকলেই খুশি।

এমনই করিয়া সুখে দুঃখে দিন যায়, কিন্তু মালবিকার মন কঠিন হইয়া থাকে। বিখ্যাত গজল্ল-কবি ফকরুদ্দীন 'পরকীয়া-সংঘে' গীত

হইবার জন্য যেদিন তানলয়-সংযোগে স্বরচিত এই গজলটি গাহিয়া শুনাইল—

যদি না করলি পরকীয়া লো মোর প্রিয়া দরদিয়া,
ভেবে দেখ্ সংগোপনে, এই জীবনে, কি আর কিয়া !
প্রিয়া তোর চিত্তনদী বইল যদি একই খাতে,
একই গুল ফুলবাগানে রসিক জানে বেদন তাতে।
হৃদয়ের অগাধ নীরে ডুব্ দেখি রে, দেখ্ চাহিয়া,
সেখানে বিশ্বক্ষুধা একের সুধা যায় কাঁদিয়া।
চেয়ে দেখ্ নয়ন মেলে, নূতন পেলে, পুরাতনে
থাকে না কাহারো টান, বয় যে উজান গোপন মনে,
তুই কি একলা রবি ব্যথার ছবি, মোরেই নিয়া—
হবে না পূর্ণ হিয়া শরম-প্রিয়া এক সাধিয়া।

—সেদিন মুটবিহারীর চমক ভাঙিল। সত্যই তো নিষ্ঠুর সে। প্রেয়সীর চিত্তশতদলের উপর সন্দেহের শিলাস্তূপ চাপাইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল। ক্ষুদ্র ঘরের বদ্ধ বাতাসে এতদিন বুঝি প্রিয়ার প্রিয়ত্বের ধ্বংস হইয়াছে। দায়ী সে একা। মুটবিহারী প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

সভাভঙ্গ হইলে ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত ফুলগুলি সযত্নে একটি ঠোঙায় আহরণ করিয়া ব্যথিত বিষণ্ণ চিত্তে মুটবিহারী বাড়ি ফিরিল। প্রেয়সী বারান্দায় ময়দা ঠাসিতেছিল। মুটবিহারী সোজা তাহার কাছে গিয়া ঠোঙার সমস্ত ফুল তাহার পায়ের কাছে ঢালিয়া দিয়া অত্যন্ত করুণ কণ্ঠে বলিল, মালা, আমি অপরাধী, আমাকে ক্ষমা কর।

মালবিকা ঠিক এই ভয়ই করিতেছিল। যে-দলে স্বামী আজকাল মিশিতেছে, একদিন যে সে নেশা করিতে ধরিবে—এই আশঙ্কা বহুবার তাহার মনে হইয়াছে। আড়াল হইতে গোবর্ধন গুঁইকে সে দেখিয়াছে। রকম-সকম মোটেই ভাল নয়। কিন্তু এত শীঘ্র স্বামী যে বেতরিবতি শুরু করিবে, ইহা সে ভাবে নাই। বিরক্তিকঠোর কণ্ঠে বলিল, এ আবার কি ঢঙ! যত বুড়ো হচ্ছ—

এ তো মালবিকা নয়! হায় রে, তাহারই কড়া পাহারায় মালবিকার বিকাশোন্মুখ চিত্ত পাষাণ হইয়া গিয়াছে—

সে বেগ হারায়ে গেছে, সে প্রচণ্ড গতি অবসান।

সে কাতর কণ্ঠে বলে, মালা,নিষ্ঠুর আমি, আমি পিশাচ—

তোমার পায়ে কি মাথা খুঁড়ে মরব আমি। দুবেলা তোমাকে প্রাণ ভ'রে খেতে দিতে পাই না, এই অবস্থায় তুমি নেশা ধরলে! ছি! যাও, কাপড় ছেড়ে একটু শোও গিয়ে।

নেশা! নেশা! সমস্ত জীবনটাই তো একটা নেশা। মুটবিহারীর মনের কথা মনেই রহিয়া যায়।

শুনিয়া শুনিয়া মুটবিহারী একটা উপায় ঠাওরাইল। মালবিকাকে কিছু বলিল না।

মানিকতলা বাজারে পুঁইশাকওয়ালী হইতে আরম্ভ করিয়া মেছুনী পর্যন্ত সবাই কবি মুটবিহারীকে চিনিত। পরিচ্ছন্ন টাকের উপর সুবিন্যস্ত চুলে, দীর্ঘায়ত দেহ ও ক্ষুরধার নাসা লইয়া এক হাতে কুমড়ার ফালি, পুঁইশাক এবং মাছের ঠোঙা, এবং অন্য হাতটি ভারতীয় চিত্রকলা-পদ্ধতির ধরনে অত্যন্ত আলগাভাবে বুকের কাছাকাছি রাখিয়া বাজারের কলুষিত ছোঁয়াচ বাঁচাইয়া, কাদা এবং উড়ে বামুনদের গুঁতা এড়াইয়া মূর্তিমান কবিতার মত সে প্রত্যহ একবার বাজারে দেখা দিত। যে

তাহাকে একবার দেখিয়াছে, সে আর ভোলে না। এক হাতের ভারে মুখের এক দিকটা হয়তো কুঞ্চিত বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু, অন্যার্ধের লালিত্য ও মধুর হাসিটির একটু বিকৃতি নাই।

উপরোক্ত ঘটনার পরদিন, মালবিকা বাজার করিতে তাহাকে ছয় আনা পয়সা দিল। প্রথমটা, সে একবার বাজার পরিভ্রমণ করিয়া লইল। পরিচিত মেছুনীরা ডাকিল, এই যে বাবু! ফুটবিহারীর আধখানা হাসিমুখ হাসিয়া উঠিল। পুঁইশাকওয়ালী বলিল, বাবু, বাঁশবেড়ের টাটকা পুঁই! দক্ষিণ হস্তের করাঙ্গুলির ইঙ্গিতে ফুটবিহারী তাহাকে নিরস্ত করিল।

বহু অনুসন্ধানের পর এক ফুলওয়ালীর খোঁজ পাওয়া গেল। চোদ্দ পয়সা ব্যয় করিয়া কবি ফুটবিহারী তিনটি পদ্ম কিনিল—একেবারে শতদল। বাকি দশ পয়সায় বাগদা-চিংড়ি আর কুমড়োর ফালি ও চিচিঙ্গে ক্রয় করিয়া শিবকালী-মূর্তিতে সে বাজার হইতে বাহির হইল। শিবের দিকটা প্রসন্ন হাস্যের দিক, সেই দিকের হাতেই শতদল। কালীর দিকটা করাল—চিচিঙ্গে, বাগদা-চিংড়ির ঠ্যাং।

প্রেয়সী প্রসন্ন হইল না। শতদলগুলিকে ছুঁড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া পদদলিত করিয়াও তাহার ক্রোধ-শান্তি হইল না। ফুটবিহারী চক্ষে অন্ধকার দেখিল। তাহার মতলব ফাঁসিয়া গেল। সে ভাবিয়াছিল, শতদল তিনটি স্নানান্তে প্রিয়ার হাতে নিবেদন করিয়া বলিবে, প্রেয়সী, এই যে বিকশিত কমলনিচয় দেখিতেছ, ইহাদের সার্থক বিকাশের পক্ষে শুধু রৌদ্রই যথেষ্ট ছিল না, ভ্রমর মুখের কাছে গুঞ্জন করিয়াছে, উদ্‌ভ্রান্ত বাতাস ক্ষণে ক্ষণে দোলা দিয়া গিয়াছে—তবে এমন পরিপূর্ণভাবে ফুটিতে পারিয়াছে কমলকোরক। প্রেয়সী, তাই তোমার পরিপূর্ণ বিকাশের পক্ষে আমি একা যথেষ্ট নহি। অন্য যে-কেহ তোমার চিত্তকে

নাড়া দিয়াছে, তাহাদের ঠিকানা বলিয়া দাও, আমি স্বয়ং তাহাদের নিমন্ত্রণ করিতে যাই—ইত্যাদি। সে ভাবিয়াছিল, এইভাবে সেই 'তোমারই'র কথা পাড়িবে।

ক্ষুণ্ণ মনে ক্লাবে গিয়া মুটবিহারী গোবর্ধন গুঁইয়ের নিকট মনের দুঃখ ব্যক্ত করিয়া ফেলিল। তাহার অনেক দেখাশুনা আছে, একটা উপায় অন্তত বাতলাইয়া দিতেও পারিবে। গোবর্ধন গোঁফে চাড়া দিয়া বলিল, এ আর কি? দুদিনে সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি। আমাদের বিদ্যুৎকে তো জান, সেই ইলেক্‌ট্রিশিয়ান হে! তার স্ত্রী পাড়ার একটি তরুণকে হৃদয়ের অর্ঘ্য নিবেদন করতে গিয়ে ধরা প'ড়ে প্রায় আত্মহত্যা করে—এমন সময় আমি হাজির হলুম। বললুম, এই অপমৃত্যুর পর তোমার অঙ্গুষ্ঠপ্রমাণ আত্মা যে এই পাড়াতেই ঘুরঘুর ক'রে বেড়াবে, সেটা কি ভাল হবে? এক কথায় ঠাণ্ডা। তার আর মরা হ'ল না। এখন বিদ্যুতের সঙ্গে একটা রফা ক'রে ঘর করছে। গী দ্য মোপাসাঁ কি বলেছেন, জান? পরস্ত্রীর সঙ্গে যদি প্রেম—

কিন্তু মালবিকা অত সোজা মেয়ে নয়।

ব্যাঁকাই তো ভাল। পিছলে যায় না।

সেদিন সকাল সকাল সভা ভঙ্গ হইল। গোবর্ধনকে সঙ্গে লইয়া মুটবিহারী সন্তর্পণে বাড়ি গিয়াই দেখিল, মালবিকা তাহারই প্যাডে নিবিষ্ট মনে কি লিখিতেছে। পায়ের শব্দে চমকিয়া উঠিয়াই এক গোছা কাগজ তাড়াতাড়ি নিজের হাত-বাক্সে রাখিয়া চাবি বন্ধ করিল এবং গোবর্ধন গুঁইকে দেখিয়া ঘোমটা দিয়া তাড়াতাড়ি বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইল।

গোবর্ধন একগাল হাসিয়া মৃদু স্বরে বলিল, সিম্প্‌টম্‌স ঠিক মিলছে। ওমর খায়েম এ সম্বন্ধে—

হুটবিহারী তাড়াতাড়ি কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল, আস্তে, বারান্দা থেকে সব শোনা যায়।

গোবর্ধন একটু উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিল, হুটবিহারী, তোমার স্ত্রী শুনেছিলাম আপ-টু-ডেট, মডার্ন। কিন্তু ইনি দেখছি দিদিমা। আলাপ করতে আপত্তি কি? বাঘ ভালুক তো নই।

হুটবিহারী বারান্দায় গিয়া কিছুক্ষণ তর্ক করে। মালবিকা ঘোমটা খুলিয়াই বিছানার পাশে আসিয়া দাঁড়ায়। গোবর্ধন বলে, আপনাকে দেখে মেঘদূতের একটা শ্লোক মনে পড়ছে—

হস্তে লীলাকমলমলকে—

আমার অনুবাদটা দেখেছেন?

মালবিকা মৃদুস্বরে বলে, না।

কালই পাঠিয়ে দেব আপনাকে।

মালবিকা ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানায়। স্বামীর চাকরি বড় বালাই।

গোবর্ধনের হঠাৎ মনে হইল, মালবিকার চোখে একটা ইঙ্গিত ছলছল করিয়া উঠিল। সে বলিল, সিগারেট আছে হে? তুমি তো আবার খাও না।

হুটবিহারী তাড়াতাড়ি বলিল, তাতে কি, এক্ষুনি এনে দিচ্ছি। মালবিকা চাবিটা বাড়াইয়া দেয়। হুটবিহারী সিগারেটের পয়সা বাহির করিবার সঙ্গে সঙ্গে মালবিকার সেই কাগজের তাড়াটাও অলক্ষিতে বাহির করিয়া লইয়া চলিয়া যায়।

মালবিকা প্রমাদ গনে। কে জানে, হয়তো মদ খাইয়াই আসিয়াছে। গোবর্ধন পাশবালিশটা কোলের উপর টানিয়া লইয়া নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া বলে, দেখুন, মনকে দাবিয়ে রাখতে রাখতে আমাদের জাতটা

উচ্ছন্নে গেল। কিন্তু, একেবারে ম'রে না গেলে ও জিনিস তো দমবার নয়। নির্মল দেবের লেখা পড়েছেন?

মালবিকা পড়ে নাই।

স্বামীকেই একান্ত ক'রে ভালবাসতে হবে, এমন কথা কোনও শাস্ত্রেই লেখে না। ইউরোপের মেয়েরা— আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন না।

মালবিকা বসে না।

আপনার চিত্ত যে শুধু আর এই ঘরেই বদ্ধ নয়, আমার মন সে কথা জেনেছে। আপনি ভালবেসেছেন।

গোবর্ধন একটু সরিয়া বসে। মালবিকা ঘরের কোণের দিকে চায়। অন্ধকারে ঝাঁটাগাছটা দেখা যায় না।

মানব-মানবীর চিরন্তন দুঃখ দূর করবার জন্যে আমরা এই 'পরকীয়া-সংঘে'র প্রতিষ্ঠা করেছি। আপনার মনের রাধা এখন ক্রন্দসী। আমি তার চোখের জল—

সিগারেট আনিতে এত দেরি হওয়ার কথা নয়। পাশেই পানের দোকান। কিন্তু সিগারেট আনিবে কে? নুটবিহারী তখন বিপিনবাবুর চায়ের দোকানে বসিয়া মালবিকার নব-প্রণীত উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি সাগ্রহে পাঠ করিতেছে। 'তোমারই'র সন্ধান মিলিয়াছে। উপন্যাসের নায়িকা প্রেমাস্পদকে 'তোমারই—আমি' নাম দিয়া চিঠি লিখিয়াছে।

মালবিকা, মালা, আকাশ কারুর একার সম্পত্তি নয়। ওমর খায়েম বলেছেন—

গোবর্ধন খপ করিয়া মালবিকার হাত ধরে।

হঠাৎ হুটবিহারীর খেয়াল হয়, মালবিকাকে সে একলা গোবর্ধনের কাছে ফেলিয়া আসিয়াছে। সিগারেট কেনা হয় না, চিত্তাকর্ষক পাণ্ডুলিপি অসমাপ্ত রহিয়া যায়।

সিঁড়িতে ঠোকাঠুকি। পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে গোবর্ধন দ্রুত নামিতেছে।

কি হে, চ'লে যাচ্ছ যে? সিগারেট খাও!

বিশেষ জরুরি কাজ—

গোবর্ধন বাহির হইয়া যায়। মালবিকা বিছানায় মুখ গুঁজিয়া কাঁদিতেছে। ঝাঁটাগাছটা বিছানার উপর বিশ্রাম করিতেছে।

হুটবিহারী মোক্ষদাকে বক্ষে টানিয়া লয়, আর মালবিকা নয়। বলে, এবার আমার অপরাধ ক্ষমা কর মুখি। আর ভুল হবে না।

'পরকীয়া-সংঘে' নূতন সেক্রেটারি নিযুক্ত হইয়াছে। তবু দুঃখ নাই। কবি হুটবিহারী ঔপন্যাসিক মোক্ষদা দেবীর নিকট পরাস্ত হইয়াছে।

উটরাম সাহেবের টুপি

ছেলেবেলায় ওয়াশিংটন আর্‌ভিংয়ের লেখা স্কেচ-বুকে 'রিপ ভ্যান উইঙ্ক্‌ল্'-এর কথা পড়িয়া যেমন আমোদ পাইয়াছিলাম, বয়সকালে তেমনই আমাদের স্বদেশী রিপ ভ্যান উইঙ্ক্‌ল্ রামদাদাকে চাক্ষুষ দেখিয়া বেদনামিশ্রিত আমোদ পাইতাম। আমরা তখন নারিকেলডাঙ্গায় থাকিতাম। রামদাদা ছিলেন আমাদের প্রতিবেশী। তাঁহার পৈতৃক কিছু সম্পত্তি ছিল ; কলিকাতায় গোটা-তিনেক বাড়ি আর একটা চালের কল। অল্প বয়সেই পিতৃবিয়োগ হওয়াতে রামদাদাকে প্রথমটা লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ির ভাড়া আদায় আর কলের তদারক করিতে হইত। ইহার ফলে সংসারের এমন দুরবস্থা হইল যে, তাঁহার জননী পুত্রকে রেহাই দিয়া নিজেই কর্মচারী মারফৎ এসব দেখাশুনা করিতে লাগিলেন।

রামদাদা যৌবনে ভারি কল্পনাপ্রবণ ও দেশপ্রেমিক ছিলেন। তখন বঙ্গ-ভঙ্গের আন্দোলনে দেশ সরগরম। রামদাদাও মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। ফরাসী-বিপ্লবের ইতিহাস, ম্যাট্‌সিনি-গ্যারিবল্ডির জীবন-কথা, সিপাহী-বিদ্রোহের কথা ইত্যাদি পড়িয়া পাঁচজনের মত তাঁহার মনেও দেশমাতাকে স্বাধীন করার খেয়াল উঠে। ফলে তিনি রাজবিদ্রোহীদের দলে ভিড়িয়া যান। বৃদ্ধা মাতা কাঁদিয়া মাথা খুঁড়িয়া তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। দেশকে স্বাধীন করিতে হইবে—এই ইচ্ছাটাই তখন তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল। মানিকতলার বাগানে বোমার দলের মধ্যে তিনিও ধরা পড়েন, কিন্তু বিচার চলিতে চলিতেই বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বোমার দল ধরা পড়ার পরেই তাঁহার মাথার কিছু গোলযোগ ঘটিয়াছিল।

জেলের মধ্যে তিনি দিনরাত 'স্বাধীন ভারত,' 'স্বাধীন ভারত' বলিয়া চীৎকার করিতেন ও কাঁদিতেন, ডাক্তারে পরীক্ষা করিয়া বলে যে, লোকটি আস্ত পাগল।

ছাড়া পাইয়া তিনি বাড়িতেই থাকেন। মায়ের অপরিসীম যত্ন ও চেষ্টায় তাঁহার কাঁদুনি ভাবটা শীঘ্রই কাটিয়া গিয়াছিল, কিন্তু 'স্বাধীন ভারত' ভাবটা কাটিতে সময় লাগিয়াছিল। বহুদিন পর্যন্ত তাঁহার ধারণা ছিল যে, ১৯০৮ সালই চলিতেছে, ইংরেজরা ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত হইল বলিয়া। কাহারও সঙ্গে দেখা হইলে জিজ্ঞাসা করিতেন, কি ভায়া, আমাদের বারীনের খবর কিছু জান? কানাইলালের অসুখ দেখিয়া আসিয়াছিলাম, কেমন আছে বলিতে পার? আমরাও দাদাকে খুশি করিবার জন্য বলিতাম, রামদা, আজকের কাগজ বুঝি পড় নাই? এই দেখ, উহাদের মকদ্দমা তো ফাঁসিয়া গেল। অ্যানার্কিস্ট-দল আবার জোর কাজ শুরু করিয়াছে। জানিতাম, রামদাদা কখনও কাগজ দেখিতে চাহিবেন না। তাঁহার ধারণা ছিল, সরকারের তরফ হইতে কাগজ দেখিতে তাঁহাকে বারণ করা হইয়াছে। কাগজ পড়িলেই আবার তাঁহাকে জেলে পুরিবে।

পাঁচ-ছয় বৎসরের মধ্যেই এ ভাবটা তাঁহার কাটিয়া যায়। কিন্তু কোনও কারণে উত্তেজিত হইলেই তিনি আবার সেই ১৯০৮ সালে ফিরিয়া যাইতেন। গত ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের সময় চারিদিকেই যখন যুদ্ধের কথাবার্তা চলিত, তখন তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, অ্যানার্কিস্টদের সঙ্গে গবর্মেণ্টের যুদ্ধ চলিতেছে। রোজই যুদ্ধের খবর জিজ্ঞাসা করিতেন। আমরা বলিতাম, ইংরেজরা এবার কাবু হইল বলিয়া। দাদা মহাখুশি হইয়া উঠিতেন এবং ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে কি ভাবে চলিতে হইবে সে সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন। স্বাধীন ভারতবর্ষের

রাজকার্যপরিচালন-বিষয়ে তিনি একটা প্রকাণ্ড খসড়া তৈয়ার করিয়া ফেলিয়াছিলেন। পাড়ার ছেলে-বুড়া সকলকে ডাকিয়া মাঝে মাঝে সেটি পড়িয়া শোনাইতেন।

দাদার বরাবর ধারণা ছিল, তাঁহার পিছনে পুলিস আছে। আসলে টিকটিকি পুলিস কখনও তাঁহার খোঁজ লইত না। তাঁহার সম্বন্ধে অন্তত তাহারা নিশ্চিন্ত ছিল। রামদাদার মায়ের মৃত্যুর পর তাঁহার বিধবা দিদিই তাঁহাকে দেখাশুনা করিতেন। রামদাদা বিবাহ করেন নাই। একবার তাঁহার দিদি তাঁহার বিবাহের কথা পাড়িয়াছিলেন। দাদা ধমক দিয়া বলিয়াছিলেন, বিবাহ করিয়া ক্রীতদাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া কি হইবে? আগে ভারতবর্ষ স্বাধীন হউক, তাহার পর বিবাহের কথা ভাবা যাইবে। বিবাহ করার ইচ্ছা যে তাঁহার ছিল না, তাহা নহে। মাঝে মাঝে আমাদিগকে বলিতেন, ওহে, এবার আমার জন্যে কনে-টনে একটা দেখ, যেমন শুনিতেছি,—বিবাহ করিবার সময় তো আসিল। আমরা বলিতাম, সে তো ঠিকই আছে দাদা, এখন তুমি ইচ্ছা করিলেই হয়। দাদা বলিতেন, এই ন্যাশনাল পার্লামেণ্ট 'ওপেন' করিলেই দিন স্থির করা যাইবে, কি বল?

তারপর যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল। ১৯২১ সালও শেষ হইতে চলিল। দাদাকে সেই ভীষণ অ্যানাকিস্ট যুদ্ধের খবর এখনও দিতে হয়। দাদা জিজ্ঞাসা করিতেন, কি রে, এখনও যুদ্ধ শেষ হইল না? ইংরেজদের কি অন্য কোনও 'পাওয়ার' সাহায্য করিতেছে? বারীনের অর্গ্যানিজেশন তো খুব ভাল ছিল—এমন হইবার তো কথা নয়! একটু ইতস্তত করিয়া উত্তর দিতাম, আর দাদা, বলেন কেন, মুসলমানেরা যে বিশ্বাস-ঘাতকতা করিল! দাদা উৎসুক হইয়া বলিতেন, বটে! ভারতবর্ষ স্বাধীন হইলে তো তাহাদিগকে লইয়া বিপদে পড়িতে হইবে

দেখিতেছি! হিন্দু-মুসলমান 'রায়টে'র সময় বলিতাম, দাদা, মুসলমানদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হইতেছে। এটা চুকিয়া গেলেই আবার ইংরেজের সঙ্গে লাগিতে হইবে। দাদা বলিতেন, বারীনকে বলিয়া একটা মিটমাট করিয়া ফেল। গৃহবিবাদটা ভাল নয়।

দোকানে রাখিবার জন্য দাদা একটি গাদা বন্দুকের লাইসেন্স লইয়াছিলেন। দাদা প্রত্যহ দুটা-তিনটার সময় সেই বন্দুক কাঁধে নূতন খালের ওপারে সল্ট লেক বা 'বাদা'য় পাখি শিকার করিতেন। রাত্রে বাড়ি ফিরিতেন। মাঝে মাঝে বাদা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিতেন, ভারত স্বাধীন হইলে 'বাদা'টা বুজাইয়া ফেলিয়া ওখানে জাতীয় সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করাইতে হইবে। ফোর্ট উইলিয়মটা রাখা ঠিক হইবে না।

সেদিন বেঙ্গল কেমিক্যালের ফ্যাক্টরিতে সায়ান্স কংগ্রেসের সভ্যদিগকে একটা পার্টি দেওয়া হইয়াছিল। আমাদের কয়জনেরও নিমন্ত্রণ ছিল। সন্ধ্যার আগে ফিরিবার জন্য মানিকতলা মেন রোডের উপর ফ্যাক্টরির গেটের সামনে দাঁড়াইয়া কয়জনে জটলা করিতেছি, হঠাৎ দেখি, হাফপ্যান্ট-কোটধারী রামদাদা বন্দুক হাতে হন্তদন্তভাবে প্রায় ছুটিয়া কলিকাতার দিকে চলিয়াছেন, ভয়ানক উত্তেজিত ভাব। বুঝিলাম, দাদার মাথায় 'স্বাধীন ভারতে'র আবির্ভাব হইয়াছে। হাতে বন্দুক, পাছে একটা অঘটন ঘটাইয়া ফেলেন, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহাকে ধরিলাম। বলিলাম, দাদা, এ ভাবে কোথায় চলেছ? দাদা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, কি? এখনও শোন নাই? ভারতবর্ষ স্বাধীন হইয়াছে। উৎসাহের সহিত বলিলাম, তাই নাকি? খবর জানি না তো! দাদা হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, তোমরা না খবরের কাগজ পড়? এই দেখ।—বলিয়া হলুদ ও ঘি-তেল-মাখা একটা কাগজ আমাদের সামনে ধরিলেন। দেখিলাম, দুই-তিন দিন আগের

'দৈনিক বসুমতী'। ওই কাগজে মুড়িয়া রামদার দিদি তাঁহার সঙ্গে জলখাবার দিয়াছিলেন। পড়িয়া দেখি, বড় বড় অক্ষরে কাগজের গোড়াতেই লেখা—'স্বাধীনতা প্রস্তাব'। বুঝিলাম, কংগ্রেসের ইণ্ডিপেণ্ডেন্স রেজল্যুশনের বাংলা সংস্করণ। বলিলাম, তাই তো! তা এ ভাবে চলেছ কোথায়? দাদা বলিলেন, ব্যাপারটা সত্যি কি না, দেখতে যাচ্ছি।—বলিয়াই হনহন করিয়া চলিতে লাগিলেন, দাদার বন্দুকটা আগে হইতেই হাতে লইয়াছিলাম, সেটা আমার কাছেই রহিয়া গেল।

তাঁহাকে বাধা দেওয়া নিষ্ফল জানিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। বেচারার জন্য দুঃখ হইল। হায় রে স্বাধীন ভারত!

অনেক রাত্রে এদিকে সেদিকে আড্ডা দিয়া বাড়ি ফিরিয়া দাদার খোঁজ লইলাম, দেখি, দাদা বৈঠকখানায় হতাশভাবে বসিয়া আছেন, সামনে সেই ময়লা 'দৈনিক বসুমতী'। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি দাদা, কি দেখলে? রামদাদা উত্তর দিলেন না। আবার বলিলাম, কি হয়েছে বলই না, দাদা? দাদা হতাশকরুণ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, যাও, তোমরা সবাই জোচ্চোর, মিথ্যুক। ইংরেজ হটবার ছেলে নয়। ভারতবর্ষ আর স্বাধীন হ'ল না। তোমাদের সেই কনেটির অন্য জায়গায় বিয়ে দাও। বলিলাম, কি দেখলে বলই না রামদা, আমরা তো শুনেছি, আর এক বছর পরেই ভারত স্বাধীন হবে।

দাদা বলিলেন, না, তারও আশা নেই। কি দেখতে গিয়েছিলাম, জান? উটরাম সাহেব টুপি খুঁজে পেয়েছে কি না! পায় নি, তেমনই ভাবে ঘোড়ায় চেপে পেছনে চেয়ে আছে। যেদিন হারানো টুপি মাথায় উঠবে, সেদিনই ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ বিদায় নেবে—টুপি পাচ্ছে না ব'লেই তো ও যেতে পারছে না।

আমি হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিলাম। বুঝিলাম, দাদার মাথায় ঊনপঞ্চাশ পবন ভর করিয়াছে। কি বলিব, স্থির করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

রামদাদা বলিলেন, হাঁ ক'রে রইলে যে, কিছু বুঝতে পারছ না? পার্ক স্ট্রীট-চৌরঙ্গীর জংশনে জেনারেল উটরামের স্ট্যাচু দেখ নি? সেখানে ওর টুপিটা হারিয়ে গেল, ঘোড়ার লাগাম টেনে পেছন ফিরে টুপিটা দেখতে গিয়ে আর খুঁজে পেলে না, সেই তো হয়েছে গোল, নইলে কি আর এতদিন—

বলিলাম, দাদা, টুপি একটা মাথায় দিয়ে এলেই হয়! রামদাদা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, ভাই, বারীন তো সেই ভুলটাই করলে। কিন্তু তোমাদের এই কাগজগুলো কি মিথ্যুক বল তো? বলে, ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে! স্বাধীন হ'লে টুপি পেতেই হবে। মা আমাকে কি স্বপ্ন দিয়েছেন, জান?—ভারত মাতা? ভয়ানক স্বপ্ন!—

বলিতে বলিতে রামদাদার মুখভঙ্গী সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গেল, তাঁহার চোখে আর পলক পড়ে না, নাসারন্ধ্র বিস্ফারিত, কপাল ঘর্মাক্ত। আমারও কেমন ভয় করিতে লাগিল। মনে হইল, যেন বহু দূর হইতে যুগযুগান্তরের পূর্বের কোনও লোককে দেখিতেছি। হিপ্‌নটিজ্‌মে বিশ্বাস করিতাম, অর্ধোন্মাদ রামদাদা কি আমাকে হিপ্‌নটাইজ করিলেন?

সেদিন যাহাই ঘটিয়া থাকুক, সেদিনের কথা মনে হইলে এখনও আমি শিহরিয়া উঠি। রামদাদা অস্বাভাবিক গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন—মনে হইল, তিনি যেন বহু দূর হইতে কথা কহিতেছেন—

—শ্রাবণ-অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রি, গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছিল, আমরা দল বাঁধিয়া 'আনন্দমঠে'র সন্তানদের মত সেই অন্ধকারে পা টিপিয়া টিপিয়া মায়ের মন্দিরের দিকে চলিয়াছি। বারীনের হাতে জ্বলন্ত

মশাল, কানাইয়ের সৌম্য-সহাস মুখে অস্বাভাবিক দীপ্তি; প্রফুল্ল আর ক্ষুদিরামের আত্মা যেন মায়ের উত্তপ্ত অঞ্চলের মত আমাদের ঘিরিয়া আছে। উপীনদা গুনগুন করিয়া সুর ভাঁজিতে ভাঁজিতে চলিয়াছেন, 'বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি। ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।' —অন্ধকার নিবিড় হইয়া আসিল। আমরা এক কল্লোলময়ী নদীর তীরে ঝাউবনে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অদূরে এক শ্মশানভূমি। অসংখ্য চিতার আলোকে তীরভূমি আলোকিত, মাংস-পোড়ার গন্ধে নিশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল, অতি নিকটে শৃগাল-সারমেয়ের সম্মিলিত চীৎকার রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর জ্ঞাপন করিল। নলিনী জিজ্ঞাসা করিল, আর কত দূরে বারীনদা? বারীন বলিল, বিশ্বাস হারাইও না।

অকস্মাৎ তুমুল ঝটিকা উঠিল। নদীবক্ষ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। চিতার আগুন নিবিয়া গেল। বারীনের হাতের মশালও নিবিল। অন্ধকারে অনুভব করিলাম, অসংখ্য পিচ্ছিল-গাত্র সরীসৃপ আমাদের আশেপাশে কিলবিল করিতেছে। নদীজল কূল ছাপাইয়া তীরভূমি অতিক্রম করিয়া ছুটিয়াছে। বারীন চীৎকার করিয়া কহিল, আর বুঝি রক্ষা করিতে পারিলাম না। মায়ের মন্দির বুঝি এই কালরাত্রে ভাসিয়া যায়! বারীন উন্মত্তের মত দৌড়াইতে শুরু করিল। আমরাও ছুটিতে লাগিলাম। শুনিতে পাইলাম, পিছনে উন্মত্ত জলরাশি গর্জন করিতে করিতে ছুটিয়াছে। ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান চিন্তা লোপ পাইল। ঊর্ধ্বশ্বাসে বারীনের অনুসরণ করিয়া এক বিশাল প্রস্তরমন্দিরের প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যাহা দেখিলাম, তাহা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই। মন্দিরবেদী ত্যাগ করিয়া ভারতমাতা ছিন্নমস্তা মূর্তিতে মন্দিরপ্রাঙ্গণে নৃত্য করিতেছেন। রক্তধারায় প্রাঙ্গণ প্লাবিত। বারীন

'মা মা' বলিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল। অমনই দেখিতে দেখিতে অবাধ জলস্রোত আসিয়া পড়িল। সেই জলস্রোতের সহিত ভারতমাতার রক্ত মিশিয়া লোহিত আবর্তের সৃষ্টি করিল। বারীন ডুবিল, কানাই ডুবিল, নলিনী ডুবিল, আমি ডুবিলাম, ভারতমাতা কোথায় তলাইলেন!

নিমেষমধ্যে পট পরিবর্তিত হইল। দেখিলাম, আমরা পার্ক স্ট্রীট-চৌরঙ্গীর জংশনের কাছে সকলে মিলিয়া 'মা মা' বলিয়া চীৎকার করিতেছি। ষড়ৈশ্বর্যশালিনী মা সহসা মিউজিয়াম হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, দাঁড়াইয়া চীৎকার করিতেছিস কেন? দেখিতেছিস না, উটরামের টুপি পড়িয়া গিয়াছে, উটরাম টুপি খুঁজিয়া না পাইলে তো আমার প্রতিষ্ঠা হইবে না। দে, উহার টুপি খুঁজিয়া দে।—বলিয়াই মাতা হল অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডারসনের দোকানের ভিতর ঢুকিয়া গেলেন। বারীন অন্ধকারে টুপি হাতড়াইতে লাগিল। অমনই কতকগুলি শিকল ঝনঝন করিয়া উঠিল, আমার ঘুম ভাঙিয়া গেল।

দাদা চুপ করিলেন। আমার মাথা ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। গোপীনাথ সাহার কথা মনে পড়িল, হল অ্যাণ্ড অ্যাণ্ডারসন মনে পড়িল। আস্তে আস্তে বলিলাম, দাদা, টুপি রাস্তায় পড়েছে, যে পেয়েছে সে-ই নিয়ে গেছে, অনেক ফিরিঙ্গী-বাচ্চা তো ও-পথে যাতায়াত করে, ও-টুপি কি আর পাওয়া যাবে?

রামদাদা মৃদুস্বরে বলিলেন, তাই তো দেখছি, টুপি বুঝি আর পাওয়া যাবে না। তবে তোমাদের কাগজগুলো এত মিছে কথা লেখে কেন?

আমি বলিলাম, ওই রকমই।

আবার উটরাম সাহেবের টুপি

গত বৎসর কংগ্রেসের স্বাধীনতা-প্রস্তাবের খবর 'দৈনিক বসুমতী'র মারফতে প্রাপ্ত হইয়া স্বয়ং পার্ক স্ট্রীট-চৌরঙ্গীর জংশনে গিয়া আমাদের রামদাদা উটরামের টুপি দেখিতে না পাইয়া সেই যে বিষণ্ণ মুখে বাড়ি ফিরিয়াছিলেন, তারপর এক বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে আর দেখিতে পাই নাই। রাস্তার ধারে বাড়ির দাওয়ায় বসা তিনি একরূপ ছাড়িয়াই দিয়াছিলেন, এমন কি 'বাদা'য় শিকার করিতে পর্যন্ত যাইতেন না। পরাধীন ভারতের সকল দৈন্য ও লজ্জা আপনার অন্তরে বহন করিয়া তিনি গৃহকোণেই আপনাকে আবদ্ধ রাখিতেন। ক্বচিৎ কদাচিৎ দিদির তাড়া খাইয়া বাহিরে আসিলেও কোনও মনুষ্যাকৃতি জীবের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই তিনি আবার ঘরে গিয়া খিল দিতেন। শুনিতাম, তিনি রাত্রে নিদ্রা যান না। দিবারাত্র আপনার নির্দিষ্ট কক্ষে ম্লান মুখে মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পায়চারি করেন, এবং প্রতিবাসীরা এমন কথাও বলিয়া থাকেন যে, তাঁহারা রামদাদাদের বাড়ি বেড়াইতে গিয়া মাঝে মাঝে রামদাদার ঘরে ব্যথিত দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রান্ত চাপা কান্নার শব্দ শুনিতে পান। দিদি নিজে জোর-জবরদস্তি করিয়া তাঁহাকে খাইতে বাধ্য করেন বলিয়াই তিনি এতদিন জীবিত আছেন, তবে একটানা বিষাদের মধ্যে তাঁহার দেহ ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, চক্ষু কোটরে ঢুকিয়াছে, কিন্তু চোখের অস্বাভাবিক দীপ্তি বাড়িয়াছে। বহুদিন স্নানের অভাবে চুল রুক্ষ। মোটের উপর, মস্তিষ্কবিকৃতির জন্য যে নির্জন কারাগারের হাত হইতে তিনি বহুপূর্বে রক্ষা পাইয়াছিলেন,

এখন স্বয়ং সেই নির্জন কারাবাস বরণ করিয়াছেন। সহজবুদ্ধিসম্পন্ন অবিকৃতমস্তিষ্ক মানবের সঙ্গ তাঁহাকে পীড়া দেয়।

উপযাচক হইয়া রামদাদার সঙ্গে দেখা করিবার কথা বহুবার মনে হইয়াছে। সেই শান্ত গম্ভীর অস্বাভাবিক মূর্তিখানি দুই-একবার দেখিয়া লইয়া সংসারের গুরুভারশ্রান্ত চিত্তের গুরুত্ব লাঘবের ইচ্ছাও মাঝে মাঝে মনে জাগিয়াছে; কিন্তু ছাপাখানার কাজের চাপে তাহা আর করিয়া উঠিতে পারি নাই। তাহা ছাড়া রামদাদার মুখে সেই ভয়াবহ স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিয়া অবধি রামদাদাকে লইয়া উপহাস করিবার প্রবৃত্তি চলিয়া গিয়াছে। উন্মাদ জ্ঞান করিলেও সেদিন রামদাদার সম্মুখে নিজেকে অত্যন্ত ছোট মনে হইয়াছিল—'স্বাধীন ভারতে'র স্বপ্ন আমার নিকট ঠাট্টার বিষয় হইতে পারে, কিন্তু রামদাদার কাছে তাহা যে কত বড় সত্য তাহা সেদিনই বুঝিয়াছিলাম, তাই আর মিথ্যা বলিবার জন্য ভরসা করিয়া তাঁহার নিকট যাইতে পারি নাই। ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞের আগুন মানস-নেত্রে যিনি অহরহ প্রত্যক্ষ করিতেছেন, যাঁহার নিকট অরবিন্দ, বারীন, কানাইলাল, উল্লাসকর, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অগ্নিযুগের নেতারা আজিও সগৌরবে বর্তমান, তাঁহার স্মৃতি হইতে স্থান ও কালের কিছু অংশ নিঃশেষে মুছিয়া গেলেও, জানিয়া শুনিয়া উক্ত অরবিন্দ প্রভৃতিকে লইয়া মিথ্যা বলিবার জন্য আমি তাঁহার নিকট যাইতে প্রস্তুত ছিলাম না। রামদাদা যখন ভাবিতেছেন, হিমালয়ের পাদদেশে বারীন উপেন কানাই গোপনে তাঁহাদের সৈন্যদলকে চরম মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছেন, উল্লাসকর গুহাভ্যন্তরস্থ কারখানায় বসিয়া দিনের পর দিন কেবল বোমা আর বারুদ তৈয়ারি করিতে ব্যস্ত, অরবিন্দ ভারতের মানচিত্র সম্মুখে লইয়া কোথায় কি ভাবে কার্য—অ্যাক্‌শন শুরু করিতে হইবে তাহার চিন্তায় মগ্ন, তাঁহাকে তখন গিয়া কেমন করিয়া বলিব,

কানাইলাল বহুদিন হইল ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ দিয়াছে, অরবিন্দ সুদূর পণ্ডিচারীতে হঠযোগ সাধন করিতেছেন, বারীন গোপীভাবে মুগ্ধ হইয়া রসরচনা করিতেছেন, আর উপেন্দ্রনাথ মাসিক নির্দিষ্ট বেতনে 'ফরোয়ার্ড' পত্রে লেখনী-পেষণী বৃত্তি ধরিয়াছেন ও চুটকি লিখিয়া নাম কিনিতেছেন; কেমন করিয়া বলিব, উল্লাসকর বোমার বদলে আমের চাটনি প্রস্তুত করিতেছেন! সুতরাং রামদাদার কাছে আর যাওয়া হয় নাই।

ইতিমধ্যে কলিকাতা কংগ্রেস আসিয়া পড়িল। বিরাট আয়োজন, বিষম হট্টগোল, হৈ-চৈ। বাংলা মায়ের কোলজোড়া ছেলে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে বাংলার নবজাগ্রত তরুণ-সংঘের দুইজন বা ততোধিক একত্রিত হইলেই ফাঁকা জায়গা দেখিয়া লেফ্‌ট-রাইট-ক্রমে তালে তালে পা ফেলিয়া চলিতে লাগিল। সুবিখ্যাত 'দেশবন্ধু বাস' তরুণী ভলাণ্টিয়ারদের লইয়া পাড়ায় পাড়ায় হানা দিতে আরম্ভ করিল। 'ন্যাশনাল' সৈন্যদলের জন্য আট হাজার জোড়া বুট ও হাজার হাজার জোড়া খদ্দরের মিলিটারি হাফপ্যাণ্ট ও শার্টের অর্ডার চলিয়া গেল। খদ্দরের ক্যাপ ও পিস্তল রাখার খাপ তৈয়ারি হইতে লাগিল। বিউগ্‌ল্‌ ও বংশীধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত হইয়া উঠিল। পথেঘাটে নূতন জাতীয় সঙ্গীত ঐকতান-সহযোগে শ্রুত হইতে লাগিল—

কে আবার বাজায় বাঁশি এ ভাঙা কুঞ্জবনে!

'ফরোয়ার্ড' ও 'বাংলার কথা'য় নোটিসের উপর নোটিস। সেনাধ্যক্ষ সুভাষচন্দ্র নিজের বুকের দোষের কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া ডাক্তারের সাহায্যে ভলাণ্টিয়ার-সৈন্য বাছিতে লাগিলেন, যাহারা উচ্চতায় পাঁচ ফুট চার ইঞ্চির চাইতে কম এবং যাহাদের বুকের মাপ চৌত্রিশ ইঞ্চির বেশি নহে, তাহারা অমনোনীত হইয়া কাঁদিতে লাগিল। বসু-জায়া শ্রীমতী লতিকার নেতৃত্বে তরুণী সৈন্যদল ছাতে ছাতে কুচকাওয়াজ

করিতে লাগিলেন। পদাতিক-বাহিনীর সঙ্গে সঙ্গে অশ্বারোহী সৈন্যদলও বাছাই হইতে লাগিল। মোটর-বাসের জ্বালায় বহু ঠিকা-গাড়ি বেকার বসিয়া থাকিত, তাহারা মাসাধিক কালের জন্য ঘোড়া ভাড়া দিল; সেই সকল ঘোড়ায় সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘোড়সওয়ারেরা বালিগঞ্জের মাঠে অশ্বচালনা প্র্যাকৃটিস করিয়া মজবুত হইতে লাগিল। স্বয়ং সুভাষচন্দ্র একটি উপযুক্ত ঘোড়া বাছিয়া লইয়া ঘোড়ার জন্য চুমকির কাজ-করা সাজ ও নিজের জন্য জরির কাজ-করা এগারো শো টাকা মূল্যের এক সুট তৈয়ার করিয়া প্রমাণ-সাইজ আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নেতৃত্ব প্র্যাকৃটিস করিতে লাগিলেন।

ওদিকে বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় চিকিৎসা-কার্যে ইস্তফা দিয়া স্বরাজ-ফ্ল্যাগে লাল সাদা ও সবুজ কোন্ রঙের পর কোন্ রঙ ঠিক খাপ খায়, তাহা ভাবিয়া অস্থির হইতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার বন্ধু নলিনীরঞ্জন সরকারের সহযোগে পার্ক সার্কাসের মাঠের গোটাটাই 'লীজ' লইয়া 'স্বদেশী' করোগেটেড টিন দিয়া তাহা ঘিরিয়া ফেলিলেন। দেশবন্ধু-নগরের পত্তন হইল। বেড়ার উপর বেড়া, তরঙ্গায়িত টিনশ্রেণী, এক দিকে কংগ্রেস-মণ্ডপ, অন্য দিকে প্রদর্শনী-বিভাগ। কোথাও বা প্রদেশানুযায়ী বিভক্ত রসুইখানা, পোস্ট অফিস, রেলওয়ে অফিস, প্রদর্শনী অফিস, কংগ্রেস অফিস। গেটের উপর গেট উঠিতে লাগিল। কোনটা মসজিদের ধরনে, কোনটা মন্দিরাকৃতি। তাঁবুর পর তাঁবু পড়িতে লাগিল,—ডেলিগেটদিগের থাকিবার স্থান, স্বদেশী রেজিমেন্টের অফিস, হাসপাতাল, কত নাম করিব? বিরাট কংগ্রেস-প্যাণ্ডাল নির্মিত হইতে লাগিল। প্রদর্শনী-বিভাগেও সার বাঁধিয়া টিনের চালা বাঁধা হইল, কাঠের ঘর উঠিল, লোহার গগনস্পর্শী আলোক-স্তম্ভ নির্মিত হইতে লাগিল। স্বদেশ-প্রেমিক দোকানদারেরা নিঃস্বার্থভাবে পরিশ্রম করিতে লাগিলেন।

কেহই কিন্তু কর্তাদের আত্মীয়-বন্ধু নহেন। কেহ মোটরকার দিলেন, কেহ টিন, কেহ বাঁশ, কেহ কাঠ, কেউ বা চুন, সুরকি, সালু, কাপড়। বৈদ্যুতিক যন্ত্রের কারবারী একজন একনিষ্ঠ স্বদেশভক্ত আলোকের ব্যবস্থার ভার লইলেন, গাছে গাছে আলো, পার্ক সার্কাস আলোয় আলোকময়। প্রদর্শনী ও কংগ্রেস-মণ্ডপের প্রবেশ-পত্র ও প্রবেশ-চাকতিরই বা বাহার কত! কোনটি বা পার্চমেণ্টের, কোনটি খদ্দরের, কোনটি সীসার, লাল নীল সবুজ হলুদ নানা বিচিত্র রঙ! প্রদর্শনীতে এবং কংগ্রেস-প্যাণ্ডালের আশেপাশের উদ্বৃত্ত স্থানগুলি ভাড়া দেওয়া হইল। কর্তাদের সেলামি দিয়া কংগ্রেস-প্রদর্শনীতে জুয়াখেলার পর্যন্ত আমদানি হইল। যাঁহারা স্টল ভাড়া করিলেন, তাঁহারা গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, লরি, মোটরে প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে মাল চালান শুরু করিলেন, সেখানে কাঠ ও টিনের ঠকঠক ঠনঠন আওয়াজে কান পাতা দায়। প্রদর্শনী সজ্জিত হইল। আলো জ্বলিতে ও নিবিতে লাগিল। ট্রাম ও বাসে তিলধারণের স্থান রহিল না। জাতীয় সেনাদল কেহ-বা লাঠি কাঁধে, কেহ-বা ছড়ি হাতে কলিকাতার সর্বত্র টহল মারিয়া ফিরিতে লাগিল। সভাপতির শোভাযাত্রার জন্য পথে পথে তোরণ নির্মিত হইল—মোটের উপর এমন একটা ব্যাপার ঘটিল, যাহা 'ন ভূতো ন ভবিষ্যতি'।

আমরা একটা স্টল ভাড়া করিয়াছিলাম। কংগ্রেস-কর্তৃপক্ষের অপূর্ব স্বদেশী ব্যবস্থার দরুন বহু ছোট-বড় বিপদ অতিক্রম করিয়া প্রদর্শনী সাজাইবার আয়োজন করিতে লাগিলাম। নাওয়া-খাওয়ার সময় ছিল না। যখন দেহ ধূলিলিপ্ত ও মন বিফলকর্মক্লান্ত হইয়া উঠিত, তখন এক-একবার সেনাধ্যক্ষের তাঁবুর সন্নিকটে গমন করিয়া বিউগ্‌ল্ সহযোগে

তরুণ-তরুণী সেনাদলের ডাহিন ও বাম পদের একত্র পতন লক্ষ্য করিয়া মনটাকে চাঙ্গা করিয়া লইতাম, বিউগ্‌লে বাজিত—

কে আবার বাজায় বাঁশি এ ভাঙা কুঞ্জবনে!

মন বলিত, আর বিলম্ব নাই। কিন্তু ফিরিবার সময় গেটে টিকিটের হাঙ্গামা দেখিলেই মন বলিত, সুদূরপরাহত।

তারপর প্রেসিডেণ্ট আসিলেন, সেও এক কাণ্ড! মল্লিক-বাড়ির বড় তরফের বিবাহ তো ছেলেমানুষ! একশো এক তোপ, ছত্রিশ ঘোড়া, হাজার ঘোড়-সওয়ার, দুই হাজার মোটর-সওয়ার, বিশ হাজার পদাতিক পুরুষ-সৈন্য, দুই হাজার রমণী-বাহিনী, তিন কেতা ব্যাণ্ডের দল, পঁচিশটি তোরণদ্বার, কম-সে-কম পাঁচ লক্ষ দর্শক, বিউগ্‌ল্ ব্যাণ্ড বাঁশী, ঘোড়ার হ্রেষা, মানুষের বন্দেমাতরং ও জাতীয় সঙ্গীত 'কে আবার বাজায় বাঁশী এ ভাঙা কুঞ্জবনে'; ফোটোগ্রাফিক ক্যামেরার খুটখুট আওয়াজ; ফুলের মালা, কাগজের মালা, বাতাসা, খই। মনে পড়িল, সাত শতাব্দী পূর্বে মাত্র সপ্তদশ অশ্বারোহী যেদিন বঙ্গদেশে প্রবেশ করিয়াছিল, সেদিনও এমন আয়োজন হয় নাই। মনে পড়িল, পলাশী যুদ্ধের পর আম্রকানন-প্রত্যাগত বীরের দলও এমন ভাবে কলিকাতায় প্রবেশ করেন নাই।

ওদিকে শিয়ালদা এবং হাবড়া স্টেশনে কাতারে কাতারে দেশওয়ালী ও বিদেশীর দল রেলগাড়ি হইতে অবতরণ করিতে লাগিল। 'ফরোয়ার্ড' লিখিল, জাতীয় যজ্ঞে যোগদান করিতে দেশ-বিদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ লোক আসিতেছে। 'স্টেট্‌স্‌ম্যান' লিখিল, যজ্ঞ বটে, কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞ। সকলে ভাইসরয়'স কাপ খেলিতে আসিতেছে। প্ল্যাটফর্মে প্ল্যাটফর্মে জাতীয় সৈন্যদল 'কেউ ডেলিগেট আছেন' বলিয়া হাঁকিতে শুরু করিল। চারিদিকে শুনিয়া মনে হইতে লাগিল, যেন স্বাধীনতা-বিদ্যুৎ-তরঙ্গ

আকাশে বাতাসে খেলিতেছে, ফ্র্যাঙ্কলিন-সুভাষ ঘুড়ি উড়াইয়া তাহা ধরিয়া কাজে লাগাইলেন বলিয়া।

আমাদের সুভাষচন্দ্রকে ফ্র্যাঙ্কলিন বলিলাম বলিয়া অনেকে আপত্তি করিবেন। 'ফরোয়ার্ড' বাৎসরিক-সংখ্যায় সুভাষচন্দ্রকে ছবিতে মাইকেল কলিন্স বলা হইয়াছে। মাইকেল কলিন্সই বলা উচিত। ইংরেজ কর্তৃক নিপীড়িত আয়র্লণ্ড ও ভারতবর্ষের সামঞ্জস্য আছে। মাইকেল কলিন্স আয়র্লণ্ডের জাতীয় সৈন্যদলের নায়ক ছিলেন, সুভাষবাবু ভারতের নবজাগ্রত জাতীয়তার প্রতীক। মাইকেল কলিন্স গুলির আঘাতে মরিয়াছেন, সুভাষবাবু মরেন নাই বটে, কিন্তু বুকের দোষে মরিতে বসিয়াছিলেন। দুইজনের সাজের কিছু তফাত আছে, পিস্তল আর আর ছড়ির মাত্র তফাত। জরির কাজগুলি তরুণের নেতার বক্ষে তরুণীর শিল্পটীকা। মাইকেল কলিন্স মরিয়াছেন, সুভাষচন্দ্র বাঁচিয়া আছেন। সুভাষচন্দ্রের জয় হউক।

আর লতিকা বসু! তাঁহার কথা বলিব না। আয়র্লণ্ডে স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই, নতুবা 'ফরোয়ার্ডে' আর একজোড়া ছবি দেখিতে পাইতাম। ডি. ভ্যালেরা বেশি লম্বা, না বিধানবাবু বেশি লম্বা ইহা লইয়া সেদিন তর্ক উঠিয়াছিল। এসব তুলনায় নিজেদের খাটো করা হয়। আমাদের নলিনীরঞ্জন সরকার মহাশয়ের জোড়া আছে কি?

যাক, রামদাদার কথা হইতেছিল। 'স্বাধীন ভারত'-পাগল রামদাদাকে একবার বাহিরে টানিয়া আনিয়া স্বাধীনতার সন্ধিক্ষণে দেশের স্বাধীন হালচাল দেখাইয়া লইব ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু কাজের তাড়ায় তাহা আর হইয়া উঠে নাই। অবশ্য এ কথাও মনে হইয়াছিল যে, রামদাদা আমার চোখে কিছু দেখিবেন না। তাঁহার অন্তরে তীব্র আগুন নিশিদিন জ্বলিতেছে। তাঁহার চোখে হয়তো রঙ ধরিবে না।

৩১এ ডিসেম্বর রাত্রে নববর্ষে সাহেবপাড়ায় ফিরিঙ্গীদের নাচ দেখিতে গিয়া ক্লান্ত হইয়া ভোরের দিকে বাড়ি ফিরিয়া গভীরভাবে নিদ্রা যাইতেছি, হঠাৎ মাথায় প্রবল ঝাঁকানি খাইয়া উঠিয়া বসিলাম। নিদ্রাক্লান্ত চোখ মেলিয়া দেখি, আমাদের রামদাদা। এমনই চমক লাগিল যে, ঘুম একেবারে ছুটিয়া গেল, বলিলাম, রামদাদা যে, এত রাত্রে! রামদাদার মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইল, বলিলেন, রাত কোথা ভাই, ভোর হয়েছে, শিগগির ওঠ, গড়ের মাঠে আমাদের জাতীয় সেনাদলের প্যারেড হবে, দেখতে যাব। ভাবিলাম, স্বপ্ন দেখিতেছি, নতুবা এখনও তিন ঘণ্টা হয় নাই উহাদের মাতলামি দেখিয়া আসিয়াছি, এক ব্যাটা গোরার লাথি খাইতে খাইতে কোনও প্রকারে বাঁচিয়াছিলাম। এত অল্পকালের মধ্যে তাহারা পরাজিত ও বন্দী হইয়াছে এবং গড়ের মাঠে দেশী সৈনিকের প্যারেড হইতেছে, এরূপ ব্যাপার শুধু এদেশেই সম্ভব হইলেও রামদাদার কথায় প্রত্যয় হইল না। কচ্ছপের মত লেপের ভিতর হইতে মুখটি বাহির করিয়া আবার বালিশের উপর ঢলিয়া পড়িলাম। রামদাদা হাঁকিলেন, কেবলরাম, ওঠ, দেরি হয়ে যাচ্ছে। 'দূর ছাই' বলিয়া উঠিয়া বসিলাম এবং একটু রাগতস্বরে বলিলাম, ব্যাপার কি বলুন তো? জাতীয় সৈন্যদলের প্যারেড হবে, এ কথা কোথায় শুনলেন? রামদাদা একটা চেয়ারে আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া একটা অদ্ভুত সবজান্তা-গোছের হাসি হাসিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, ব্যাপারটা খুব গুহ্য, তবু তোমাকে না ব'লে পারলাম না, তুমি কারও কাছে প্রকাশ ক'রো না। ভাবিলাম, রামদাদা আবার কোনও দৈনিক কাগজ হইতে খবর সংগ্রহ করিয়া হয়-তো উল্লসিত হইয়াছেন। কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলাম, রামদাদা চেয়ারের উপর দুলিতে দুলিতে বলিতে লাগিলেন—

এবার আর তোমাদের মিথ্যুক কাগজের কথা নয়। মা স্বয়ং সংবাদ

দিতে আসিয়াছিলেন, একবার নয়, দুই দুই বার। পরশু রাত্রে খাওয়া সারিয়া অন্ধকার ঘরের জানালা দিয়া বাহিরের অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেশের দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতেছিলাম। মনে হইতেছিল, এই শাপভ্রষ্ট জাতির দুর্ভাগ্যের শেষ কখনও হইবে না। বংশে বংশে যুগে যুগে আমাদের পূর্বপুরুষেরা যে সকল সামাজিক পাপ করিয়া আসিয়াছেন, ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিরা দেশের দীনহীন মানুষকে প্রতিদিন পীড়ন করিয়া অপমান করিয়া স্বাধীনতার পথে যে প্রাচীর গাঁথিয়া তুলিয়াছেন, এই সকল পাপের প্রায়শ্চিত্ত কেহ করে নাই, পাপের বোঝা ভারী হইয়াই চলিয়াছে। মনে হইতেছিল, বারীন, অরবিন্দ, উপেন, সত্যেন সকলেই আমরা ভুল করিয়াছিলাম। বহু যুগের দুর্বুদ্ধির ফলে জাতির যে দাসত্ব, এক দিনের মায়ামন্ত্রে তাহা দূর হইতে পারে না। পৃথিবীর ইতিহাস ইহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। আমরা নিরর্থক জাতিহিংসা করিয়া গুপ্ত ঘাতকের মত পথে পথে বিচরণ করিয়া নিরীহ মানুষের রক্তপাত করিয়াছি, স্বাধীন হইবার পথ ইহা নহে। অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমার মনের দেবতাকে যেন সেখানে দেখিতে পাইলাম। জোড়করে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, প্রভু, পথ দেখাইয়া দাও। শুধু আমাকে নয়, বারীন, উপেন, কানাই, উল্লাস, হেমচন্দ্র, সকলকেই; আমার অপরিচিত যাহারা দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য অন্ধকার গুহায় অথবা গভীর অরণ্যে, বার্লিনের রাজপথে অথবা মস্কোর চা-খানায় সাধনা করিতেছে, মানুষ হইয়া মানুষকে হনন করিবার অস্ত্র প্রস্তুত করিতেছে, তাহাদিগের অজ্ঞানতা দূর কর; আমি আজ যেমন বুঝিতে পারিতেছি, সমস্ত জাতির স্বাধীনতা অপেক্ষা একটি মানুষের প্রাণের মূল্য বেশি, সকলের মনে এই বোধ জাগ্রত কর। ভাবিতে ভাবিতে পূর্বকৃত পাপের জন্য আমার চোখ

কাটিয়া দরদরধারে জল ঝরিতে লাগিল। আমার সম্মুখে অন্ধকার আকাশের স্তিমিত নক্ষত্রগুলি স্তিমিততর হইয়া মিলাইয়া গেল। খানিকটা চোখের জল পড়িয়া মনের আবেগ যখন শান্ত হইল, তখন সহসা আকাশের দিকে দৃষ্টি পড়িতেই দেখিলাম, কৃষ্ণাচতুর্থীর খণ্ডিত চাঁদ ম্লান আলো বিকীর্ণ করিতে করিতে নারিকেলবৃক্ষশ্রেণীর অন্তরাল হইতে আত্মপ্রকাশ করিতেছে, শিশিরভারাক্রান্ত আকাশের উপর জ্যোৎস্না যেন তুষারের মত দেখাইতেছে। আমি স্তম্ভিতভাবে শীতক্লান্ত পৌষরজনীর সেই নির্জন শোভা দেখিতে লাগিলাম। অনন্ত নক্ষত্রলোকের তলদেশে আমাদের এই বিরাট পৃথিবী কতটুকু! তাহার পরিচয় কি! দিকে দিকে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে যে নক্ষত্রপাত হইতেছে, কে তাহার হিসাব রাখে! মানুষের সুখ-দুঃখ স্বাধীনতা-পরাধীনতা বিরাট সমুদ্রবেলার ক্ষুদ্র বালুকণার পিপাসা!

রামদাদা চুপ করিলেন, তাঁহার চোখ দুইটা জলিতেছিল, তাঁহার মুখের দিকে বেশিক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না। দেওয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার ছিল, তাহারই ছবির পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম। রামদাদা বলিতে লাগিলেন—

অথচ এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পৃথিবীর ক্ষুদ্র মানব একাই তাহার মনের ভিতর সমগ্র বিশ্বকে ধরিয়া রাখিয়াছে। যেখানে সে ক্ষুদ্র, সেখানে কাহারও সহিত তাহার বিরোধ নাই; যেখানে সে বৃহৎ, সেখানেই সে বিরোধের সৃষ্টি করিতেছে। মস্কো জয় করিতে গিয়া মদগর্বিত নেপোলিয়ান হয়তো তাঁহার নিরীহ সৈন্যবৃন্দকে কীটপতঙ্গের অপেক্ষা বড় করিয়া দেখেন নাই। দেখিলে তাঁহার চলিত না। কিন্তু মানুষ যেখানে মানুষকে ভালবাসিয়াছে, শুধু চালনা করে নাই, সেখানে সে অত সহজে তাহাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলিয়া দিতে পারে না। বুদ্ধদেব

মৃত্যুকে জয় করিবার জন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, সমগ্র মানবের কল্যাণ-চিন্তায় তাঁহার নিদ্রা ছিল না, স্বস্তি ছিল না। বুদ্ধদেব কি মৃত্যুকে ভয় করিয়াছিলেন? না। তিনি মানুষকে মৃত্যুর অতীত, মৃত্যুর চাইতে অনেক বড় করিয়া দেখিয়াছিলেন। আমিও এক মুহূর্তের জন্য সেদিন যেন মানুষকে মৃত্যুর চাইতেও মহৎ বলিয়া দেখিতে পাইলাম। মনে হইল, বৃথা দ্বন্দ্ব, বৃথা বিরোধ। তফাত নাই। কাহার স্বাধীনতা কে কাড়িয়াছে!

সহসা এক অদ্ভুত ব্যাপার ঘটিল। চাঁদ তখন নারিকেলবৃক্ষশ্রেণীর ঊর্ধ্বদেশে উঠিয়া গিয়াছে, জ্যোৎস্না ঠিক আমার মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছিল; চাঁদের দিকে চাহিয়া হঠাৎ মনে হইল, শুক্লাম্বরপরিহিত। কৌমুদীকান্ত এক রমণীমূর্তি তাহা হইতে অবতরণ করিয়া আমার দিকে আসিতেছেন। তাঁহার কোলে এক শিশু। শিশু মায়ের অঞ্চল লইয়া খেলা করিতেছে। রমণীমূর্তি আমার ঠিক সম্মুখে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, আমায় চিনিতেছিস না! জলতরঙ্গপ্লাবিত মায়ের শূন্য মন্দিরের কথা মনে হইল, মন্দিরের 'ছিন্নমস্তা' মূর্তি দেখিয়াছিলাম, তবু এই লাবণ্যময়ী কল্যাণীকে চিনিতে বিলম্ব হইল না। 'মা মা' বলিয়া তাঁহার পদযুগল ধারণ করিলাম। মা আমাকে সস্নেহে উঠাইয়া ক্রোড়স্থ শিশুর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া কহিলেন, তোরা বুকের রক্ত দিয়া যাহা করিতে পারিস নাই, এই শিশু পুতুল খেলিয়া তাহা করিয়াছে। স্তন্য পান করিতে গিয়া এই শিশু পুতনা রাক্ষসীকে বধ করিয়াছে। অবাক হইয়া শিশুর মুখের পানে চাহিলাম, দেখিয়াই চিনিলাম, তোমাদের সুভাষচন্দ্র বসু। ক্যালেণ্ডারে তাঁহার ছবি দেখিয়াছিলাম। মা বলিলেন, তোমাদের পুরোহিত উপেন এখন ইহারই সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছে। এই শিশুই আমার ছিন্ন কন্থা দূর করিয়া আমায় রাণীর বেশে সাজাইয়াছে। ইহাকে প্রণাম কর।— শিশু কাঁদিয়া উঠিল। মা তাহাকে বক্ষে চাপিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, তোকে এখনও বিশ্বাস করিতেছে না। শুধু মায়ের কথায়

প্রণাম করিলাম। মা বলিলেন, কংগ্রেসে যাস নাই? শিশু খেলিতে খেলিতে পথ দেখাইয়াছে। সব প্রস্তুত। ছেলেমানুষ, এখনও ঘোড়ায় চড়িতে শিখিল না বলিয়া গোল বাধিতেছে। তুই ইহাকে ঘোড়ায় চড়া শিখাইতে পারিস?

কি উত্তর দিব ভাবিতেছি, হঠাৎ চন্দ্রকিরণ আমার মুখ হইতে অপসৃত হইল, মাকে আর দেখিতে পাইলাম না। সকালে উঠিয়াই পাড়ার তিনকড়ি মাস্টারকে সঙ্গে লইয়া কংগ্রেস দেখিতে গেলাম। মা ঠিকই বলিয়াছেন, আয়োজন সবই ঠিক আছে। বাঁশী শুধু অসি হইবার অপেক্ষা। আমার যৌবনের স্বপ্ন যে এত সহজেই সফল হইবে ভাবি নাই। আবার কাল রাত্রে আসিয়াছিলেন, বলিলেন, সুভাষ তোকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। আজ ভোরে তাহার সৈন্যেরা ফোর্ট উইলিয়ম জয় করিবে। আমাকে খবরটা দিতে বলিল।—

রামদাদা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, আর দেরি করা ঠিক হবে না। চল, ওই সঙ্গে পার্ক স্ট্রীট-চৌরঙ্গীর জংশনে উটরাম সাহেবকেও একটা সেলাম ক'রে আসি। আজই তো তার শেষ দিন।

এইবার আমার চোখে জল আসিল। হায় রে, মেয়েদের শৈশবের পুতুল-খেলা কৈশোর অতিক্রান্ত না হইতেই সত্য হইয়া উঠে, কিন্তু আজ তেতাল্লিশ বৎসর পূর্বে এই জাতি পুতুল-খেলা শুরু করিয়াছে। কিন্তু জাতির জীবনে সত্যকার খেলা আজিও শুরু হইল না। রামদাদার সরল বিশ্বাসে আর আঘাত দিতে ইচ্ছা হইল না, মিথ্যা করিয়া বলিলাম, দাদা, উটরাম সাহেব তো কালই চম্পট দিয়েছে, টুপি আর ঘোড়া ফেলে গেছে, আমাদের সুভাষবাবু তো সেই টুপি আর ঘোড়া ব্যবহার করছেন।

দাদা আনন্দে নাচিয়া উঠিলেন, বলিলেন, ব্যাটা আচ্ছা জব্দ হয়েছে, চল, তবু একবার যাওয়া যাক।

গড়ের মাঠে গেলাম না। দাদাকে বাড়ি পৌঁছাইয়া দিয়া দিদির হেফাজতে রাখিয়া আসিলাম। সেই হইতে রামদাদা বদ্ধ উন্মাদ হইয়া গিয়াছেন।

রামদাদার হাসি

ইতিমধ্যে একটা খারাপ মকদ্দমায় জড়াইয়া পড়িয়া উকিল-বাড়ি আর আদালতে ছোটাছুটি করিতে করিতে যথেষ্ট বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম। রামদাদা সম্বন্ধে বিশেষ খোঁজখবর লইতে পারি নাই। কিন্তু সামান্য অবকাশ পাইলেই রামদাদার স্মৃতি মনে উদিত হইয়া মনকে একটা অস্বস্তিকর খোঁচা দিত। আমার ধারণা ছিল, দাদা দিদির হেফাজতে অবরুদ্ধ অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছেন; দাদার সেই কারারুদ্ধ মূর্তি দেখিবার বিন্দুমাত্র বাসনা ছিল না।

তবু একদিন দেখিতে গেলাম। দোতলার একটা ঘরে দাদা বন্ধ ছিলেন। কোন প্রকার অসংযম নাই, বিছানা-বালিশ, টেবিল-চেয়ার ঘরের অন্যান্য আসবাবপত্র যথাস্থানে অবিকৃত অবস্থায় আছে। দাদার বেশভূষার কিছু পরিবর্তন হইয়াছে মাত্র; একেবারে মিলিটারি বেশে সুসজ্জিত অবস্থায় আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি নিজেই এক-একটা হুকুম সজোরে উচ্চারণ করিয়া একই স্থানে মার্চ করিতেছিলেন—লেফ্ট্ রাইট, মার্ক টাইম, রাইট হুইল, লেফ্ট্ হুইল, রাইট অ্যাবাউট টার্ন;—কিছুরই বেঠিক হইতেছিল না; অত্যন্ত গম্ভীর একাগ্র ভাব। আবার কোথা হইতে একটা তরবারিও সংগ্রহ করিয়াছেন দেখিলাম। তাহার সাহায্যে মাঝে মাঝে মিলিটারি স্যালুট প্র্যাক্টিসও চলিতেছিল। একটু লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া বুঝিলাম, সৈনিকের সাজটি কোনও বিদ্রোহী কংগ্রেস ভলান্টিয়ারের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, খাকী খদ্দরই বটে। আমি বহুক্ষণ জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিতান্ত ব্যথিত বিষণ্ণ চিত্তে দাদার এই অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। বহুবার দাদার সহিত চোখোচোখি হইল, দাদা গ্রাহ্যই করিলেন না।

এই দৃশ্যের একটা লঘু দিকও ছিল, কিন্তু তাহা আমার মনকে লঘু করিল না। ভারাক্রান্ত মন লইয়া ফিরিয়া যাইব ভাবিতেছি, হঠাৎ রামদাদা বজ্রনিনাদে হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, ট্রেটার! রাজদ্রোহী! —এবং সঙ্গে সঙ্গে উন্মুক্ত তরবারি-হস্তে জানালার ঠিক ধারে আসিয়া দাঁড়াইয়া কোনও অজ্ঞানিত কারণে ক্রোধে কাঁপিতে লাগিলেন। আমি নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া আত্মরক্ষার উপযুক্ত ব্যবধানে সরিয়া দাঁড়াইয়া বিনীতভাবে কহিলাম, রামদা, কাকে ট্রেটার বলছেন? আমি কেবলরাম, আমাকে চিনতে পারছেন না?

রামদাদার নাসা বিস্ফারিত, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতেছিল; হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন, কে কেবলরাম, আমি চিনি না। তুমি রাজদ্রোহী। সেনাপতির হুকুম অমান্য করিয়াছ। তোমাকে বন্দী করিব।

থতমত খাইয়া কি জবাব দিব ভাবিতেছি, রামদাদা চীৎকার করিয়া কহিলেন, তুমি পাটের চাষ করিয়া গুরুতর রাজদ্রোহ-অপরাধ করিয়াছ। সেনাপতি সুভাষের আদেশ জান না?

আপাদমস্তক নিজেকে একবার পরীক্ষা করিয়া লইলাম। রামদাদা পাটের কথা কি বলিতেছেন? হাতে একটা ফ্রেণ্ড্‌স্ সোসাইটি হইতে নূতন খরিদ-করা বস্ত্রের বাণ্ডিল ছিল, সেটা আমার নজরে পড়ে নাই। রামদাদা তাহারই দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কহিলেন, দুরাচার! পাটের চাষ করিয়া দেশের সর্বনাশ করিতে বসিয়াছ। দেশের নিরীহ দরিদ্র কৃষকের দারিদ্র্য বাড়াইতেছ। সেনাপতি সর্বত্র হুকুম জারি করিয়াছেন, তাঁহার অপমান করিতেছ।

পাটের চাষ দূরে থাক—পাট-বস্তুটি মাটির নীচে জন্মায়, না গাছে ফলস্বরূপ ফলিয়া থাকে, তাহাই জানিতাম না। অপরাধের মধ্যে, ফ্রেণ্ড্‌স্ সোসাইটির কাপড়ের পুঁটুলিটি পাটের দড়ি দিয়া বাঁধা ছিল। খবরের

কাগজগুলোর উপর বিষম রাগ হইল। দাদার ক্রোধ শান্ত করিবার জন্য বলিলাম, তাইতে তো আপনার কাছে এসেছি দাদা, যত বেটা দেশদ্রোহী দোকানদার পাটের চাষ ক'রে একটা ভীষণ অরাজকতার সৃষ্টি করছে, সেই খবরটাই আপনাকে গোপনে দিতে এলাম।

দাদা খুশি হইলেন। কহিলেন, সব নাম-ঠিকানা দিয়া যাও, অবিলম্বে বিহিত করিতে হইবে। দাদা তরবারি রাখিয়া কাগজ-কলম লইয়া বসিলেন। আমি আবোল-তাবোল কয়েকটা নাম লিখাইয়া দিয়া কহিলাম, তা হ'লে আমি যাই।

রামদাদা সস্মিত মুখে বলিলেন, তোমার নাম-ঠিকানাটাও দিয়া যাও। সেনাপতিকে তোমার কথা স্মরণ করাইয়া দিব।

দিদিকে দুই-চারিটি উপদেশ দিয়া দুঃখিত চিত্তে গৃহে ফিরিলাম। এমন মাটির মানুষের এমন পরিবর্তন!

এই ঘটনার পরে কিছুদিনের জন্য কলিকাতার বাহিরে যাইতে হইয়াছিল। কলিকাতায় ফিরিয়া শুনিলাম, রামদাদা নানা হাঙ্গামা-হুজ্জুত করিয়া বারীনদার সঙ্গে বিশেষ পরামর্শের জন্য পাড়ার ফটিক মাস্টারকে সঙ্গে লইয়া পণ্ডিচারী গিয়াছেন। বুঝিলাম, দিদিই বুদ্ধি করিয়া ফটিক মাস্টারকে সঙ্গে দিয়াছেন।

তারপর, রামদাদার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। হঠাৎ একদিন রামদাদার আবির্ভাব হইল, সরাসরি আমার বৈঠকখানায়। বায়ু-পরিবর্তনেও বিশেষ কিছু ফল হয় নাই। রামদাদা আসন গ্রহণ করিয়া প্রথম কথাই বলিলেন, সব জোচ্চোর! যত সব জোচ্চোরে মিলে একটা লীগ করেছে। মহাত্মা গান্ধী, মতিলাল নেহেরু, সুভাষ বসু, স্বরাজ্য-পার্টি, কংগ্রেস—সব জোচ্চোরের দল। কংগ্রেস ক'রে দেশ স্বাধীন হবে! মুণ্ডু হবে! ভাগ্যে বারীনের কাছে গিয়েছিলাম, তাই

সময় থাকতে এই ফাঁকিটা ধরতে পারলাম। তোমার জন্যেই বারীনকে সন্দেহ করেছিলাম। তুমি জোচ্চোর।

আমি হাঁ করিয়া দাদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। আর কিছু না হউক, দাদার ভাষাটা একটু প্রাকৃত-গোছের হইয়াছে দেখিলাম। কিন্তু এ আবার কি নূতন রকমের উপসর্গ আসিয়া জুটিল! বিনীতভাবে বলিলাম, দাদা, এসব কি বলছেন?

দাদা সজোরে চৌকির উপর একটা ঘুষি মারিয়া কহিলেন, আমি ভুল বুঝেছিলাম। বারীন ইজ রাইট। বরাবরই জানি, ও কাঁচা কাজ করবার ছেলে নয়। সেই যে সেবার একজন সন্ন্যাসী পাকড়াবার জন্যে সে সারা দেশটাকে চ'ষে ফেললে, তখন সবাই তাকে কি ঠাট্টাটাই না করেছিল! কিন্তু শেষে বাছাধনদের সব মুখ চুন। বারীন ইজ রাইট। সে সাধে প্রোপাগাণ্ডা ছেড়ে সেজদাদার আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছে! এই জোচ্চোরদের ভয়ে।

পণ্ডিচারী-আশ্রমে এই কয়দিনের মধ্যেই কি কাণ্ড ঘটিতে পারে ভাবিতে লাগিলাম। বারীনদা রামদাদাকে না জানি আবার কি বুঝাইয়াছেন।

হঠাৎ দাদা হুঙ্কার করিয়া উঠিলেন, তুমি হিঁদুর ছেলে, বেহ্ম হয়েছ? থতমত খাইয়া গেলাম। গোপনে ন্যাশনাল হোটেলে মুর্গীর কাটলেট খাইতাম। ধারণা ছিল, গরম খাইলে জাত যায় না। রামদাদা সে খবর পাইলেন কোথায়? কাতরভাবে কহিলাম, আমি! বেহ্ম! ছি! রামদাদা, আপনি ভুল শুনেছেন।

ভুল শুনি নি। তুমি হাস? প্রাণ-খোলা অশ্লীল চাষাড়ে হাসি হাসতে পার? তোমাকে তো কখনও হাসতে দেখি নি, তুমি নিশ্চয়ই বেহ্ম হয়েছ।

কখখনও না, শালগ্রাম-শিলা ছুঁয়ে—

রামদাদা হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, বারীন কি বললে শুনেছ? বারীন বললে, বেজ্ঞরাই দেশটাকে স্বাধীন হ'তে দিলে না। ছেলেরা যে ব'খে গিয়েছিল আর মেয়েরা যে বখতে বসেছিল, হাসি বন্ধ ক'রে তাদের বখাটা দিলে থামিয়ে। সব প্রোগ্রেস বন্ধ হয়ে গেল। বারীন বলে, ভাল ক'রে হাসতে জানলে বোমার দরকার হয় না।

আমি স্তম্ভিত হইলাম। সেই রামদাদা! সেই স্বপ্নপ্রবণ, কল্পনা-বিলাসী রামদাদা, যাঁহার চোখের দৃষ্টিতে একটা ইন্দ্রিয়াতীত জগতের সন্ধান পাইয়াছিলাম, তিনি বলিতেছেন, বোমার বদলে হাসি! বারীনদার উপর রাগ হইল, তিনি কি পাগলকে লইয়া রসিকতা করিবার অন্য বিষয় পাইলেন না?

রামদাদা বলিতে লাগিলেন, বারীন বলেছে, বেআব্রু হতে হবে, একেবারে উলঙ্গ। মণিকে দেখে এলাম, মণি। বুঝলে না? তোমাদের বড় কবি সুরেশ চক্রবর্ত্তী, গায়ে গণ্ডারের চামড়া, একেবারে ন্যাংটো, ক্ষ্যাপা। অমনিই হওয়া চাই। তোমাদের দিলীপ দেখলাম মণি বলতে অজ্ঞান। বারীন এখনও অতটা পারে নি, সাধনা করছে।

সাধনাশ্রম পণ্ডিচারীতে পাগলকে লইয়া রসিকতা করার একটা সীমা থাকা উচিত ছিল। দুর্গম সাধনমার্গে চলিতে গিয়া দেখিতেছি ইঁহারা সাধারণ লোক-ব্যবহারের কথা বিস্মৃত হইয়াছেন। কিন্তু দিলীপবাবুও তো আছেন! তাঁহার তো বেশী দিন হয় নাই!

রামদাদা মৃদুহাস্য করিয়া বলিলেন, বারীন বলেছে, দেশকে স্বাধীন করতে হ'লে উদোম উচ্ছৃঙ্খলতা চাই। মেয়েরা না বখলে চলবে না। তারা জড়পুঁটুলি হয়ে থাকাতেই তো দেশের এই দুরবস্থা হয়েছে। দেখ, আমার বিয়ে দিতে পার?

বহু দুঃখেও এবার আমার হাসি পাইল, কহিলাম, দাদা সে তো ঠিকই আছে, তুমি মত করলেই হয়।

রামদাদা একটু বিষণ্ণ হইলেন, ঘাড় নাড়িয়া কহিলেন, উঁহু, তোমাদের

সে মেয়ের কর্ম নয়। এই যেসব—যাদের নাম বেরিয়েছে, তাদের মত একটা কেউ,—না থাক, সে বারীন চেষ্টা করবে বলেছে। কিন্তু কই, তুমি হাসছ না যে!

কথাটা ঘুরাইয়া দিবার জন্য আমি হঠাৎ প্রশ্ন করিলাম, দাদা, অরবিন্দবাবু ভাল আছেন তো? কই, তাঁর কথা তো কিছুই বললেন না?

রামদাদা যেন আমার প্রশ্ন শুনিতেই পাইলেন না। বলিলেন, বারীন বলেছে, আনন্দ চাই, হাসি চাই, ধেই ধেই ক'রে নাচতে হবে।

বলিতে বলিতে উন্মাদ রামদাদা অকস্মাৎ অট্টহাসি জুড়িয়া দিলেন। মনে হইল, আমার পূর্বপুরুষের বহু প্রাচীন গৃহখানা পর্যন্ত যেন কাঁপিতে লাগিল। এরূপ হাসি অতিশয় সংক্রামক, অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি এই অট্টহাস্যে যোগ দিলাম। ভাগ্যে নিকটে কেহ ছিল না, থাকিলে আমাদের উভয়কেই বদ্ধ উন্মাদ ভাবিত।

হাসিতে হাসিতে রামদাদার একটা অপূর্ব ভাবান্তর হইল। চোখে পূর্বেকার সেই অস্বাভাবিক দীপ্তি, সেই স্বপ্নাভাষ! রামদাদা হঠাৎ আত্মসম্বরণ করিয়া, মুখে ডান হাতের তর্জনী স্পর্শ করিয়া মাথাটি ঈষৎ আনত করিলেন। অত্যন্ত মৃদুস্বরে কহিলেন, চুপ, শুনিতে পাইতেছ না?

এইবার আমার আনন্দ হইল, রামদাদা তাঁহার পুরাতন ক্লাসিকাল ভাষা ফিরিয়া পাইয়াছেন। ভয়ে ভয়ে উত্তর দিলাম, কই? না।

রামদাদা কান পাতিয়া কি যেন শুনিতে লাগিলেন, বলিলেন, এইবার শোন। শুনিতে পাইতেছ কি, লৌহশৃঙ্খল টুটিয়া খানখান হইয়া পড়িতেছে, তাহারই ঝনঝন শব্দ? আরও হাসি চাই, হাস, হাস, মা আমার স্বাধীন হইতেছেন, হাসির দমকে তাঁহার বন্ধন-শৃঙ্খল দূর করিব।

আবার সেই অট্টহাসি। হাসিতে হাসিতে রামদাদা দুই বাহু তুলিয়া তাণ্ডব-নৃত্য জুড়িয়া দিলেন। এবং কি জানি কেন অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে 'মা মা' বলিয়া আর্তনাদ করিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

আমি বিমূঢ় বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

রক্তজবা

সমস্ত দ্বিপ্রহর অফিসের খোলা দরজার পথে ঊর্ধ্বে ধূম্রকলঙ্কিত লঘু খণ্ডমেঘাচ্ছাদিত আকাশ এবং নিম্নে ইট কাঠ রাবিশ ও পুরাতন লৌহে ভরাট অতীতের কারবালা পুষ্করিণীর বর্তমান অসমতল বীভৎস রূপ ও তাহারই আশেপাশের ক্ষুদ্র বৃহৎ অট্টালিকা এবং নোংরা বস্তির ছাদ দেখিতে দেখিতে মন অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই বন্ধুর ভূমিখণ্ডের মাঝখানটায় পূর্বসমৃদ্ধ জলাশয়ের ভারাক্রান্ত জলাবশেষ যেখানে পঙ্কশয্যায় বাষ্পবুদ্বুদের দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছিল—রৌদ্রক্লান্ত মোটবাহী গাড়ির মহিষগুলি দ্বিপ্রহরে আজিও বপ্রক্রীড়ায় যে পঙ্কিল জলভাগকে আলোড়িত করিতে দ্বিধা করে নাই—তাহাও এখন আর দেখা যায় না, জমির মালিক সম্মুখে ঘর তুলিয়া সে আরাম-টুকুকেও অন্তরাল করিয়া দিয়াছে। সম্মুখের বস্তির মেথরদের অপোগণ্ড শিশুরা বহুকষ্টে সংগৃহীত অর্থে ক্রীত বিয়ারের বোতল লইয়া ঝাঁ-ঝাঁ রোদ্দুরে এখন আর প্রত্যেকে এক একটি ছোট্ট মাটির খুরি ও ঘুগনির চাট লইয়া মৌতাত করিতে বসে না; চারিদিকে প্রাচীর উঠিয়াছে, তাহারা হয়তো দেওয়ালের ওপারেই রোজকার মত মৌজ সারিয়া লইয়াছে। বিশ্বকর্মাপূজা কবে শেষ হইয়া গিয়াছে, আজ ঘুড়ি উড়াইয়াও কেহ চোখের অবকাশ সৃষ্টি করে নাই। একটা এরোপ্লেন ও একটা দিকভ্রষ্ট মাতাল ফানুস ধোঁয়া ছাড়িতে ছাড়িতে কিছুক্ষণের জন্য মনকে বিভ্রান্ত করিয়াছিল। আজিকার খোরাক সেইটুকুই।

পাশের কামরার দপ্তরীরা আমার অফিসঘরের সম্মুখের খোলা মেটে বারান্দায় তাহাদের উদ্বৃত্ত দুইখানা চৌকি ফেলিয়া রাখিয়াছিল,

তাহারই একটাতে বসিয়া বসিয়া দেখিতেছিলাম, ধোঁয়াটে নীল আকাশে কেমন করিয়া আসন্ন শীতের কুয়াশায় ম্লান কালো অন্ধকার নামিয়া আসে। মাথাটা একটু ধরিয়াছিল। পূর্ব-দিগন্তের পটভূমিতে টালিছাদওয়ালা তেতলা বাড়ি এবং আমার অতি প্রিয় নিষ্পত্র অষ্টাবক্র বৃক্ষপঞ্জরটিও যখন ধীরে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেল, তখন পশ্চিম-দিগন্তে মুখ ফিরাইলাম। ধোঁয়া আর অন্ধকারের পীড়নে পশ্চিমাকাশে রঙের শেষ আমেজটুকুও মিলাইয়া আসিতেছিল; ভূতপূর্ব ডাফ হস্টেলের বিপুলায়তন কোণটা খাড়া পাহাড়ের মত চোখের সামনে ধীরে ধীরে কালো হইয়া রেখামাত্রে পর্যবসিত হইয়া গেল। বসিয়া বসিয়া দেশের বর্তমান দুর্ভাগ্যের কথা ভাবিতে লাগিলাম। দুশ্চিন্তার পর দুশ্চিন্তা মাথায় ভিড় করিয়া চোখের পাতাকেও ভারী করিয়া তুলিতে লাগিল—ভাগ্য বিদেশী বেয়ারা তখন তোলা-উনুনটায় কয়লা দিয়া আগুন ধরাইয়াছে—ধোঁয়ার বন্যাস্রোত খোলা মাথার উপর দিয়া চলিয়া যাওয়াতে আমার মাথাটা একটু হালকা হইল। ভাবনার তবু বিরাম নাই। ভাবিতে লাগিলাম, রাউণ্ড টেব্‌ল কন্‌ফারেন্স তো ফাঁসিয়া গেল, মহাত্মা গান্ধী দেশে ফিরিতেছেন। আবার আইন-অমান্য শুরু হইবে; খবরের কাগজগুলা পড়িয়া মনে হয়, নেতারা জনসাধারণকে উপদেশ দিবার জন্য কেহই বাহিরে থাকিবেন না। যিনি দোর্দণ্ড প্রতাপে বিদ্রোহী আয়র্লণ্ডকে শাসন করিয়াছেন, বাংলাদেশের ভাগ্যে তিনিই আসিলেন গবর্নর হইয়া! এমনিতেই তো বেকার বাঙালী যুবকের ভাবনার অন্ত নাই—অর্ডিন্যান্স-প্রপীড়িত দেশে তাহারা কি নিশ্চিন্তে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারিবে? ভাবিতে ভাবিতে ব্যবসাবাণিজ্যের দুর্গতির কথা, সাহিত্য বেচিয়া এই দুদিনে অন্নসংস্থানের কথাও মনে হইল। হাসিয়া, দাঁত দেখাইয়া, মুখ ভ্যাংচাইয়া, সমালোচকের চাবুক হাতে

রসসৃষ্টি ও রসভঙ্গ করিবার সময় আর থাকিবে না—'শনিবারের চিঠি'কে হয়তো ভিন্ন মূর্তি ধরিতে হইবে—তা ছাড়া, কাগজ কিনিয়া পড়িবে কে? ভাবিয়া ভাবিয়া ভাবনা-সমুদ্রে কোনও কূলকিনারা দেখিলাম না। হঠাৎ ছেলেটার কথা মনে হইল, কাল পা পিছলাইয়া ফুটন্ত ভাতের ফ্যানে পড়িয়া তাহার বাঁ হাতখানা পুড়িয়া গিয়াছে—বড় কষ্ট পাইতেছে। হয়তো কাঁদিতেছে, এখানে এই ভাবে বসিয়া আবোল-তাবোল চিন্তা করার চাইতে তাহাকে কোলে লইয়া বসিলে হয়তো সে কিছু আরাম পাইবে—চুরুটের শেষটুকু যত দূরে পারি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া উঠিতে যাইব, হঠাৎ এক প্রচণ্ড থাবা কাঁধের উপর পড়িল, ভারী গলায় কে যেন বলিল, এই যে কেবলরাম ভায়া, ঠিক ধরেছি কিন্তু—

চমকাইয়া উঠিলাম, রামদাদার গলা। ঘাড় ফিরাইয়া দেখি, রামদাদাই বটেন। অপরূপ মূর্তি। সযত্নবিন্যস্ত চুল, সুন্দর ফর্সা মুখ, টিকলো নাক এবং পরিপাটী করিয়া ছাঁটা ছুঁচলো চাপদাড়ি—রূপকথার রাজপুত্র বলিয়া ভ্রম হইল। খালি পা, গরদের ধুতি এবং সমস্ত দেহ বেড়িয়া একটি গরদের চাদর। সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া রামদাদাকে জড়াইয়া ধরিলাম। মনে হইল, দাদার মস্তিষ্কবিকৃতি কে যেন মায়ামন্ত্রে দূর করিয়াছে; আনন্দের আবেগ ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। চাদরের ভিতরে দাদার বাঁ হাতটা সজোরে চাপিয়া ধরিয়া বলিলাম, রামদা, তুমি? দিদি কোথায়?—দাদা অস্ফুট আর্তনাদ করিয়া বাঁ হাতটি সন্তর্পণে চাদর হইতে বাহির করিয়া দেখাইলেন। কব্জি হইতে আঙুল অবধি ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা। জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দাদার দিকে চাহিলাম, শান্ত ম্লান হাসি হাসিয়া তিনি বলিলেন, পরে শুনবি, সে অনেক কথা।

আমি বলিলাম, দিদি?

রামদাদা কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকিয়া বলিলেন, দিদি নেই। আমৃত্যু

তিনি আমার কল্যাণ কামনা ক'রে গেছেন, মৃত্যুর পরপার থেকেও ওই দেখ—

ধোঁয়াটে কালো আকাশের বক্ষ ভেদ করিয়া একটা খসিয়া পড়া তারা প্রচণ্ড গতিতে জ্বলিতে জ্বলিতে নীচে নামিতেছিল। দাদা বলিলেন, আমি রোজই দিদিকে দেখতে পাই।

বুঝিলাম, মাথার গোলযোগ এখনও আছে, তবু ভাল লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি হঠাৎ আমার কাছে এলে যে! আমি যে এখানে আছি, তোমায় কে বললে?

রামদাদা দপ্তরীদের সেই জীর্ণ চৌকিতেই আসনপিঁড়ি হইয়া বসিলেন ও দুলিতে দুলিতে বলিতে লাগিলেন, মা বলেছেন। তিনিই আমাকে তোর কাছে পাঠিয়েছেন। তোকে তাঁর প্রয়োজন আছে।

মা?

হ্যাঁ, মা, মহাকালী, কালভৈরবী! দেখ্, তোদের কাগজের ওপর থেকে মুরগীর ছবিটা সরাতে হবে, মা বলেছেন, মুরগীর বদলে রক্তজবা।

হেমন্তের ধোঁয়াটে সন্ধ্যায় খোলা আকাশের নীচে বসিয়া আমার মনে যে চিন্তা অস্পষ্টভাবে উদিত হইয়াছিল, রামদাদার কথা যেন তাহাকেই স্পষ্ট রূপ দিল—মুরগীর বদলে রক্তজবা!

আমি কথা কহিলাম না। বিহ্বলভাবে দাদার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। দাদা বলিলেন, অবাক হচ্ছিস?

সম্মুখের খোলা মাঠটায় ব্যগ্র দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া দাদা কি যেন খুঁজিতে লাগিলেন। আমাদেরই দরজার পাশে প্রাচীর তুলিবার জন্য ভিত খুঁড়িয়া এক দিকে অনেকখানি মাটি ঢিপি করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই দিকে দক্ষিণ-করাঙ্গুলি প্রসারিত করিয়া দাদা বলিলেন, সামনের জায়গাটাও কি তোর এলাকায়?

বিস্মিত হইয়া বলিলাম, না, কেন বল তো ?

দাদা বলিলেন, ওখানে সারি সারি রক্তজবার গাছ লাগাতে হবে। রক্তজবা না হ'লে মায়ের পুজো হবে না। সারা বাংলাদেশে রক্তজবার গাছ বেশি নেই, মায়ের পুজো হবে কিসে ?

হায় রে! সেই রামদাদাই আছেন। উটরামের টুপির বদলে রক্তজবা! আমাকে নীরব দেখিয়া রামদাদা যেন একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন, বলিলেন, এ জায়গার মালিক কে ?

আমার হাসি পাইল, বলিলাম, মহেন্দ্র শ্রীমানি। কেন বল তো ?

দাদা বলিলেন, জায়গাটা লীজ নিতে হবে। জবাফুলের চাষ করব।

শুধু ধোঁয়া আর ইট-কাঠ দেখিয়া আজ দুপুরবেলায় যে ভাবে পীড়িত হইয়াছিলাম, তাহাতে মনে হইল, আমার ঘরের সম্মুখে থরে থরে রক্তজবা ফুটিয়া থাকিলে সময় মন্দ কাটিবে না। কথাটা ঘুরাইয়া দিবার জন্য বলিলাম, দাদা, তোমার হাতে কি হয়েছে তা তো বললে না ? হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কেন ?

দাদা যেন হঠাৎ ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিলেন, বলিলেন, যাঃ, ভুলেই গেলাম, বাইরে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে, তোকে এখনই যেতে হবে।

কোথায় যেতে হবে ?

মায়ের কাছে। তোকে দীক্ষা নিতে হবে। তোর ভাগ্য ভাল, মা স্বয়ং তোকে স্মরণ করেছেন। ওঠ্, আলোয়ানটা নে, অনেক দূরে যেতে হবে।

থতমত খাইয়া বলিলাম, কোথায় ?

দাদা আমার কথার জবাব না দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, গাড়িতে যেতে যেতে বলব, কই, ঘরে চাবি বন্ধ করলি না ?

গত্যন্তর না দেখিয়াও বটে, আবার কতকটা কৌতূহলের বশবর্তী হইয়াও বটে, দরজায় চাবি লাগাইয়া আলোয়ান কাঁধে দাদার অনুগমন করিয়া ট্যাক্সিতে গিয়া উঠিলাম। দাদা হুকুম দিলেন, চালাও, সোজা ঝিনিদহ। তেল আছে তো পাঁয়জী ?

পাঁয়জী পাগড়ি খুলিয়া আবার বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, জী হুজুর।

ঝিনিদহ ? বনগাঁ ছাড়িয়া যশোর, যশোর ছাড়াইয়া ঝিনিদহ। আজ পাগলের পাল্লায় পড়িয়া বেঘোরে মৃত্যু নিশ্চয়। খোকার এই অবস্থা, বাড়িতে একটা খবরও দিতে পারিলাম না।

রাত্রি তখন সাড়ে সাতটা। শীতের রাত্রে সামান্য আলোয়ান ছাড়া গরম কাপড় ছিল না। গাড়ি হু-হু করিয়া ছুটিয়াছে—হঠাৎ-আক্রান্ত বাতাস ঝড়ের বেগে কানে ও গায়ে লাগিয়া কাঁপুনি ধরাইয়া দিল, কোনও রকমে নিজেকে ঢাকিয়া-ঢুকিয়া বসিলাম। চুরুট ধরাইবার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও চুপ করিয়া থাকিতে হইল—রামদাদা পাগল হইলেও তাঁহার সম্মুখে অতটা বেয়াদপি করিতে পারিলাম না।

বেলগাছিয়া, দমদম। রাস্তার আলো ঝাপসা—পথ জনবিরল হইয়া আসিতে লাগিল। গাড়ির হেড-লাইটে সম্মুখবর্তী পথের সন্ত্রস্ত ব্যাঙ প্রভৃতি নিরীহ জানোয়ারদের চাঞ্চল্য, মন্থরগতি গাড়ির গরু ও মহিষদলের চোখের বিহ্বল দৃষ্টি দেখিতে দেখিতে চলিলাম। পিছনে ধূলির ঝড়।

বারাসত। শৃগালের আর্ত চীৎকার। পথের দুই ধারে দুটি ইটের মিনার মাথা খাড়া করিয়া আছে। ডাহিনে বিস্তীর্ণ ধানের ক্ষেত দূরে রেল-লাইন পর্যন্ত বিস্তৃত। বৃহৎ সরীসৃপের মত আলোকিত বক্ষপঞ্জর লইয়া একটা ট্রেন ধূম উদ্গীরণ করিতে করিতে কলিকাতার দিকে চলিয়া গেল।

রামদাদা এতক্ষণ কথা কহেন নাই, আমার বাম হাতখানি তাঁহার ডান হাতের মুঠির মধ্যে ধরিয়া তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া ছিলেন। হঠাৎ স্বপ্নোত্থিতের মত চোখ মেলিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, আমার দিকে চাহিয়া গম্ভীর গলায় কহিলেন—সেই হিপ্‌নটিজ্‌মের ভাষা, চক্ষে সেই স্বপ্নাভাষ—আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনিতে লাগিলাম।

দত্তপুকুর, গোবরডাঙ্গা। কৃষ্ণা-চতুর্থীর চাঁদ তিমির-স্নান সারিয়া কুয়াশাক্লিষ্ট আকাশ ভেদ করিয়া একটা খণ্ডিত সুবৃহৎ অগ্নিগোলকের মত নিরালম্বভাবে অন্ধকারে কাঁপিতেছে—হঠাৎ দেখিলে বোধ হয়, যেন অন্ধকার আকাশের পূর্ব-উত্তর সীমান্তের বনভূমির ঠিক শীর্ষদেশে আগুন ধরিয়া গিয়াছে।

রামদাদা বলিতে লাগিলেন, তিন ঘণ্টা পূর্বে আমি যখন এই পথ দিয়া এই গাড়িতেই কলিকাতা যাইতেছিলাম, তখন দিনের আলোক ছিল, লোকালয়ের উপরিভাগে দোদুল্যমান ধূম্রপুঞ্জ ও পথের ধূলি তখন দৃষ্টিগোচর ছিল, গাড়িটার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখিতে পাইতেছিলাম, অসীম অনন্ত পথে যাত্রা করিয়াছি—এই ভাব কিছুতেই মনে আনিতে পারি নাই, কিন্তু এখন আমি মনে করিতেই পারিতেছি না যে, পৃথিবীর ধূলিকঙ্করাস্তীর্ণ বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া আমরা ছুটিয়াছি; মনে হইতেছে, সীমাহীন শূন্যে ওই সন্তরণশীল নিঃসঙ্গ চন্দ্রের মত চলিয়াছি, প্রচণ্ড আমার গতি, কিন্তু কক্ষ সুনির্দিষ্ট। কোথায় চলিয়াছি জানিস?—মহাকালীর মন্দিরে। এই অবস্থায় তোর মনে করিতে কষ্ট হইবে না যে, সে মন্দির এই ধরার ধূলির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, এই হতভাগ্য বাংলায় নহে—অসীম শূন্যে ওই নিবিড় তমিস্রার রাজ্যে মায়ের পূজাবেদী, উলঙ্গিনী মা আমার শানিত খড়্গে অন্ধকার মহিষাসুরকে খণ্ড-বিখণ্ডিত করিতেছেন, কবন্ধ অন্ধকারের রক্তধারায় কালো আকাশ লাল হইয়া

গেল—সেই ধারা গলিয়া গলিয়া পড়িতেছে ধরার ধূলায়—রক্তজবার গাছে রক্তজবা থরে থরে ফুটিয়া উঠিল। মায়ের খড়্গাঘাতে ছিন্নবিছিন্ন তিমিররাক্ষসের রক্তধারায় মায়ের পূজা করিতে হইবে, মায়ের পূজার একমাত্র উপচার—রক্তজবা।

কাল ভোরে যখন ঘুম ভাঙিল, বিছানায় উঠিয়া বসিয়া চোখ রগড়াইয়া মাকে আমার ঠিক সম্মুখে প্রত্যক্ষ করিলাম—দিনের আলোকে মা আমার তিমিরবরণী। ম্লান করুণ তাঁর দৃষ্টি, হাতে খড়্গ নাই, বরাভয়ও নাই, ভিক্ষাপাত্রও ছিল না, কিন্তু ভিক্ষার আকৃতি ছিল। অত্যন্ত ক্ষীণ কণ্ঠে মা বলিলেন, বৎস, আমি আসিয়াছি, তোর ঘুম এখনও ভাঙিল না! অন্ধকার অরণ্যগর্ভে অসহায় অবস্থায় পড়িয়া পড়িয়া আমি যুগযুগান্ত ধরিয়া কাঁদিতেছি, আমার শিরে মন্দিরের আবরণ নাই, আমার পূজাবেদী ধূলায় মিশিয়াছে। আমি ক্ষুধিত, বহুকাল পূজা পাই নাই। ভক্ত সন্তানেরা আমায় বিস্মৃত হইয়াছে। আমার পূজোপচার সংগ্রহ করিতে গিয়া কবে যে সেই তাহারা অরণ্যে পথ হারাইল, আজিও পথ খুঁজিয়া পাইল না। সন্তানের জন্য পথ চাহিয়া চাহিয়া আমার নয়নের অশ্রু শুকাইল, চক্ষু অন্ধ হইল, আমার স্তনদুগ্ধ ক্ষরিয়া ক্ষরিয়া অরণ্যের ধূলি-কঙ্করে নদী বহিল, অরণ্যের শৃগাল সারমেয় আমার বক্ষের সেই পূত দুগ্ধধারা লেহন করিয়া গেল, আমার সম্মুখে প্রশস্ত পথ—দুর্ভাগ্য সন্তানদল যে পথ আজিও খুঁজিয়া পাইল না—আমারই চোখের সম্মুখে ধীরে ধীরে কণ্টক-গুল্মে অপরিসর হইতে হইতে দুর্ভেদ্য বনভূমিতে বিলীন হইয়া গেল, আমি প্রতীক্ষা করিতে করিতে পাষাণ হইয়া গেলাম।

বৎস, কেমন করিয়া জানি না, আজ আমার মোহনিদ্রা ভাঙিল। জাগিয়া দেখিলাম, হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য-প্রদেশে আমি একা

পাষাণদেহ লইয়া পড়িয়া আছি, সমস্ত বনভূমি ব্যাপিয়া যেন একটা আর্ত হাহাকার-ধ্বনি উঠিয়াছে ; আমার মনে হইল, আমার কোলের সন্তান কোথায় যেন ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতেছে। মা হইয়া স্থির থাকিতে পারিলাম না। বহুকষ্টে সেই দুর্গম বনভূমি ভেদ করিয়া পথ করিতে করিতে ক্ষতবিক্ষত চরণে আমি আসিয়াছি, তুই রামচন্দ্র—পদস্পর্শে নয়, পূজা-নিবেদন করিয়া পাষাণী জননীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা কর্। রক্তজবায় মায়ের পূজা করিতে পারিবি কি ?

পারিব।—বলিয়া মায়ের চরণ জড়াইয়া ধরিতে গেলাম, পাষাণ মেঝেতে আঘাত পাইলাম। কোথায় মা? কিন্তু মা যে সত্যই আসিয়াছিলেন, তাঁহার চরণের রক্তরেখা আমার মেঝেতে পড়িয়াছে। আমি উন্মাদের মত মাকে খুঁজিতে বাহির হইলাম। কে সন্ধান দিবে ?

বনগ্রাম পার হইয়া গেল, ইছামতীর শীর্ণ জলধারা চকিতে চন্দ্রকিরণে ঝলসিয়া উঠিল। রামদাদার চক্ষু দুইটি আগুন-শিখার মত জ্বলিতে লাগিল, সেই চোখের দৃষ্টি আমাকে বাহিরের সকল অনুভূতি হইতে দূরে লইয়া গিয়াছিল। পায়জী শীতে কাঁপিতেছিল, কিন্তু আমার কিছুমাত্র শীত লাগিতেছিল না।

রামদাদা বলিতে লাগিলেন, রাত্রে বিভূতি মাস্টারের সঙ্গে দেখা। তাহাকে মায়ের আগমন-সংবাদ দিলাম। সে বলিল, মা কোথায় আছেন, সে বলিতে পারে। ব্যাকুল আগ্রহে বিভূতিকে জড়াইয়া ধরিলাম, বলিলাম, শীঘ্র বল, আমাকে এখনই যাইতে হইবে। আজ সমস্ত দিন মায়ের সন্ধানে পথে পথে বৃথাই ঘুরিয়াছি। বিভূতি বলিল, সে শুনিয়াছে, মা ঝিনিদহের কাছে এক গভীর জঙ্গলে পড়িয়া আছেন।

আমি আর অপেক্ষা করিলাম না, গাড়ি করিয়া সমস্ত কলিকাতা শহর তোলপাড় করিয়া খুঁজিয়াও সেই রাত্রে কোথাও রক্তজবা সংগ্রহ

করিতে পারিলাম না। মা আমাকে রামচন্দ্র বলিয়াছেন, বাড়ি হইতে একটা খড়্গ সঙ্গে লইলাম—তারপর—

যশোর ঘুমন্ত শ্মশানপুরী, ঝিনিদহ। দুই পাশে গভীর অরণ্য—আবছা-অন্ধকারে বিরাট প্রাচীরের মত দেখাইতেছিল। অন্ধকার তখন ফিকা হইয়া আসিয়াছে, গাছে গাছে পাখিদের পক্ষবিধূনন-শব্দ—বনভূমিতে ঈষৎ চাঞ্চল্য শুরু হইয়াছে।

গাড়ির বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল। শেষে এক সঙ্কীর্ণ মেটে পথের উপর আসিয়া গাড়ি থামিল। রামদাদা বলিলেন, নাম।

গাড়ি হইতে নামিতেই অত্যন্ত শীত বোধ হইতে লাগিল। তখন প্রায় ভোর হইয়াছে। পূর্বাকাশে আবীরের ছোপ। রামদাদার অনুসরণ করিয়া ভিজা ধূলার উপর পদচিহ্ন অঙ্কিত করিতে করিতে কষ্টে পথ চলিতে লাগিলাম। পথ সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইতে লাগিল, শেষে অরণ্যভূমি যেন দুই কণ্টকবাহু বিস্তার করিয়া একেবারেই পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল। রামদাদা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চারিদিকে লক্ষ্য করিয়া চলিতে চলিতে এক জায়গায় আসিয়া থামিয়া গেলেন। বলিলেন, মা এই পথে আসিয়াছিলেন। দেখিতেছিস?

কোথায় পথ! নিরেট বনভূমি।

রামদাদা হঠাৎ গুঁড়ি মারিয়া সেই নিবিড় কণ্টক-বন ভেদ করিয়া চলিতে শুরু করিলেন, আমি বহুকষ্টে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলাম। জুতার আবরণ সত্ত্বেও পা ক্ষতবিক্ষত হইয়া গেল। এক স্থানে পিছন ফিরিয়া রামদাদা বলিলেন, দেখিতেছিস, এই কাঁটা-বনে মায়ের পায়ের রক্তচিহ্ন? মা আমার এই পথে কত কষ্টে যে হতভাগা সন্তানের খোঁজে বাহির হইয়াছিলেন, বুঝিতে পারিতেছিস? দুই-এক স্থলে কণ্টকাগ্র সত্যই লাল। রক্ত হইতেও পারে।

কিয়দ্দূর চলিয়া এক স্থানে আসিয়া সম্মুখে একটি ভগ্ন ইষ্টকস্তূপ চোখে পড়িল। সেই ইষ্টকস্তূপের সন্নিকটে পৌঁছিয়া রামদাদা থামিলেন।

সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, কেবলরাম, এই মায়ের মন্দির, পায়ের জুতা খুলিয়া ফেল।

জুতা খুলিয়া অতি সন্তর্পণে সেই ইষ্টকস্তূপের উপরে উঠিলাম। উঠিয়াই যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিদ্যুৎ স্পন্দিত হইল। ভয়-ভক্তি-মিশ্রিত এক অদ্ভুত ভাব আমার মনে সঞ্চারিত হইল। আমি সেইখানে দাঁড়াইয়া ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। দেখিলাম, কে যেন সদ্য সদ্য সেই স্থানে কণ্টকলতা অপসারিত করিয়াছে। পরিষ্কৃত স্থানে ধূলার উপরে এক সুবৃহৎ কালো পাথরের কালীমূর্ত্তি—স্থানে স্থানে ভগ্ন, কর্ত্তিতনাসা এবং তাহারই চতুর্দিকে যুগান্তসঞ্চিত শুষ্ক ধূলির উপরে চাপ চাপ রক্ত জমাট বাঁধিয়া রক্তজবার মত পড়িয়া আছে। এক পাশে রক্তমাখা একটি খড়্গ। রামদাদা ততক্ষণে বামহস্তের ব্যাণ্ডেজ খুলিয়া ফেলিয়া হাতটি আমার সম্মুখে প্রসারিত করিলেন। আতঙ্কিত বিস্ময়ে দেখিলাম, বামহস্তের পাঁচটি অঙ্গুলি কর্ত্তিত, এবং সঙ্গে সঙ্গে নজরে পড়িল, একটি অঙ্গুলি তখনও দেবীর পাদমূলে পড়িয়া আছে, বাকি চারিটি সম্ভবত শৃগাল-কুকুরে লইয়া গিয়া থাকিবে। আমার ভয়চকিত মূঢ় ভাব দেখিয়া রামদাদার মুখে অদ্ভুত হাসি ফুটিয়া উঠিল। অকস্মাৎ আমাদের দুইজনের মধ্যে যেন যুগান্তের ব্যবধান ঘটিল। সেই যুগান্তের ওপার হইতে রামদাদা বলিতে লাগিলেন, রক্তজবা যখন পাইলাম না, তখন আপনার দেহরক্ত নিবেদন করিয়া মায়ের পূজা করিলাম, কিন্তু হায়, পাষাণী মা আমার এখনও জাগিলেন না। রক্তজবা চাই কেবলরাম, তুমি রক্তজবা আন, আমি মায়ের পাষাণ-দেহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিব।—বলিতে বলিতে উন্মাদ রামদাদা অকস্মাৎ ধূলি হইতে রক্তমাখা খড়্গটি তুলিয়া লইয়া আপনার কণ্ঠে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন, আমি সবলে তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। রামদাদার হাত হইতে খড়্গখানি কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলাম। উন্মাদ রামদাদার আয়ত চক্ষু দিয়া দরদরধারে জল ঝরিয়া পাষাণদেবীর পাদমূল সিক্ত করিয়া দিল।

ললিতা-পাঠাগার

গোলগাল আতাটির মত দেখিতে হইলে কি হইবে, লোকটার ভিতরে কাব্য ছিল। গোপালদা বলিতেন, চম্পূকাব্য। এই কথাটি বলিয়াই গোপালদা তাঁহার সেই বহুব্যবহৃত গল্পটির পুনরাবৃত্তি করিতেন। শুনিয়াছি বলিবার জো ছিল না। একটু অন্যমনস্ক হইলেই তিনি একেবারে হাঁড়িপানা মুখ করিয়া সাত দিনের বাসি খবরের কাগজ লইয়া বসিতেন, কোন দিকে দৃকপাত করিতেন না; দেখিতে সে অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং অস্বস্তিকর হইত। গোপালদা বলিতেন, চম্পূকাব্য কি রকম বুঝলে? তবে শোন, অধর বক্সীর মোটরে চেপে আমি আর নেত্য একদিন গড়ের মাঠে গেছি হাওয়া খেতে, রাত বারোটার পরে। অসহ্য গরম। গঙ্গার ধারে এক চক্কর দিয়ে এসে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনের পথটায় মোটর থামিয়ে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করছি, দেখি, তিন ব্যাটা নেপালী সাইকেলে চেপে কার্জনের স্ট্যাচুর চারদিকে পাক খাচ্ছে আর হো-হো হি হি ক'রে হাসছে। ব্যাটাদের ওই হ'ল রসিকতা। দেখতে দেখতে বিরক্তি ধ'রে গেল, অধরকে বললাম, চল ভায়া, এদের মতলব ভাল না। অধর ঠোঁটের এক পাশ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললে, ধীরে, গোপালদা, ধীরে। দেখবার বস্তুর অভাব কি?

বাহাদুরি আছে ছোকরার! বলতে না বলতে একটা মোটরকার হুশ ক'রে পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। হ্যাঁ, সুখে আছে সাদা চামড়ার এই লোকগুলো! ফুর্তি তো করছে ওরাই! আর করবেই বা না কেন? কলুর ব্যাটা গাইবে না তো কি বলদে গান গাইবে?

ওদেরই একজন চলেছে কোলে কাঁখে তিনটে স্বজাতীয়া অপ্সরীকে নিয়ে হা-রা-রা-রা করতে করতে। ড্রাইভার বেচারার প্রাণ-সংশয়। আর বলব কি ভাই, আমারই ঘুণধরা মনটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত উড়ন্তি মোটরটার পেছনের লাল আলোর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে চোখ ঝাপসা হয়ে গেল। গিন্নীকে মনে পড়ল। অধরকে ফিরতে বলব ভাবছি, দেখি, আর দুটো মোটর পাশাপাশি প্রায় পাল্লা দিয়ে ছুটেছে। সামনেরটাতে কোনও সাহেবের খানসামা আর আয়া হবে। মনিবের অনুপস্থিতিতে ড্রাইভারের সঙ্গে চাঁদা ক'রে একটু ফুর্তি লুটছে; আর পেছনেরটাতে এক টেকো সাহেব একটি মোমের মত মেমের অঙ্গে হেলান দিয়ে চলেছে। ব্যাটার মাথায় একগাছি চুল নেই। অধর ব'লে উঠল, দেখেছ গোপালদা, ডিমের মতন মাথাটি হ'লে কি হবে, ওর প্রাণের ভেতর টেরিকাটা। আমাদের দক্ষিণারও তাই, বাইরেটা টাক-টাক মত ঠেকলেও ওর প্রাণের ভেতর টেরি ছিল।

এই প্রাণের ভিতর টেরির গল্প শুনিতে শুনিতে আমাদের মুখস্থ হইয়া গিয়াছিল। তবু দক্ষিণাচরণ সম্বন্ধে এমন লাগসই বর্ণনা আর হয় না। বাইরেটা টাক নয় তো কি? নাম—শ্রীদক্ষিণাচরণ হাজরা; ধাম—কলিকাতা চাঁপাতলা; পেশা—দালালি, পাট আর ঝোলাগুড়ের; বয়স সাড়ে উনচল্লিশ; বিপত্নীক।

বেশ ছিল বেচারা। সকালে উঠিয়াই রাত্রির বাসি লুচি আর গুড়ের সঙ্গে কলাই-করা বাটিতে এক কাপ চা খাইয়া বাহির হইয়া নারিকেলডাঙ্গা ব্রিজ হইতে আরম্ভ করিয়া বাগবাজার পর্যন্ত সমস্ত খালধারটা একবার টহল দিয়া ফিরিত। কোন নৌকায় গুড়, কোন নৌকায় পাট—দক্ষিণা নমুনা আর দর যাচাই করিত। সে ছিল দক্ষিণার উত্তুরে হাওয়ার দিক।

তারপর হঠাৎ একদিন জানিতে পারি, দক্ষিণার প্রাণে দখিনা হাওয়াও বহিয়া থাকে। আমরা কয়জন তখন সবে কলেজ ছাড়িয়া পাড়ার উন্নতিকল্পে একটি লাইব্রেরি ও রীতিমত সাহিত্য-চর্চার জন্য একটি ক্লাব-ঘর প্রতিষ্ঠা করিতে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছি। চাঁদা নেহাত মন্দ উঠিতেছিল না। বাড়ির মেয়েরা নিয়মিত উপন্যাস পড়িতে পাইবার লোভে বাজারের পয়সা চুরি করিয়া চাঁদা পাঠাইতে লাগিলেন। আমরা রীতিমত মাতিয়া উঠিলাম।

পাটের দালালের কাছে যাইতে আমাদের বাসনা ছিল না। দালাল জাতটার উপর সদ্য-কলেজ-ফেরত আমাদের কিঞ্চিৎ ঘৃণা ছিল। তবু নেহাত ভদ্রতার খাতিরে গেলাম। ভাবিয়াছিলাম, দেখিব, দালাল দক্ষিণাচরণ আটহাতি ধুতি পরিয়া খোলা বুকে থেলো হুঁকায় তামাক খাইতেছে, লাইব্রেরির কথা পাড়িতেই বলিবে, কি হবে ছাই ওসব ক'রে? দেখছেন তো আমাকে? নিশ্বেস ফেলবার সাবকাশ নেই— তার চাইতে বরং গণেশ অধিকারীর—

অবাক হইয়া গেলাম। একেবারে অপ্রত্যাশিত ব্যাপার! দক্ষিণাচরণ দক্ষিণের জানালার সামনের টেবিলে টেবিল-ল্যাম্প জ্বালাইয়া রবীন্দ্রনাথের টালি-এডিশন কাব্য গ্রন্থাবলী পাঠ করিতেছে। ঘরটায় আলমারি পাঁচেক বই—ইংরেজী বাংলা; টেবিলের উপর পাটের চিহ্নমাত্র নাই, ঘরের কোণে ঝোলাগুড়ের হাঁড়িও দেখিতে পাইলাম না।

প্রস্তাব শুনিয়া দক্ষিণাচরণ মহাখুশি। বলিল, এই তো চাই! মানুষের প্রাণটাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টাই তো এখন করতে হবে। তা, আমি আর কি করতে পারি? এই ঘরখানা আর এই বইগুলো ছেড়ে দিচ্ছি, এখেনেই লাইব্রেরি আর ক্লাব-ঘর—

আমরা স্তম্ভিত হইলাম, মনে মনে লজ্জাও কম হইল না। বলিলাম, এতটা—

এত আর কি ভায়া? গিন্নী যাওয়া ইস্তক বইগুলো আর নাড়তে-চাড়তেও পারি না। তিনিই এসব দেখা-শোনা করতেন কিনা। পড়া-শোনার ভারি শখ ছিল তাঁর। তাঁর নামেই— আর একটা ছেলেপিলেও তো নেই যে, তার জন্যে—

শেষ তাহাই স্থির হইল। দক্ষিণাদার স্বর্গগত পত্নীর নামানুযায়ী লাইব্রেরির নাম হইল—'ইন্দুমতী-পাঠাগার'। ক্লাবের নাম—'দক্ষিণাচরণ-ক্লাব'।

ক্রমশ পাটের দালালের সহিত ঘনিষ্ঠতা হইলে বুঝিলাম, পাট আর ঝোলাগুড় তাহার জীবনের অতি অল্প স্থানই অধিকার করিয়া আছে। দক্ষিণাচরণ কবিতা লিখিত। তাহার সব চাইতে বড় দুর্বলতা ছিল, আধুনিক ফ্যাশান-দুরস্ত স্কুল-কলেজের মেয়ে। সাড়ে নটা দশটার সময় স্কুলের গাড়ি দেখিতে সে প্রত্যহ খালধার হইতে সার্কুলার রোড পর্যন্ত একবার হাজিরা দিত।

এই দুর্বলতাটুকুর জন্য আমরা তাহাকে নানাভাবে উত্যক্ত করিতাম। একদিন ফোরেলের 'সেক্সুয়াল কোশ্চেন'খানা তাহার সামনে ধরিয়া বলিলাম, দেখেছ দাদা, কি লিখেছে?—'সাধারণত আঠারো-বিশ বছরের মেয়েরা প্রৌঢ় লোকদের প্রতিই বেশি আকর্ষণ অনুভব করে; সমবয়সী যুবকদের প্রতি নয়।' ললিতাও তা হ'লে—

দক্ষিণাদা এক গাল হাসিয়া বলিল, যাঃ, ও এদেশের মেয়েদের কথা নয়।

ললিতা আমাদের পাড়ার লেডী ডাক্তার মিসেস সরকারের মেয়ে, বেথুনে ফার্স্ট আর্ট্‌স পড়ে। লেডী ডাক্তার আমাদের লাইব্রেরির মেম্বর

হইয়াছিলেন। দক্ষিণাচরণ প্রত্যহ সন্ধ্যায় একবার খোঁজ লইত, সেদিন মিসেস সরকারের বাড়িতে কোনও বই গিয়াছে কি না। এইরূপ প্রশ্ন করিবার কারণ এই যে, যদি তাহার দেওয়া কোন বই সে বাড়িতে গিয়া থাকে, তাহা হইলে ললিতা অন্তত তাহার নামটাও একবার দেখিতে পাইবে। দক্ষিণাদার ওইটুকুতেই সুখ।

দক্ষিণাদাকে সব চাইতে নাকাল করিতেন গোপালদা। একদিন তাহার সহিত দেখা হইতেই গোপালদা বলিলেন, কি হে ভায়া, বিশ্বভারতীর মেম্বর হ'লে? ললিতার যে এখন বিশ্বভারতী-বাই হয়েছে।

দক্ষিণাচরণ প্রথমটা চটিয়া উঠিলেও পরে মৃদুস্বরে প্রশ্ন করিল, তাই নাকি? পরদিনই বিশ্বভারতীর একজন মেম্বর বাড়িল।

যৌবনে সে একবার কখন কবিতাদেবীর আরাধনা করিয়াছিল। পুরাতন খাতাগুলিই আবার টানিয়া বাহির করিল, নিজের লেখা পড়িতে নেহাত মন্দ লাগিল না। তিন অক্ষরে যতগুলি প্রেয়সীর নাম ছিল, সব কাটিয়া মিল বজায় রাখিয়া 'ললিতা' করা হইল। পুরাতন ছেঁড়া খাতার বদলে নূতন বাঁধানো খাতায় ঝোলাগুড়ের দালাল দক্ষিণাচরণ প্রেমের কবিতা লিখিতে লাগিল।

বোম্বাইয়ে মাল পাঠাইয়া রেল-রসিদের উল্টা পিঠেই একদিন সে লিখিয়া ফেলিল—প্রথম লাইনটা রবীন্দ্রনাথ হইতে চুরি —তা হোক—

চোখে চোখে দেখা হ'ল পথ চলিতে,
ওগো ললিতে!
সন্ধ্যা না দুপহর পড়ে না মনে,
লোকের ভিড়ে? না না, নিরজনে—
গড়ের মাঠে? বুঝি রেল-স্টেশনে;

স্ট্রীট, রোড, অ্যাভিনিউ, কোন্ গলিতে ?
ওগো ললিতে !
সেই হতে আছ মোরে পায়ে দলিতে,
ওগো ললিতে !
'বাস' আসে 'বাস' যায় চমক হেনে,
তুমি কি জানিবে পাশে পান কে কেনে ?
সবাই পথিক সখি, কে কারে চেনে ?
তুমি শুধু পথ চল মোরে ছলিতে—
ওগো ললিতে !

বাবুকে রসিদ হাতে গুনগুন করিয়া গান গাহিতে দেখিয়া রেলের কুলী অবাক।

সন্ধ্যায় ক্লাবে দক্ষিণাদা আমাকে গোপনে ডাকিয়া বলিল, দেখ হে, একটা কবিতা লিখেছি। তুমি তো আবার বড় সাহিত্যিক।

বলিলাম, চমৎকার হয়েছে দক্ষিণাদা! আমার হিংসে হচ্ছে।

ছাই! আমড়াগাছি করতে হবে না, ভাই। সত্যি, মেয়েটা বুড়ো বয়সে—

বালাই। বুড়ো! ছ্যাঃ! কবিতাটা আমাকে দাও, ললিতার হাতে পৌছে দেবার ভার আমার।—বলিয়াই রসিদখানায় টান মারিলাম।

আরে আরে, কর কি? কেলেঙ্কারি হবে, মুখ দেখাবার পথ থাকবে না।

কিন্তু কে কথা শোনে? তখন আরও পাঁচজনে আসিয়া জুটিয়াছে। গোটা পাঁচেক নকল সঙ্গে সঙ্গে করিয়া লওয়া হইল। রসিদখানা ভি. পি.

করিয়া বোম্বাই পাঠাইতে হইবে বলিয়া ললিতার জন্য আসল পাণ্ডুলিপি রাখা হইল না।

ললিতার কাছে পৌঁছাইয়া দিব তো বলিলাম, কিন্তু কি উপায়ে? মেয়ের সম্বন্ধে মিসেস সরকার একেবারে বাঘ। তিনি নিজে চিরকাল ভদ্র জীবন যাপন করিয়াছেন, আমাদের জ্ঞান হওয়া অবধি আমরা তাঁহাকে পাড়ার একজন বিশিষ্ট ভদ্রমহিলা বলিয়াই জানি। কাহারও সহিত তাঁহার হৃদ্যতার অভাব নাই। বিপদে-আপদে তিনি সকলকেই সাহায্য করিয়া থাকেন।

শেষে এক উপায় ঠাওরাইলাম। যতীন ভাল গাহিতে পারিত। সে নিজেই সুর দিয়া গানটা প্র্যাক্টিস করিল, এবং হঠাৎ একদিন ক্লাবে রৈ-রৈ পড়িয়া গেল। দক্ষিণাদার গান! আগেই দেখিয়া লইয়াছিলাম, মিসেস সরকার বাড়ি আছেন কি না। তিনি 'কলে' বাহিরে গিয়াছেন।

ক্লাব-ঘর হইতে ললিতাদের বাড়ি বেশি দূরে নয়। ক্লাবে হঠাৎ গান শুনিয়া সে জানালার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। দক্ষিণাদাও ঠিক এই সময়ে ক্লাবে হাজির হইল। ইঙ্গিতে তাহাকে ললিতার ঘরটা দেখাইলাম। দাদা একেবারে জিভ কাটিয়া ছুটিয়া গিয়া যতীনের মুখ চাপিয়া ধরিল। তখন দুই লাইন গাওয়া হইয়াছে।

ললিতার মূর্তি জানালা হইতে সরিয়া গেল।

দক্ষিণাদার এই দুর্বলতাটুকুর সুবিধা লইয়া আমরা দাদাকে দিয়া নিত্য নূতন বই কিনাইতে লাগিলাম। বইয়ের দরকার হইলেই বলিতাম, দাদা, মিসেস সরকার বলছিলেন, ক্লাবের বই তো সব প্রায় পড়া হয়ে গেল। নতুন ভাল বই আপনারা তো কিছুই আনান না। তাই ভাবছি, চন্দন লাইব্রেরির মেম্বর হব।

দাদা বলিত, সে কি কথা! নতুন কি কি বই বেরিয়েছে তার একটা লিষ্টি কর। এ যে ইন্দুমতীর অপমান!

দক্ষিণাদার আর কিছু না থাক্, পয়সা ছিল। এখন ললিতার মহিমায় দিল বাড়িয়াছে। ক্লাবের পুস্তক-সংখ্যা বাড়িতে লাগিল।

দক্ষিণাদাকে একদিন বলিলাম, দেখ দক্ষিণাদা, এক কাজ কর। নতুন বইগুলোর উপহার-পৃষ্ঠায় একটা ক'রে কবিতা লিখে দাও। পষ্ট ক'রে লেখবার দরকার নেই, উদ্দেশে লেখ। তা হ'লেই কাজ হবে। ও বাড়িতে যত বই যায়, তার পাঠক তো ললিতা। মিসেস সরকারের সময় নেই—

কিন্তু ধরা পড়লে?

ধরবে কে? ললিতা যদি বুঝতেও পারে, তা হ'লে সে কি—

আচ্ছা, দিও বইগুলো ওপরে পাঠিয়ে।

সচিত্র ওমর খায়েমের উপহার-পৃষ্ঠায় দক্ষিণাদা সযত্নে লিখিলেন—

ললিত মধুর রুবাই যাহার কোথা সে আজি,
লিপি কে পাঠাল ভবিষ্যতের কবিরে স্মরি?
তাহার স্মরণে চিত্ত আমার উঠিল বাজি,
লহ এ অর্ঘ্য, দূর হতে তোমা বরণ করি।
লিখন তোমার অক্ষয় হ'ল কালের বুকে,
তাহারই পরশ লাগিল আমার লেখনীমুখে।

—দক্ষিণাচরণ

বুলবুলের উপহার-পৃষ্ঠায় লিখিত হইল—

তোমারে দেখবে ব'লে আকাশ-কোলে মেঘের ভিড় এ,
ছুঁতে ও আঁচলখানি কানাকানি ধীর সমীরে।

বনের ও মাথায় মাথায় হাত-ইশারায় তোমায় ডাকে,
তটিনী কলতানে তোমায় টানে চরের বাঁকে।
আজি এ তিমির-রাত্তি পেলে সাথী নদীনীরে
ডুবিয়া মরব সুখে, আমার বুকে মেঘের ভিড় এ।

—অভাগা দক্ষিণা

এই ভাবে নূতন বইয়েয় প্রায় সবগুলিতেই কয়েকছত্র করিয়া লেখা যোগ করা হইল।

আসলে মিসেস সরকার কালেভদ্রে এক-আধখানা বই লইতেন। মেয়ের মনে হালকা উপন্যাসের ছোঁয়াচ লাগিতে দিতে তিনি রাজি ছিলেন না। নেহাত আমাদের উপরোধে পড়িয়াই তিনি মেম্বরশিপ বজায় রাখিয়াছিলেন।

মিসেস সরকারের এক ভাগনে—বসন্ত, তাঁহার বাড়িতে থাকিয়াই 'ল' পড়িত। সে আমাদের ক্লাবের একজন সভ্য হইল। অল্পদিনেই দক্ষিণাদার দুর্বলতার খবর সে পাইল। সেও আমাদের সহিত যোগ দিয়া দক্ষিণাদাকে নাচাইতে লাগিল। আমাদের মহা সুবিধা হইল।

বসন্ত হঠাৎ একদিন দক্ষিণাদাকে ধরিয়া বসিল, দক্ষিণাদা, আপনার উপহার-পৃষ্ঠার কবিতাগুলো ললিতা সব পড়েছে, বলে, চমৎকার লেখেন। আপনার সঙ্গে একদিন আলাপ করতে চায়।

দক্ষিণাদাদা ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলে, না না, ভাই, সে আমি পারব না। ওগুলো কি আবার কবিতা! হ্যাঁ, কবিতা লিখেছিলাম, যখন যৌবন ছিল—

আমরা তারস্বরে বলিয়া উঠিলাম, ছিল কি দক্ষিণাদা? তোমার সম্বন্ধেই তো রবিবাবু লিখেছেন—

আমাদের পাকবে না চুল গো,

আমাদের পাকবে না চুল !

যতীন অমনই গান ধরিয়া দেয়।

দক্ষিণাদাদা বিরক্তি প্রকাশ করিয়া বলে, তোরা থাম্, বাপু। হ্যাঁ ভাই বসন্ত, ললিতা আর কি বললেন ?

বসন্ত একটু লজ্জার ভান করিয়া বলিল, সেসব কথা কি আমার বলা শোভা পায় দক্ষিণাদা ? সে হ'ল আমার বোন। হ্যাঁ, আপনার যৌবনের কবিতার কথা কি বলছিলেন ?

দু-একটা কবিতা তখন সত্যিই লিখেছিলুম ভায়া।

সকলেই আবদার ধরিলাম, পড়ুন না, দক্ষিণাদা !

দক্ষিণাদা যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় আলমারি খুলিয়া একটা খাতা বাহির করিল এবং মাদুরের কাঠি-মার্কা-দেওয়া একটা পাতা খুলিয়া বলিল, কত স্মৃতিই না এই কবিতার সঙ্গে জড়িত আছে ভাই। ইন্দুমতী এই কবিতাটি বড্ড পছন্দ করতেন।

তবে তো শুনতেই হবে, পড়ুন দক্ষিণাদা।

দক্ষিণাদা চশমাটা পরিষ্কার করিয়া লইয়া খুব ধীরে ধীরে পড়িতে লাগিল—

বাসন্তী পূর্ণিমা-নিশি, জ্যোছনা-জোয়ারে
ভাসিতেছে ত্রিভুবন, বনের আঁধারে
কাঁদিল সহসা হিয়া কোকিল-বধূর।
সে ক্রন্দন ভেসে গেল দূর হতে দূর
অনন্ত আকাশপানে, শুনিল শ্রবণে
বিরহ-বিধুরা বালা কুটীর-প্রাঙ্গণে ;

সহসা খসিল তার ঘোমটা মাথার,
থমকি চমকি শূন্যে চাহে বারম্বার,
কে ডাকিল তারে ?—ভাবে বালা ভ্রান্ত মন ?
কাঁকন বাজিল বৃথা, খসিল গুণ্ঠন।
মিছা আজ জ্যোৎস্নাধারা—

বসন্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিল, দক্ষিণাদা, দিন দিন, কবিতাটা ললিতাকে শুনিয়ে আসি।

দক্ষিণাদা বলিল, সবটা শোন, তারপর—

সে হবে না। একেবারে টাটকা—

বাধ্য হইয়া দক্ষিণাদাদা খাতাখানি দিল। সেদিন ক্লাবের সভ্যদের বাড়ি ফিরিয়া আর খাইতে হইল না।

পরদিন বসন্ত আসিয়া বলিল, দক্ষিণাদা, কাজটা ভাল করেন নি। মাসীমা ভারি চটেছেন।

দক্ষিণাদা এতটুকু হইয়া বলিল, ব্যাপার কি ভায়া ?

আর ব্যাপার কি! ওমর খায়েমের উপহার-পৃষ্ঠায় কি কবিতা লিখেছেন, মাসীমা বুঝতে পেরেছেন।

দক্ষিণাদা প্রমাদ গনিল। কই, তেমন কিছু তো—

প্রথম অক্ষরগুলো প'ড়ে গেলে নাকি 'ললিতা ললিতা' এই দুটো কথা হয় ?

আমরা সকলেই কবিতাটা দেখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু তাহার ভিতর যে দাদা নিজের কেরামতি এতটা ফলাইয়াছে, তাহা জানিতাম না। বসন্তকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা সত্য কি না। বসন্ত বলিল, খানিকটা সত্য। মাসীমা দেখেন নাই বটে, কিন্তু ললিতা দেখিয়াছে।

সর্বনাশ!

বসন্ত বলিল, এতে মাসীমা, ললিতা এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাকেও অপমান করা হইয়াছে। মাসীমা লাইব্রেরির মেম্বর তো থাকিবেনই না, অন্য কি ব্যবস্থা করা যায় তাহাও ভাবিতেছেন।

দক্ষিণাদা কপালে করাঘাত করিয়া বলিল, এই যত সব ছোকরাদের পাল্লায় প'ড়ে বুড়ো বয়সে—

যতীন বলিল, বুড়ো বয়েস কি দক্ষিণাদা!

দক্ষিণাদা হতাশার স্বরে বলিল, থাম বাপু! আর ইয়াকি ভাল লাগে না। ছি ছি ছি! কি কেলেঙ্কারিটাই হ'ল! আমি কালই এ-বাড়িটা ভাড়া দিয়ে অন্য পাড়ায় যাব।

আমি বলিলাম, কিন্তু আমাদের ক্লাব, লাইব্রেরি?

চুলোয় যাক। আপনি বাঁচলে—

কিন্তু দক্ষিণাদা, বউদির স্মৃতি—

দক্ষিণাদার ধৈর্যচ্যুতি হইল।—দুত্তোর স্মৃতি! বলিয়া সে উঠিয়া পড়িল।

আসলে ব্যাপারটা এত দূর গড়ায় নাই। কবিতা দেখিয়া ললিতা নিরীহ পাগল দক্ষিণাচরণের দুরবস্থার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইল। তাহা ছাড়া, এই পাড়ায় জন্মাবধি বাস করিয়া দক্ষিণাচরণ সম্বন্ধে অনেক খবরই সে জানিত। ঝিয়েরা বলিত, মাটির মানুষ, গিন্নী যাওয়া-ইস্তক উঁচু নজরে কারও দিকে চায় না পর্যন্ত। সেই দক্ষিণাচরণকে যে পাড়ার বখাটে ছোকরারা মিলিয়া এভাবে নাচাইতেছে, ইহা ভাবিয়া ললিতার অনুকম্পা হইল। বেচারা!

বসন্ত একদিন আমাদের পরামর্শে ললিতাকে বলিল, একটা মজা করবি, নলি?

মজাটা যে দক্ষিণাচরণকে লইয়া ললিতা চট করিয়া বুঝিতে পারিয়া বলিল, কি মজা ?

একদিন দক্ষিণাদার সঙ্গে দেখা করবি? কিন্তু মাসীমাকে না জানিয়ে।

বসন্ত মাসীমাকে যমের মত ভয় করিত।

অনেক বোঝাপড়ার পর ললিতা রাজি হইল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে দক্ষিণাচরণের জন্য তাহার কষ্ট হইতেছিল। সে বসন্তকে বলিয়া রাখিল যে, দক্ষিণাবাবুকে বেশি নাকাল করিবার চেষ্টা হইলে সে সমস্তটা ফাঁস করিয়া দিবে।

এদিকে দক্ষিণাদাকে তাহার কৃত কার্যের জন্য ললিতার কাছে ক্ষমা চাহিতে প্রস্তুত হইতে বলা হইল। দক্ষিণাদা নিতান্ত মনোদুঃখে প্রায়শ্চিত্তের আয়োজন করিতে লাগিল।

মিসেস সরকার একদিন দূরের ডাকে বাহিরে গেলে বসন্ত বেশ চুপি-চুপি আসিয়া দক্ষিণাদাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। যে ঘরে দক্ষিণাদার সহিত ললিতার সাক্ষাৎ হইবে, তাহারই পাশের ঘরে আমরা ক্লাবের দশ-পনরো জন পূর্ব হইতেই জমায়েৎ হইয়াছিলাম। ললিতা তাহা জানিত না।

দক্ষিণাদা একটা চেয়ারে বসিয়া অধোবদনে রহিল। মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিবার মত সাহস তাহার ছিল না। ললিতা তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইল, তবু দক্ষিণাদা চুপ। বসন্ত হাঁকিল, দক্ষিণাদা, ললিতা—

দক্ষিণাদা শশব্যস্তে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইল। ললিতা শান্তকণ্ঠে বলিল, ব্যস্ত হবেন না, আপনি বসুন।

দক্ষিণাদা মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বসিয়া পড়িয়া ভাঙা গলায় বলিল, দেখুন, পাগলামির খেয়ালে একটা বড় অন্যায় ক'রে ফেলেছি। আমার জ্ঞান ছিল না।

ললিতা বলিল, না না, কিছু অন্যায় করেন নি আপনি।

বসন্ত হাসি চাপিতে না পারিয়া বাহির হইয়া গেল। দুই ঘরের মাঝখানের দরজাটা একটু ফাঁক হইল।

দক্ষিণাদা হাত দুইটি জোড় করিয়া আর একবার বলিল, আমি পাগল হয়েছিলাম—

দরজাটা দড়াম করিয়া খুলিয়া গেল। দক্ষিণাদা ও ললিতা দুইজনেই চমকিয়া উঠিল। ললিতা শুধু গম্ভীরভাবে আমাদের দিকে চাহিল। তাহার চোখ দিয়া যেন আগুন বাহির হইতেছিল। সে হঠাৎ দৃঢ়পদে দক্ষিণাদার কাছে গিয়া তাহার হাত দুটি ধরিয়া বলিল, পাগল আপনি হন নি, ভুল করেছেন বটে, কিন্তু সে ভুল আমি শোধরাব। আপনি বাড়ি যান।

দক্ষিণাদা কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গেল। আমরাও কম অবাক হই নাই। বসন্ত হতাশ হইয়া বলিয়া উঠিল, সর্বনাশ হয়ে গেল, নলিকে আমি চিনি। দক্ষিণাদাই শেষে জিতল।

মায়ের আপত্তি টিঁকিল না, তাঁহার চোখের জল নিষ্ফল হইল। ললিতা নাছোড়বান্দা। দক্ষিণাদা যেন হাতে স্বর্গ পাইল। ললিতার ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুভদিনে শুভক্ষণে দক্ষিণাদার সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল। সেদিন ভরপেট খাইলাম।

রসিকতা করিতে গিয়া কিন্তু আমরা প্যাঁচে পড়িলাম। ললিতা বিবাহের দিনকয়েক পরেই দক্ষিণাদার শূন্য সংসারে জমজমাট হইয়া বসিল। ভোজপুরী ভঙ্গীতে আমাদিগকে প্রথমেই 'নিকালো' বলিল না বটে, কিন্তু ভাবটা যাহা প্রকাশ পাইতে লাগিল তাহাতে অবিলম্বে ক্লাব অচল হইবে মনে হইল।

দক্ষিণাদা নিয়মিত পাট আর ঝোলাগুড়ের দর যাচাই করিয়া ফিরিতে লাগিল, কিন্তু পূর্বেকার মত সন্ধ্যায় ক্লাবে আসিবার সময় করিয়া উঠিতে পারিল না। কবিতা লেখা বন্ধ করিয়াছিল কি না জানি না, কিন্তু নূতন বই কেনা হইবে না বলিয়া উপহার-পৃষ্ঠার কবিতা আর দেখা গেল না। দক্ষিণাদা আমাদিগকে ছিন্ন কাঁথার মত পরিত্যাগ করিল।

লাইব্রেরির অবস্থা কাহিল, ক্লাব চুলোয় যাক। দাদাকে একদিন বলিলাম, তোমার প্রথমা পত্নীর স্মৃতি এভাবে—

অন্তরাল হইতে ললিতা শুনিয়া থাকিবে। পরদিনই সে হুকুম দিল, ক্লাব ও লাইব্রেরি অবিলম্বে স্থানান্তরিত করিতে হইবে। বসন্তের ওকালতিতে কাজ হইল না; কেন বলিতে পারি না, ইন্দুমতীর উপর ললিতার ভয়ানক রাগ ছিল, সম্ভবত আমাদের জন্যই।

ইন্দুমতী-পাঠাগারের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইতে লাগিল, কিন্তু পরম্পরায় খবর পাইলাম, দক্ষিণাদার বই কেনা বন্ধ হয় নাই। ললিতা পড়িতে ভালবাসিত। মায়ের বাঁধাবাঁধিতে যে ইচ্ছা পূর্ণতা লাভ করে নাই, প্রৌঢ় স্বামীর দৌলতে তাহা ভাল করিয়া পূর্ণ হইতে লাগিল ইন্দুমতী-পাঠাগার উঠিয়া যায়-যায় হইল, দক্ষিণাদার বাড়িতে ইন্দুমতী-পাঠাগারের একখানিও বই যাইবার উপায় রহিল না।

শেষে আমরা একদিন বিশেষ বৈঠক ডাকিয়া স্থির করিলাম লাইব্রেরি বজায় রাখিতে হইলে ললিতাকে বশে আনিতেই হইবে নূতন বই না হইলে মেম্বর থাকে না, চাঁদার টাকা এত সামান্য যে তাহা দিয়া বই কিনিয়া পাঠিকাদের পড়ার ক্ষুধা মেটানো বা পেট ভরানো যায় না। সুতরাং দক্ষিণাদার দালালির টাকা ছাড়া গত্যন্তর নাই কিন্তু সিন্দুকের চাবি এখন ললিতার হাতে। অনেক বাগবিতণ্ডার প

স্থির হইল যে, ললিতার এই বিরাগের মূলে সপত্নী-বিদ্বেষ। সে সপত্নীকে দেখে নাই বটে, কিন্তু আমরাই যেন সেই মৃতার স্মৃতি বজায় রাখিয়া চলিয়াছিলাম। আমরা ইন্দুমতীর নাম খারিজ করিয়া সে স্থলে ললিতার নাম প্রচার করিতে শুরু করিলাম। লাইব্রেরির চিঠির কাগজ, বই-ইস্যুর টিকিট, খাতা-পত্র সর্বত্রই ইন্দুমতীর নাম কাটিয়া ললিতার নাম লেখা হইল, এবং একদা দক্ষিণাদাকে সস্ত্রীক ললিতা-পাঠাগার-পরিদর্শনের জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলাম।

ঔষধ ঠিক ধরিল। শাশুড়ী-স্ত্রীসমভিব্যাহারে দক্ষিণাদা হাজির হইল। তাহার শরীরের সেই চোয়াড়ে ভাব আর নাই, অনেকখানি চিক্কণ হইয়াছে। আমরা সসম্ভ্রমে সকলকে অভিবাদন করিলাম। ললিতা স্বয়ং পুস্তকের তালিকা দেখিতে চাহিল, তালিকার উপর ইন্দুমতীর নাম এমন ভাবে কাটা হইয়াছিল যে পড়িবার উপায় ছিল না। ললিতা খুশি হইয়া বলিল, দেখছি, নতুন অনেক বই আপনাদের এখানে নেই, আমি পাঠিয়ে দেব কালই। সেগুলো ছাড়া আর যদি কোনও ভাল বই বেরিয়ে থাকে, তারও একটা লিষ্টি—

আমরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলাম। আমি সেক্রেটারি হিসাবে ললিতা-পাঠাগার ও দক্ষিণাচরণ-ক্লাবের বার্ষিক-বিবরণী পাঠ করিলাম। বলা বাহুল্য, তাহাতে ইন্দুমতীর নাম কুত্রাপি উল্লিখিত হয় নাই, কিন্তু অপ্রয়োজনীয় স্থলেও ললিতার নাম দেওয়া হইয়াছিল।

ললিতা খুশি হইয়া ক্লাবের ফরাশের ব্যবস্থা করিবার জন্য নগদ এক শত টাকা মঞ্জুর করিল। দক্ষিণাদার মনের ভিতরের টেরি জলজল করিয়া উঠিল।

সভা ভঙ্গ হইবার পর দক্ষিণাদা গোপনে আমার হাতে একটা কাগজ গুঁজিয়া দিয়া বলিল, ভায়া হে, আমার আর কিছু নেই, আমার

সর্বশেষ কবিতাটি তোমাদের দিলাম, ইন্দুমতীর নামে সভা ডেকে একদিন সবাই প'ড়ো। আমার আসবার উপায় নেই, তবু—

দক্ষিণাদার চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, আর কিছু সে বলিতে পারিল না।

একটা শুভদিন দেখিয়া ইন্দুমতীর চরম বিদায়-গীতি পাঠ করিলাম।

শ্মশানের চিতাবহ্নি তোমারে করে নি ভস্মসাৎ,
মহাকাল পারে নি ভুলাতে,
এ কি বিপর্যয়, প্রিয়া, জীবনে ঘটিল অকস্মাৎ,
তুমি হ'লে বিলীন ধূলাতে!
তোমা লাগি অশ্রু মোর অন্ধকারে উঠিছে উথলি,
কেহ তা পায় নি দেখিবারে,
ঝ'রে-পড়া ফুলটিরে আজ আমি রূঢ় পায়ে দলি,
তুমি শুধু ক্ষমিও আমারে!
'তুমি ছিলে'—এই সত্য চিরদিন থাকি যেন ভুলে,
'তুমি গেছ' তাও যেন ভুলি,
যে ঢেউ ভাঙিয়া গেছে তারে খুঁজি সাগরের কূলে
ফিরিব না দীর্ঘশ্বাস তুলি—

বসন্ত চীৎকার করিয়া উঠিল, থাম থাম, এ অসহ্য!

তাহার চোখে জল।

শেষ-কবিতা শেষ করা হইল না।

ললিতা-পাঠাগার ও দক্ষিণা-ক্লাব জোর চলিতেছে। মেম্বরদের বই পড়ার দুঃখ ঘুচিয়াছে। নূতন বই কিনিতে একদিনও দেখি হয় না।

কিন্তু বসন্তের দুঃখের অবধি নাই। ইন্দুমতীর প্রতি অপরাধ করিয়াছে বলিয়া সে আজিও মনে মনে প্রায়শ্চিত্ত করিতেছে।

জলের মত পরিষ্কার

পুলক আর পলা। স্কটিশ চার্চ কলেজ আর বেথুন।

চোখোচোখি হতে প্রেম, তারপর বিয়ে। জাত এক, গোত্র আলাদা; এমন যোগাযোগ কেমন ক'রে ঘটল যদি কেউ প্রশ্ন করেন, আমরা নাচার। শুধু পাল্টে জিজ্ঞাসা করব, মশায়, জগৎসিংহের সঙ্গে তিলোত্তমার দেখা হ'ল কেমন ক'রে? নির্মলকুমারীর সঙ্গে মাণিকলালের?

যাকগে, আমি গল্প লিখছি, ইতিহাস রচনা করতে বসি নি। তবু, রোস্ট মুর্গীটা মুর্গীর মত দেখতে হ'লেই খেতে ভাল লাগে, তাই একটু যা স্থান-কালের হিসেব দেওয়া।

বি. এ. পড়তে পড়তে কাব্য করে নি, প্রেম করে নি, এমন ছেলেকে তো আমরা দেখি নি। এক দিলীপ, সেও ভালবেসেছিল কথাকে, বকতে পেলে সে নস্যির নেশাও ভুলে থাকত। আমাদের পুলকও কবি ছিল, প্রতিনিয়ত সুন্দরের, মনোহরের ধ্যান করত। সে স্কটিশে বি. এ. পড়ত। বিকেলে যখন ক্লাস শেষ হ'ত, মোনা-মাস্টার অভিজ্ঞান আর টেম্পেস্টের তুলনা শেষ ক'রে চ'লে যেতেন, তখন পুলক, শকুন্তলা আর মিরান্দার কথা ভাবতে ভাবতে হেদোর পশ্চিম পাড়ে এসে দাঁড়াত। কুড়ি হাতের মাত্র ব্যবধান, অথচ গৌরীশঙ্কর অভিযানের চাইতেও বিপদসঙ্কুল! সে আনমনে রাস্তার ওপারে চেয়ে না থাকার ভান করত, তার চোখ থাকত ঠিক। এক, দুই, তিন, চার—

এমনই রোজ।

পলা পড়ে বেথুনের ফার্স্ট ইয়ারে; মাইকেলের প্রমীলা ও মেঘনাদের

স্মৃতি নিয়ে বাসের একটি নির্দিষ্ট কোণে বসে, কিন্তু কোন দিকে দৃষ্টি নেই।

এমনই রোজ।

শিলং পাহাড়ে মোটরের সঙ্গে মোটরের ধাক্কা লাগে, কলকাতার সমতল পথে লাগে চোখের সঙ্গে চোখের ধাক্কা। ধাক্কা লাগল, স্ফুলিঙ্গ উড়ল, আগুন ধ'রে গেল, আর নেবানো যায় না। ফায়ার ব্রিগেড—বিবাহ।

একদিন হঠাৎ পলা-পুলকের হ'ল চোখোচোখি। পলা ভাবলে, বা, বেশ তো! পুলক ভাবলে, চমৎকার! তারপরই লজ্জা, এ দেখলে চার্চটাকে, ও দেখলে দেবকী-নন্দন প্রেস। বাস চ'লে গেল।

এখানেই শুরু, কিন্তু সারা হ'ল— যাক, পরের কথা পরে হবে।

আগে দৃষ্টি ছিল অনির্দিষ্ট, মন ছিল লক্ষ্যহীন। পরদিন থেকে হেদোর গেটের ধারে বাস আসতেই মনে হ'ল, কতদিনকার পরিচয়। পলা অকারণেই সুসংযত বস্ত্রকে আরও সুসংযত করতে চায়, চুলগুলোকে ঠিক করতে গিয়ে বেঠিক করে; সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ, কিন্তু এ বিদ্যুতে শক লাগে না। পাশের সঙ্গীরা বুঝতেই পারে না।

আর পুলক? হেদোর জল লালচে হয়ে ওঠে, স্কটিশ চার্চ কলেজ দুলতে থাকে, বেথুন কলেজ যেন পরীরাজ্য, দেবদারু গাছগুলো হাতছানি দেয়। ট্রাম কি শব্দ ক'রে চলে!

এক দিন, দু দিন, তিন দিন—গ্রীষ্মের ছুটি এসে পড়ে।

পুলক গাঁয়ের মাঠে ব'সে থাকে। কাঁচা আম আর কাসুন্দির সঙ্গে একখানি মুখ মনে পড়ে। লিচু ছাড়িয়ে খেতে গিয়ে শাঁসের ওপর

দেখতে পায়, একজোড়া কালো চোখ লজ্জানত। জামগাছগুলো যেন খোঁপা বেঁধেছে।

বেয়ারা প্লেটের ওপর বরফ নিয়ে আসে, পলা দেখে, তার ওপরে একখানি কচি মুখ আঁকা। বায়োস্কোপ দেখতে যায়, ভ্যালেন্টিনোর মুখখানা আর একখানা মুখ এসে দেয় আড়াল ক'রে, তার চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। বলে, দাদা, এবার বুঝি চশমা নিতে হয়।

কিন্তু তার আর দরকার হয় না, কলেজ খোলে।

নিত্যকার অভ্যাস।

পুলক একদিন দেখলে, মেয়েটির চোখে হাসি। তবে কি? দূর! কারণের অভাব কি, ছোঁড়াগুলো যে ভাবে তাকায়, তা ছাড়া সাত ফুট লম্বা সেই লোকটা ট্রামে উঠতে যায়।

শনিবার।

গোলদিঘির ধারে পুলক একটা গামছার দর করছিল। সে বলে, পাঁচ আনা; গামছাওয়ালা বলে, ছ আনা। সাড়ে পাঁচ আনায় রফা হ'ল। পুলক একটা টাকা দিয়ে চেঞ্জ নেবার জন্যে হাত বাড়িয়েই দেখলে, একটা ট্রাম। পেছন দিকটা দেখা যাচ্ছিল। সেই মেয়েটিই তো! সেই জামরঙ শাড়ি, পেয়ালা-খোঁপা।

রোখকে।

গামছা রইল, চেঞ্জ রইল।

একেবারে সামনের বেঞ্চে।

মেয়েটির মুখে হাসি।

বাবু, টিকিট! ওই যা! একটি টাকা সঙ্গে ছিল—গামছা, টাকা! পুলক ভাবলে, ট্রাম, তুমি দ্বিধা হও। ফ্যালফ্যাল চোখে কণ্ডাক্টারের দিকে চেয়ে বললে, তাই তো! কণ্ডাক্টার দড়ি টানলে।

যদি কিছু মনে না করেন।—যেন বাঁশি বাজল। বাঁশের বাঁশি নয়, কুলীর কাছে কলের ছুটির বাঁশি, স্ত্রীর কাছে স্বামীর ট্রেনের বাঁশি।

মেয়েটি হাতব্যাগ খুলে একটি টাকা কণ্ডাক্টারের হাতে দিলে। ভাগ্যবান কণ্ডাক্টার।

আপনি কোথা নাববেন?

কোথা? কেন, সে কি জানে না? নির্মম। বললে, এস্‌প্ল্যানেড।

'বেদে' পড়েছেন?

বেদ তো আমাদের টেক্সট নয়। ভক্তি, কুমার—

মেয়েটি হাসে। আপনাদের দেশ কোথা?

গ্র্যাণ্ট ষ্ট্রীট। পলা উঠে দাঁড়াল। পলা নাবল। পুলকও।

আপনি না এস্‌প্ল্যানেড যাবেন?

আপনাকে ধন্যবাদ দিতে ভুলে গিয়েছিলুম।

ও! আবার হাসি। আপনার বিশেষ কাজ আছে ব'লে তো মনে হচ্ছে না, চলুন না আমার সঙ্গে।

মার্কেটের কাজ চুকতেই পলা বললে, বড্ড শ্রান্ত হয়েছি। একটা গাড়ি দেখুন না! এই ট্যাক্সি!

পলার পাশে। পাঞ্জাবিতে শাড়িতে ছোঁয়াছুঁয়ি। দুজনেই চুপচাপ।

হঠাৎ পুলক বলে, আপনি বুঝি বেথুনে পড়েন?

মেয়েটি হাসে। বলে, আমার একটা গল্প মনে পড়ছে। আমার

এক বন্ধুর বিয়ের রাত্রে—বাসর-ঘরে তার স্বামী তাকে কি জিজ্ঞেস করেছিল, জানেন ?

পুলকের চোখে পলক পড়ে না। ছোট্ট ক'রে জিজ্ঞেস করে, কি ?

জিজ্ঞেস করেছিল, তোমার নাম কি ?

পুলক বুঝতে পারে না। বলে, তাতে কি ?

মেয়েটি আবার হাসে, বলে, ওই যা! আপনার নামটি জিজ্ঞেস করা হয় নি।

পুলক গুপ্ত। আর আপনার ?

উৎপলা সেন। আমাকে সবাই পলা ব'লেই ডাকে।

পলা! ছলা, কলা, পায়ে দলা, পথ চলা, পাঁচনলা, (রিভলভার), গলা, অনেক মিল! পুলকের চিত্তে পুলকের ছোঁয়াচ লাগে।

পলা বলে, যদি কিছু মনে না করেন, আমাদের বাড়িতে একদিন যাবেন সন্ধ্যার দিকে, —নং আপার সারকুলার রোড, লাল বাড়ি।

চোখের জল আর বুঝি রাখা যায় না, আনন্দাশ্রু।

দাদার সঙ্গে আলাপ ক'রে সুখী হবেন। বউদিদিও খুব আমুদে। যাবেন একদিন ?

যাব। তার মনে পড়ল, তাদের ক্লাসের হরিপদ একদিন গাইছিল—

তোমরা মিছে ভাব
আমি যাবই যাবই যাব—

এই, রাখো। আসবেন কিন্তু কাল, আমার দাদার নাম—প্রেমোৎপল সেন।

পা আর চলে না, বুকটা ঢিপঢিপ করে। আর দুটো বাড়ির পরে।

কাঁচপোকা আর তেলাপোকা!

আলাপ-পরিচয়ের ব্যাপারটা পলাই দিলে সহজ ক'রে। প্রেমোৎপলের পত্নী নিখিল-প্রিয়া।

তারপর, শিক্ষক আর ছাত্রী। বেতন নির্দিষ্ট নয়।

এবং তারও পরে স্বামী আর স্ত্রী। পুলক তখন এম.এ. পাস ক'রে হয়েছে প্রফেসর, পলা বি. এ. দেবে।

কিন্তু পরীক্ষা আর দেওয়া হয় না, পুলকের দাবির অন্ত নেই। বলে, পাস ক'রে কি হবে, তার চাইতে—

পলা চটে। বলে, জান, জ্যোতির্ময়ী দেবী কি লিখেছেন 'ভারতবর্ষে'?

রাবিশ! পুলক বলে।

তিল থেকেই তাল, রাই কুড়িয়েই বেল।

পলার মনে সুখ নেই। মনে পড়ে, হেদো, মার্কেট, পিকচার-প্যালেস। বন্ধু আর বান্ধবীর দল।

পলার ছেলে হবে। পলা বলে, এ তোমার অন্যায়, আমি থাকব বন্ধ, আর তুমি পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে!

পুলক হাসে, অধ্যাপক পুলক। বলে, সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকে—

ছাই, সে তোমাদের অত্যাচার।

পুলক ভয় পেল। নারী-প্রগতির পাণ্ডা সলিলকুমার গুহ ঠাকুরতার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে সম্পর্ক দিলে চুকিয়ে। পলার প্রশ্নের জবাবে শুধু বললে, ওটা অতি ইতর।

পলা হাসলে। বললে, বটে?

কিন্তু অধ্যাপক সলিলকুমার তবুও আসে। একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি

ফিরে পুলক দেখে, পলা স্টোভের সামনে ব'সে মুর্গীর কাটলেট ভাজছে, আর সলিল তাই তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে। খুকী ধুলোয় প'ড়ে কাঁদছে। পুলক চীৎকার ক'রে বললে, তুমি আবার—

সলিল বললে, রাণীর আহ্বান।

তারপর তিনজন মিলে সে এক কুরুক্ষেত্র। খুকীর কান্না শোনা যায় না।

লাথি খেয়ে সলিলকুমার বেরিয়ে গেল, ব'লে গেল, দেখে নেব।

পলা আলাদা বিছানায় রাত কাটালে।

পরদিন সন্ধ্যায় পলার খোঁজ নেই, সলিলকুমারেরও। খুকীকে বুকে নিয়ে পুলক খানিকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল। তারপর রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে'খানা টেনে নিয়ে পড়তে বসল। বইখানা সলিলকুমারই পলাকে উপহার দিয়েছিল।

পুলক তবু পড়লে, নিখিলেশের কথাগুলো বেছে বেছে।

রাত যখন বারোটা, পুলকের চোখ জলে ভ'রে এসেছে, আর পড়তে পারে না, জানলার ধারে এসে সে বাইরের আকাশের পানে একবার চাইলে, কৃষ্ণচূড়াগাছের ফাঁক দিয়ে একটি মাত্র তারা দেখা যাচ্ছে। পুলক হাত জোড় ক'রে নমস্কার করলে। তারপর নিজের মনেই ব'লে উঠল, আমি তোমাকে ছুটি দিলাম, পলা, ছুটি দিলাম।

খুকী কেঁদে উঠল।

আর-১০১

দমদম এরোড্রোমের কাছাকাছি যাইতেই একটা বিকট আওয়াজ করিয়া গাড়িটা থামিয়া গেল। মদনসিং গাড়ি হইতে নামিয়া সুদক্ষ সেনাপতির মত মোটরের চারিদিকে একটা টহল মারিয়া হাসিমুখে বলিল, বাবুজী, শা— টায়ার পাংচার হো গিয়া। আমি হাসিতে পারিলাম না। বলিলাম, তব? মদনসিং ততক্ষণে কাজে লাগিয়া গিয়াছে। বলিল, কুছ্ ভয় নেই বাবুজী, আভী ঠিক হো যায়েগা।

রাত্রি তখন অনেক হইয়াছে। কুক্ষণে এত রাত্রে ব্যারাকপুর যাইবার খেয়াল হইয়াছিল। হেমন্তের পাকা ধান আসন্ন শীতের ভারী কুয়াশায় নুইয়া পড়িয়াছে। দূরে দূরে দমদম রেল-স্টেশন ও ফ্যাক্টরিসমূহের বৈদ্যুতিক আলোগুলি গাছের ফাঁকে ফাঁকে কুয়াশাবরণের মধ্যে বড় দেখাইতেছিল। সদর-রাস্তা হইতে রেল-লাইন পর্যন্ত একটা ফাঁকা মাঠ। ভিজা মাটির গন্ধ পাইতে লাগিলাম।

সেই নির্জন রাস্তায় নির্জনতর মাঠের ছোঁয়াচ লাগিয়া তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম। সহসা একটা অশ্রুতপূর্ব শব্দ কানে আসিতেই তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। চমকিয়া উঠিয়া বসিলাম। চারিটা এরোপ্লেনের আওয়াজ একসঙ্গে শুনিয়াছি, সে আওয়াজ ইহার তুলনায় কিছুই নয়। মনে হইল, একসঙ্গে শতাধিক এরোপ্লেন মাথার উপর ঘুরিয়া ঘুরিয়া নীচে নামিতেছে। গাঢ়, গম্ভীর, সাগরগর্জনবৎ শব্দ ঠিক মাথার উপরে পাক খাইতে লাগিল। হুডের বাহিরে মাথা বাহির করিয়া সভয়ে উপরে চাহিলাম; একটা বিকটাকার কালো দৈত্যের মত কি যেন নীচে নামিতেছে। অন্ধকারে ঠিক কিছু বুঝিতে পারিলাম না।

তারপর অদূরে এরোড্রোমের প্রাঙ্গণে একটা তুমুল কোলাহল শুনিতে ...ইলাম, আকাশ হইতে মৃত্তিকায় অবতরণশব্দ, সঙ্গে সমবেত জনতার উল্লাসধ্বনি। কিছুক্ষণ পূর্বেই মনে হইয়াছিল, স্থানটি নির্জন। ভুল, লক্ষ কণ্ঠধ্বনি একত্র না হইলে অমন আওয়াজ হয় না।

গাড়ি হইতে নামিয়া মাঠের পথ ধরিয়া কিছু দূর যাইতেই দেখি, টর্চ জ্বালাইয়া তিনজন লোক সেই দিকেই আসিতেছে। আমি কাছে যাইতেই একটি বিপুলকায় থাবা আমার কাঁধের উপর পড়িল, শুনিলাম, হ্যালো! খাটি সাহেব। মনটা সঙ্কুচিত হইয়া গেল। তোমাদের জন্য বিড়ি টানিয়া টানিয়া গলায় ঘা হইয়া গেল, তোমরা 'হ্যালো' বল কোন্ অধিকারে বাপু? মুখ হইতে অস্ফুট শব্দ বাহির হইল, আজ্ঞে? জলদগম্ভীর স্বরে থাবাওয়ালা ব্যক্তিটি বলিলেন, আমাকে চিনিতেছ না? আমি লর্ড টম্সন। আর-১০১ যে এইমাত্র এখানে নামিল। শব্দ শোন নাই?

খুব শুনিয়াছি। কিন্তু ঘামিয়া উঠিলাম। সেদিন সকালে 'স্টেট্স্‌ম্যানে' আর-১০১এর কঙ্কালের ছবিটি দেখিয়াছি। ঘড়ি আর আংটি দেখিয়া লর্ড টম্সনকে সনাক্ত করা হইয়াছিল। লোকটির হাতের টর্চটি লইয়া তাঁহারই মুখে ফেলিয়া অবাক হইয়া গেলাম। লর্ড টম্সনই তো! বয়কট আন্দোলন সত্ত্বেও আপনার অজ্ঞাতসারে সেলাম করিয়া ফেলিলাম। বলিলাম, আজ্ঞে, এঁরা?

চেন না? কমাণ্ডার স্কট আর স্যর্ সেফ্‌টন ব্র্যাঙ্কার।

বটে? নমস্কার, নমস্কার। কিছু মনে করিবেন না, চিনিতে পারি নাই। কিন্তু প্যারিসের কাছে সেই দুর্ঘটনাটা—? খবরের কাগজগুলা এমন অহেতুক মিথ্যা রটায় কেন?

লর্ড টম্সন ঈষৎ হাস্য করিলেন। স্তিমিত তারকাখচিত কুয়াশাচ্ছন্ন

আকাশের তলে দমদমের নির্জন ধানের ক্ষেতে ইংলণ্ডের এয়ার-মিনিস্টার লর্ড টম্‌সনের হাসি বড়ই অদ্ভুত বোধ হইল। বলিলেন, মিথ্যা ভাবিতেছ কেন? সত্যই তো প্যারিসের অনতিদূরে আর-১০১ পুড়িয়া ছাই হইয়া গিয়াছে। তাহার কঙ্কালটুকু মাত্র অবশিষ্ট আছে।

তবে?

তবু আমরা আসিয়াছি। ভারতবর্ষের আকর্ষণ আমরা উপেক্ষা করিতে পারি নাই। তোমাদের এই বিরাট প্রাচীন দেশ, তোমাদের হিমালয়, তোমাদের গঙ্গানদী মৃত্যুর পরপার হইতে আমাদিগকে টানিয়া আনিয়াছে। আর-১০১এ চাপিয়াই আমরা আসিয়াছি। ভারতবর্ষ আমাদিগকে পথে বাহির করিয়াছিল, ভারতবর্ষকে ভাবিয়া আমরা মৃত্যুবরণ করিয়াছি।

মনে মনে লজ্জা অনুভব করিলাম। আমার ধারণা ছিল, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কোনও গুপ্ত অভিসন্ধি ছিল বলিয়াই ভারতবর্ষে এয়ার-মিনিস্টারের শুভাগমন হইতেছিল, দেখিতেছি, তাহা সত্য নহে। প্রশ্ন করিলাম, আপনারা কি সকলেই আসিয়াছেন?

না, সকলে আসিতে পারিলাম কই? যাহারা মৃত্যুকে সাহস করিয়া বরণ করিতে পারিল না, তাহারা দেশেই রহিয়া গেল। গিরিনদী-অরণ্য-সমাকীর্ণ স্তিমিতনেত্র ভারতবর্ষকে তাহারা প্রত্যক্ষ করিল না। ঊর্ধ্ব আকাশলোক হইতে আর-১০১এর গবাক্ষপথে তোমাদের ভারতবর্ষকে কি সুন্দর দেখায়, তোমাদের শ্রেষ্ঠ কবিরাও তাহা কল্পনা করিতে পারিবে না। আমরা এই সৌন্দর্য দেখিয়াছি। আর-১০১কে দেখিবে না? আইস।

চঞ্চল হইয়া তাঁহাদের অনুসরণ করিলাম। মেঠো পথে চলিতে চলিতে কেন যেন একটি অসম্পূর্ণ ছবি আমার চোখের সামনে ভাসিতে

লাগিল, ইংলণ্ডের উপকূল ত্যাগ করিয়া ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করিয়া নৈশবায়ুবিক্ষিপ্ত আর-১০১ প্রাচীন গল-এর উপর দিয়া ভাসিয়া চলিয়াছে; যাত্রীদিগের মনে কি অসীম আনন্দ! জল ও স্থলের উপর যাহারা একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহারা আজ অন্তরীক্ষকেও জয় করিতে চলিল! রাত্রি গভীর হইল। বাতাস ভারী হইয়া উঠিল। ভোজনকক্ষে সকলে একত্র হইয়া হাসিগল্পগানের সঙ্গে নৈশ আহার সম্পন্ন করিলেন। লর্ড টম্‌সন চালককে প্রশ্ন করিলেন, সব ঠিক আছে তো? জবাব পাইয়া নিশ্চিন্ত মনে সকলে স্ব স্ব শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া নিতান্ত আরামে প্রজ্বলিত চুরুটের রসাস্বাদন করিতে করিতে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। পাঁচ মিনিট অতিক্রান্ত হইতে না হইতে—

ওই দেখ।

এক বিস্তীর্ণ উজ্জ্বল আলোকোদ্ভাসিত সমতল ক্ষেত্রের মাঝখানে বিপুলকায় দৈত্যের মত আর-১০১ শয়ান রহিয়াছে। ওই বিরাট যন্ত্রটির স্থূলদেহ ভস্মীভূত হইয়াছে ভাবিয়া দুঃখ হইল। আমাকে বিমর্ষ দেখিয়া লর্ড টম্‌সন বলিলেন, আর-১০১এ চাপিয়া আকাশে উঠিবে?—বলিয়াই তিনি কমাণ্ডার স্কটকে কি যেন ইঙ্গিত করিলেন।

মুহূর্তমধ্যে ধকধক গর্জনের সহিত আর-১০১ কাঁপিয়া উঠিল। আমি ব্যাকুল আগ্রহে লর্ড টম্‌সনের হাতে হাত রাখিলাম।

চমকিয়া উঠিয়া দেখিলাম, মদনসিং আমার হাত ধরিয়া আমাকে প্রশ্ন করিতেছে, কি, ব্যারাকপুরে যাবে বাবু? মদনসিংহের বনেদী ট্যাক্সিখানা স্টার্ট পাইয়া ধকধক করিয়া কাঁপিতেছে।

আমি ও তুমি

মহাকবি বায়রন লিখিয়াছেন, পুরুষের জীবন-গ্রন্থে প্রেম একটি অধ্যায় মাত্র; কিন্তু নারীর জীবনে ইহা সর্বস্ব। এই উক্তির সত্যতা ও প্রেমের একটি অধ্যায়ই যে দুই-এক জনের পক্ষে কি সাংঘাতিক হইয়া উঠে, কবি মদনমোহন খাস্তগীরের জীবনে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে। সেই মর্মভেদী ইতিহাস লিখিবার জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা।

মদনমোহন খাস্তগীর কবি। কাব্য তাঁহার পেশা না হইলেও তিনি চায়ের দোকানে কবি, মেসে কবি, রাস্তায় বটের ছায়ায় কবি, পানের দোকানের সম্মুখে কবি, চলনে কবি, বক্তৃতায় কবি, আত্মাভিমানে কবি এবং গৃহিণী ও সম্পাদকগণের সহিত মান-অভিমানেও কবি। বস্তুত কাব্য তাঁহার জীবনের সবখানি না হইলেও তাঁহার জীবনের সমস্ত কাজে কাব্য-আর্টপ্রেসের ছাপ আছে। তিনি কবিতা লেখেন ভাল, কিন্তু লেখা কবিতাগুলি লইয়া আলোচনা করেন অনেক বেশি। কোন না কোনও দিক দিয়া তাঁহার প্রত্যেকটি কবিতা কাব্যসাহিত্যের বিশেষ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত, কোন কবিতা তাঁহার বাংলা স্পেন্‌সুরিয়ান ছন্দে লিখিত, কোনও কবিতার অন্তে মিল না থাকিলেও পাঠক মিল আছে ভাবিয়া মহোল্লাসে পড়িয়া যায়—ইত্যাদি। তিনি হুইট্‌ম্যানী ছন্দে কবিতা লেখেন না। মোটের উপর, এক কথায় মদনমোহনবাবু বস্তুত কবি এবং কার্যত লয়েড্‌স ব্যাঙ্কের লেজারকীপার।

মদনবাবু তাঁহার কাব্যানুভূতির প্রথম হিড়িকে তাঁহার কবিতাস্তূপ বাছাই করিয়া 'ধোঁয়ার হাট' নামে এক কাব্যগ্রন্থ ছাপাইয়া

করিয়াছিলেন; এবং স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, অচিরাৎ এই বস্তুতান্ত্রিক জগতের কঠোরতার উপর তাঁহার ভাবের ধোঁয়ার আবরণ দিয়া তাহাকে বোরকাবৃতা আরব-মহিলার মতই মহীয়সী ও লোভনীয়া করিয়া তুলিবেন। আসলে কিন্তু বইখানিতে বেশ উঁচু ধরনেরই কবিতা স্থান পাইয়াছিল, কিন্তু কয়েকটি কবিতা দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে সাধারণ পাঠকের মনে শ্রদ্ধা ও ভয় জাতীয় একটা ভাব জাগাইয়াছিল মাত্র; প্রীতির উদ্রেক করিতে পারে নাই।

মদনবাবু বেশ উঁচুদরের কবি ছিলেন। তাঁহার কবিতা যথার্থ কাব্যামোদীদের আনন্দ বিধান করিত। কিন্তু হায়, এই কবির দেশে যথার্থ কাব্যামোদী কোথায়? তাঁহার কবিতা ইত্যাদির ভক্ত যে কেহ ছিল না তাহা নহে, তবে তাঁহার অকবিজনোচিত চেহারার নীচে অনেক ভক্ত চাপা পড়িয়াছিল। তিনি সাধারণত বাজে কবিতা লিখিতেন না; এবং উচ্ছ্বাসবশে খারাপ জিনিস কলমের মুখে বাহির হইয়া পড়িলেও, খারাপ মনে হইলে কোন লেখাই ছাপিতেন না; বার বার কাটিয়া-কুটিয়া ভস্ত্রগোছের করিয়া নিজের মনোমত হইলে তবে ছাপিতেন। তবু লোকে তাঁহার লেখা পড়িত না, বাজে বদ্দি কবিদের লইয়া হুড়াহুড়ি করিত।

এই নিদারুণ হতাদরে মদনবাবু বিশেষ আঘাত পাইয়াছিলেন এবং সেই হইতেই তাঁহার লিখিত কবিতাকে ছাপাইয়া তাঁহার মৌখিক কবিতা মাথা তুলিয়া উঠে ও তাহা রীতিমত একটা ব্যারামে দাঁড়াইয়া যায়। মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা সম্ভবত ইহাকে Repression-(কামনাদমন)-এর পর্যায়ভুক্ত করিবেন। কিন্তু আমরা জানি বলিয়াই মদনবাবুকে বিশেষ দোষ দিতে পারি না।

মদনবাবু তাঁহার প্রাপ্য সম্মান পান নাই বলিয়াই তাঁহার সামান্য

কয়েকজন পরিচিত বন্ধুবান্ধবের কাছে সেই সম্মান একটু অধিক পরিমাণে দাবি করেন। হয়তো একই কবিতা পাঁচটি বিশেষ বিশেষ অবস্থায় পাঁচবার শুনিতে হইবে; শুনিয়াছি বলিলে নিষ্কৃতি নাই; কবি অমনই ক্ষুণ্ণ হইবেন এবং অরসিকেষু ইত্যাদি বলিয়া গুম হইয়া বসিয়া থাকিবেন। তাহার পর সে কি সাধ্যসাধনা! কবির স্ত্রী বেচারীকে হয়তো প্রত্যেকটি কবিতা পঁচিশ বার টীকা-টিপ্পনী সমেত শুনিতে হইয়াছে। আমরা মদনবাবুর দুঃখের কারণ জানিতাম বলিয়াই তাঁহাকে অজস্র বাহবা দিয়া ফুলাইয়া রাখিতাম। তিনি আমাদিগকে তাঁহার শিষ্য-সম্প্রদায় কল্পনা করিয়া সুখে থাকিতেন।

কিন্তু এত করিয়াও রক্ষা করিতে পারিলাম না। অলক্ষ্য দেবতা যে আমাদের অলক্ষ্যে বেচারী কবিকে এতখানি নাকাল করিবে, তাহা কি বুঝিয়াছিলাম? অতর্কিতে সে দিক হইতেই আক্রমণ হইল।

আমরা ভাবিতাম, মাসিক সাপ্তাহিকে প্রকাশিত মদনবাবুর কবিতা কেহ পড়ে না, আমরাই স্থানে অস্থানে চায়ের দোকানে বা ফুটপাথে দাঁড়াইয়া অনন্যমনা হইয়া শুনিয়া সুদে আসলে মদনবাবুকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান দিয়া থাকি। কিন্তু ভুল করিয়াছিলাম। অন্তত একজন মহিলা যে তাঁহার রীতিমত পাঠিকা ছিল, তাহা জানিতে পারিয়াছি।

বিপদ আরম্ভ হয় 'পসারিণী' পত্রিকায় প্রকাশিত মদনবাবুর "আমি" কবিতাটি হইতে। মদনবাবু সুপুরুষ নহেন। স্ফীতোদর, কৃষ্ণকায়মূর্তি, বিকশিত দন্তপংক্তি বিদ্যুৎচমকের সৃষ্টি করিত। তিনি হেলিয়া দুলিয়া চলিতেন, সশব্দে বলিতেন, যেখানে সেখানে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতেন এবং কথার তোড়ে থুথু ছিটাইয়া প্রেমের পরিবর্তে বিরুদ্ধ ভাবই মনে জাগাইতেন। কিন্তু ছাপার অক্ষরে তো আর মানুষটিকে দেখা যায় না! কালিদাস যদি সুপুরুষ না হইয়া আজকালকার মত মাসিক-পত্রিকায়

মাসের পর মাস তাঁহার মেঘদূত বা কুমারসম্ভব ধারাবাহিকভাবে ছাপাইতে আরম্ভ করিতেন, তবে তাঁহার পাঠিকা-প্রেমিকাদের মধ্যে যে একটা রীতিমত কুরুক্ষেত্রের অবতারণা হইত, ইহা আমরা হলফ করিয়া বলিতে পারি। এক্ষেত্রেও তাহাই হইল। "আমি" কবিতাটি পড়িয়া শ্রীমতী পঙ্কজিনী হালদার আপনাবিস্মৃত হইয়া মনে মনে কবিকে প্রীতির চক্ষে দেখিতে শুরু করিলেন। সেই কবিতার 'আমি' ব্রহ্মণ্যগৌরবে দীপ্যমান পুরুষ। তাঁহার ললাট প্রশস্ত, বক্ষ সুবিশাল, নাসিকা খড়্গধার, জিহ্বায় মধু, অন্তরে উদ্বেল অজানিত প্রেয়সীর লাগিয়া প্রণয়োল্লাস। পঙ্কজিনী কবিতে কাব্যবর্ণিত গুণগুলি কল্পনা করিয়া মরিলেন।

কবিতাটি পড়িলে পঙ্কজিনীকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। সেই "আমি"কে আমাদেরই হিংসা হয়। "আমি"র খানিকটা এই—

আমি ব্রাহ্মণ, ললাটে আমার দাউদাউ হোমানল—
নয়নে আমার যজ্ঞ-অগ্নি হবি-শিখা দ্যুতিমান ;
নাসিকায় মোর খড়্গের ধার, মুখ-জ্যোতি জ্বলজ্বল ;
তপের বহ্নি আমি—তেজে জ্বলি দীপ্তিতে অবসান।

আমি গায়ত্রী, মধুজিহ্বায় সবিতার গাহি জয়—
আমিই সবিতা, 'ভূর্ভুব' আমি, 'স্ব' মোর শিখাটি ঘিরে ;
ওঙ্কার আমি, টঙ্কারে মোর ব্যোম ব্যোম ধ্বনি হয় ;
নয়নাগ্নিতে মদনভস্ম, রতি সে কাঁদিয়া ফিরে।

বক্ষ আমার কবাট-বিশাল, মৃগরাজ জিনি কটি ;
বাহুতে আমার ভীম বিক্রম, আমি সে সব্যসাচী ;

অন্তরে মোর জনম নিতেছে নব ভাব কোটি কোটি ;
পার্বতী হ'ল প্রেমের যোগিনী আমার প্রসাদ যাচি।

আমি শুধু 'আমি,' ধ্যানী যোগীবর তুষার-মৌলি গিরি ;
বক্ষ আমার অতলান্তিক উদ্বেল ভাব-ঝড়ে ;
আমি কাবা, আমি মক্কাশরীফ, হজ ক'রে ক'রে ফিরি ;
আমার জ্যোতিই হিম মেরুদেশে অরোরার আলো ধরে।

উমারে আমার স্কন্ধে লইয়া আমি নাচি তাণ্ডব—
ভাব-উমা মোর লেখনী-চক্রে হয় যে পীঠস্থান ;
আমি ব্রাহ্মণ, আমারই বক্ষে আজো দহে খাণ্ডব,
প্রেমের অমৃতে ক্ষণে ক্ষণে আমি হই অমৃতায়মান।

পঙ্কজিনী নিবিড় বাঁধনে বাঁধা পড়িলেন। মদনবাবুর কবিতা পাইলে অতি যত্নে তাঁহার নোটবইয়ে সংগ্রহ করিয়া অবসরবিনোদন করিতেন। তাঁহার ধ্যানধারণা মদনবাবুর আমিকে লইয়া একাকার হইয়া গেল। পঙ্কজিনী মরিলেন, মরিতে মরিতে বাঁচিয়া গেলেন।

পঙ্কজিনী হালদার কে, তাহা আমরা বলিব না। প্রেমের যাহা বাধা এবং আজকালকার উপন্যাস ও গল্প-লেখকগণ যে বাধার কথা একেবারে বিস্মৃত হন অর্থাৎ পিতামাতা, ভাইবন্ধু, মানসম্ভ্রম, অর্থাভাব—এসব কিছুরই বাধা গল্প-উপন্যাসের নায়িকাদের মতন তাঁহার ছিল না। তিনি প্রায় ভুঁইফোঁড় ছিলেন, স্বাধীনা ছিলেন। সুতরাং মাসিকে মদনবাবুর নিত্য নবপ্রকাশিত কবিতারূপ কুলার বাতাসে সে প্রেম উত্তরোত্তর বর্ধিতায়তন হইয়া 'তরুণ' পত্রে প্রকাশিত "ঐরাবত" কবিতাতে আসিয়া

বিরাট রূপ ধারণ করিল। কবি মদনমোহন ইন্দ্রের ঐরাবতে চড়িয়া প্রেমের বিজয়-যাত্রা করিয়াছেন। শচী হইতে পাঁচী পর্যন্ত কেহ আর বাদ রহিল না, একে একে সকলেই সেই প্রেম-ঐরাবতের চরণতলে পিষ্ট হইয়া পিণ্ডাকার হইয়া গেল। ঐরাবতের উপরে কবি—প্রেমিকারা হতাশ হইয়া সরিয়া যাইতেছে—

ঘণ্টা-নিনাদ ওই শোনা যায়—
গজরাজ আসে ধীরে,
প্রেমিকারা সবে সব ভুলে ধায়
দাঁড়ায় পথটি ঘিরে।
নিমীলচক্ষু কবি ব'সে পিঠে
বুদ্ধের অবতার—
এত যে তরুণী, এত দিঠি মিঠে
সব হয় ফুৎকার।
ঐরাবৎ সে হেলে দুলে চলে
কিছু না খেয়াল করি,
প্রেমিকারা পায়ে পড়ে দলে দলে
কবি যায় আগুসরি—

তারপর কবির স্বপনবাঞ্ছিতা আসিলেন, এবং মোজেসের সম্মুখে নীল নদীর মতন নারীর ভিড় দুই পাশে সরিয়া গেল। মোহিনীর দৃষ্টি অঙ্গে লাগাতে ধ্যানীর ধ্যান ভাঙিল, কবি আয়ত আঁখি মেলিয়া চাহিলেন, চারি চক্ষে মিলন হইল, ঐরাবত হাঁটু গাড়িয়া বসিল। প্রেয়সী গজপৃষ্ঠে উঠিলেন, জয়ডঙ্কা বাজিয়া উঠিল, কবি বলিলেন—

'ওগো বাঞ্ছিতা, কোথা ছিলে তুমি,
কোন সে স্বপন-লোকে ?
জীবন আমার ছিল মরুভূমি
তোমার বিরহ-শোকে।'

প্রেয়সী বলিলেন—

'জীবন আমার সফল আজিকে
আমি পেনু হৃদিরাজা।'

কবি বলিলেন—

'এস মুখোমুখি থাকি অনিমিখে—'

তারপর বাদ্যকরদের ডাকিয়া বলিলেন—

'মিলন-বাদ্য বাজা।'

পঙ্কজিনী নায়িকার স্থলে আপনাকে বসাইয়া অধীর হইয়া উঠিলেন। কবির সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হওয়া চাইই। তিনি 'পসারিণী' পত্রিকার সম্পাদকের কেয়ারে মদনবাবুকে বহু স্তুতিবাদ করিয়া একটি লিপি পাঠাইলেন। সে লিপিটি আমরা মদনবাবুর কাছে অনেকবার দেখিয়াছি। বিশেষ কিছু ছিল না, উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। শুধু একটি লাইন ছিল—হে সুন্দর কবি, বঙ্গের নারী-সমাজের তরফ হইতে আমি আপনাকে অভিনন্দিত করিতেছি। সেই লাইনটাই মারাত্মক হইল। মদনবাবু বিগলিত হইয়া মাথা চুলকাইয়া ভাবিতে লাগিলেন, কি করা যায়! একদিন আমাদের সঙ্গে চায়ের দোকানে তর্কই বাধিয়া গেল। হাতের লেখা, চিঠির কাগজ, খাম ইত্যাদি দেখিয়া মদনবাবু পঙ্কজিনীর এক রূপ কল্পনা করিয়া লইলেন, আমাদের বর্ণনার সঙ্গে তাহা মিলিল না বলিয়া মদনবাবু মহা খাপ্পা। তন্বীশ্যামাশিখরিদশনা নিশ্চয়ই। আমরা শেষে হটিয়া গিয়া বলিলাম, নিশ্চয়ই।

তারপর যাহা ঘটিল, অন্তর্যামীই বলিতে পারেন; মদনবাবু আমাদিগকে গোপন করিয়া যাইতে লাগিলেন। পরে অবশ্যই সমস্ত জানিয়াছি। যখন মদনবাবু পঙ্কজের "জ"টি উড়াইয়া দিয়া পঙ্কের সহিত তুলনা করিয়া তাঁহার সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন, তখন এই গোপন অভিসারের বার্ত্তা কবি গোপন করিতে পারেন নাই।

পঙ্কজিনীর চিঠি পাইয়া মদনবাবু তাঁহার এক কপি 'ধোঁয়ার হাট'-এর উপর পরিষ্কার হস্তাক্ষরে ঠিকানা-জানা অচেনা প্রেয়সীর উদ্দেশে গোপন অর্ঘ্য অর্পণ করিয়া ডাকযোগে পাঠাইয়া দিলেন, তাহাতে লিখিলেন—

'হে গোপন, তব মু'খানি হেরেছি স্বপনে,
কাটায়েছি কাল না-জানা নামটি জপনে ;
তব প্রেম মম হৃদয়-কুঞ্জে বপনে—
হে প্রেয়সী, আমি ভুখারী—'

যাহা হইবার হইল, ঘন ঘন পত্রাঘাত হইতে লাগিল। পঙ্কজিনী মজিলেন, মদনবাবু ডুবিলেন।

তারপর একদা প্রেয়সী ঠিকাগাড়ি করিয়া অভিসারে বাহির হইয়া পড়িলেন। সেদিন রবিবার। মধ্যাহ্নকাল। বসন্তের হাওয়া তখন সবেমাত্র কচি অশ্বত্থপাতাগুলি দোলাইয়া বহিতে শুরু করিয়াছে। মন উড়ুউড়ু করিতেছে। কবি স্নানের গামছাখানি পরিধান করিয়া দেড়হাতি মাদুরের উপর নগ্ন গাত্রে উবু হইয়া বসিয়া আছেন। বাঁ হাতে থেলো হুঁকাটি ধরিয়া নিমীল নেত্রে ঘন ঘন টান দিতেছেন। ডান হাতে সম্মুখে খোলা সুইন্‌বার্নের Songs before Sunrise (উষার গান) নামক কবিতা-পুস্তকের পাতা উল্টাইতেছেন। সাধের পুত্র পিতার রোমশ কৃষ্ণ বুকে তৈল মর্দন করিতেছে। কবিগেহিনী রান্নাঘরে ইলিশমাছ ভাজিতেছেন।

স্থান ও কাল উপযুক্ত সন্দেহ নাই, কিন্তু পাত্রটি ঠিক নায়কের অবস্থায় ছিলেন না। এমন সময় ঠিক গাড়ি আসিয়া বাড়ির দরজায় দাঁড়াইল।

মদনমোহনবাবু যখন পঙ্কজিনীর উদ্দেশে সপ্রেম লিপিগুলি প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন ক্ষণেকের জন্য তাঁহার মনে উদিত হয় নাই যে, অঘটনঘটনপটিয়সী পঙ্কজিনী এমন অধীর হইয়া অভিসারে বাহির হইয়া পড়িবেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, ইহাই কাব্য, ইহাই মধু। কিন্তু কাব্যের পিছনে বস্তু দাঁত বাহির করিতে পারে বা মধুর লোভে হুলের তাড়না সহ্য করিতে হয়, ইহা তাঁহার কবি-মানসের সুদূর কল্পনালোকেও ছিল না। আর ইহাও তো অন্যায়! কবির সহিত সাক্ষাতের স্থান কখনই কবির গৃহ নয়। সেখানে গৃহিণীরূপ প্রকাণ্ড একটা বস্তু শতমুখী-হস্তে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে। স্থান ঠিক কর, তারপর তো সাক্ষাৎ। ইডেন গার্ডেন রহিয়াছে, ম্যাডান কোম্পানির অমন অমন প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা রহিয়াছে, স্টার থিয়েটার আছে, গড়ের মাঠ আছে, নিদেন-পক্ষে কালীঘাটের কালীবাড়িও তো রহিয়াছে। তাহার পর ফরসা ধুতি আছে, কোঁচানো চাদর আছে। পাউডার, ক্রীম, পমেটম আছে; আরও কত কি ভাবিতে হয়; বিয়াত্রিচে কি করিয়াছিলেন ভাব, মহাশ্বেতার কথা মনে কর। তা না, এমন সময়ে বাড়িতে অকস্মাৎ—

পঙ্কজিনীরও দোষ নাই। তিনি কবি ও কাব্যকে তফাত করিতে পারেন নাই। কাব্যে যেমন কবি অবাধে ঔরঙ্গজীবের অন্তঃপুর হইতে শচীর বিলাস-কক্ষ পর্যন্ত সর্বত্রই আড়ি পাতিতে পারেন, তাঁহার বিশ্বাস ছিল, জীবনেও তাঁহার সেরূপ অবাধ গতিবিধি। তাঁহার স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নাই, তিনি যেন একখানি ডাঁটাহীন পদ্ম, কাব্য-সরসীর বুকে হাওয়ায় দোল খাইতেছেন। কিন্তু এই সামান্য ভুলের জন্য এত বড় আঘাতটাই কি মানুষকে পাইতে হয়!

নাগরা-জুতাপরিহিতা পঙ্কজিনী অতি সন্তর্পণে আসিয়া অনামিকা ও তর্জনী সহযোগে ধীরে ধীরে কড়া নাড়িলেন। কটাকট শব্দ হইল; পঙ্কজিনীর বুক ঢিপঢিপ করিতে লাগিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, বুক বুঝি শতধা ফাটিয়া পড়িবে। এত করিয়া শাড়ি ও ব্লাউজের রঙ মিলাইয়া পরিয়া আসিলেন, মনে হইতে লাগিল, বোধ হয় ঠিক খাপ খায় নাই। ঘামে বুঝি পাউডারটা সব উঠিয়া আসিল। ঘন ঘন রুমালে মুখ মুছিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, ফিরিয়া যাই; কিন্তু কড়া নাড়িয়া চলিয়া যাওয়া কি ঠিক হইবে, আর এতক্ষণে হয়তো কবির অন্তর্লোকে আগমনীর সানাই বাজিতে শুরু হইয়াছে।

রান্নাঘরের পাশেই দরজা। কে গা?—বলিয়া কবিগিন্নী দরজা খুলিলেন, পঙ্কজিনী ধীর মন্থর গতিতে ভিতরে ঢুকিয়া চারিদিকে চকিতে চাহিয়া লইলেন। উঠানে কবির সেই বিচিত্র বেশ দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইলেন।

সাহস সঞ্চয় করিয়া গিন্নীকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, মদনমোহনবাবু কোথায়? কবিগিন্নী একটু মুচকি হাসিয়া কথা না বলিয়া অঙ্গুলিনির্দেশে কবিকে দেখাইয়া দিলেন।

পঙ্কজিনীর চারিদিকে বাড়িঘরদুয়ারগুলি দুলিতে শুরু করিল। উঠানে উপবিষ্ট কবিকে কয়লার গাদা বলিয়া ভ্রম হইল। তিনি স্তব্ধ হইয়া গেলেন। কবিগিন্নী চেয়ার আগাইয়া দিয়া যখন বলিলেন, বসুন না, তখন তাঁহার ক্রোধের বেগ একটা বহির্দ্বার পাইয়া আবেগে বাহিরে আসিতে চাহিল। তিনি ছুটিয়া কবির সম্মুখে আসিয়া দুই হাত নাড়িয়া কান্না-গদগদ স্বরে বলিয়া উঠিলেন, তুমি—আপনি—মদনবাবু? বলিয়াই নাগরাজুতা সমেত দুই পাক ঘুর খাইয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন, মুখ হইতে বাহির হইল, জোচ্চোর!

কোনও প্রাচীন প্রাসাদ কিংবা অতীতের স্মৃতি-রঞ্জিত কোনও স্থান দেখিলেই কবির চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিত। তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্ত দেখিতেন। মনে হইত, যেন ভারতের সহিত চীনের একটি গভীর আত্মীয়তাবন্ধনের ছিন্ন সূত্র তিনি সেখানে খুঁজিয়া পাইতেন। কোনও সুন্দর নদী, পর্বত, বনশ্রেণী কিংবা উদ্যান দেখিলেও তাঁহাকে সামলানো দায় হইত। তিনি এই বৃদ্ধ বয়সেই এখানে সেখানে ছুটাছুটি করিতেন। তাঁহার রূপদক্ষ, রসপিপাসু চিত্ত তন্ময় হইয়া যাইত। ক্ষুধার তাড়ায় বা শ্বাপদভয়ে কোনও প্রকারে তাঁহাকে ফিরাইতে হইত।

সেদিন কবি প্রাচীন পাটলিপুত্রে বিশ্রাম করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। নূতন নগরীর এক প্রান্তে গঙ্গার উপরে একখানি দ্বিতল গৃহ; সুন্দর কারুকার্যখচিত। নূতন নির্মিত হইলেও প্রাচীন বলিয়া ভুল হয়। বাড়িটি কবির ভারি পছন্দ হইয়াছিল। বাড়ির দক্ষিণে গঙ্গা সেই অতীত যুগের স্মৃতি বহন করিয়া শ্রান্ত গতিতে চলিয়াছে—যেন স্মৃতিভারাক্রান্ত হইয়া তাহার গতি মন্থর হইয়া পড়িয়াছে। অতি মন্দ মন্দ বাতাস বহিয়া বাড়ির উত্তর দিকের ঝাউ ও বাঁশগাছের পাতায় পাতায় একটা একটানা ঝিরঝির শব্দ জাগাইতেছিল। তখন সবেমাত্র ভোর হইয়াছে। চারিদিকে একটা প্রশান্ত নীরবতা, নগরের কোলাহল তখনও নিদ্রিত। প্রত্যহ সূর্যোদয় দেখা কবির একটা নেশা বা নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের মধ্যেই দাঁড়াইয়াছে। অন্ধকার আকাশের অন্তরাল হইতে আলোকের স্বর্ণাভা ধীরে ধীরে কি করিয়া পূর্বাকাশকে রঙিন করিয়া তুলে, এই লীলা প্রতিদিন তিনি দেখেন; কিন্তু রহস্য তাঁহার নিকট নিবিড়তর হইয়া উঠে। তিনি নদীর পরপারে দূর দিক্চক্রবালসীমান্তে লোহিত খণ্ডসূর্যের পানে চাহিয়া বসিয়া ছিলেন এবং ভুলিয়া ভুলিয়া গানের পর গান রচনা করিয়া একেবারে তন্ময় হইয়া গাহিতেছিলেন। কি সে অপূর্ব সুর! কি সে

অপরূপ শব্দযোজনা! ভারতী যেন কবির কণ্ঠে তখন স্বয়ং আবির্ভূতা! আমরা সকলে নিঃশব্দে তাঁহার নিকট বসিয়া পূর্বগগনে রঙের খেলা এবং কবির কণ্ঠে সুরের লীলা দুইই সমান উপভোগ করিতে লাগিলাম।

আমরা সকলেই সে গান শুনিয়া এত তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলাম যে, বেলা যে বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা লক্ষ্যই করি নাই। সহসা ভৃত্য আসিয়া কবির হস্তে সেদিনকার ডাক দিয়া যাইতেই সকলের চমক ভাঙিল। অন্যান্য সকলেই উঠিয়া গেলেন। রহিলাম কেবল কবি এবং আমি। কবির চিঠি পড়া এবং জবাব লেখার কাজ আমাকেই করিতে হইত।

কবি একটির পর একটি চিঠি পড়িয়া যাইতেছিলেন এবং বিদেশী ভাষায় লিখিত চিঠি পাইলেই আমার হাতে দিতেছিলেন। দেশী ভাষার চিঠি সমস্তই তিনি নিজে পড়িতেন। সহসা আমাকে বলিলেন, দেখ তো হে, কি লিখেছে? দেখিলাম, চিঠিখানি চীনাভাষায় লেখা। একটু আশ্চর্য হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই দেখিলাম, বৃদ্ধের চোখে তাঁহার সেই শয়তানী হাসির দৃষ্টি। চোখের কোণ দিয়া রহস্য যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছে। মুখের অন্য স্থান স্বাভাবিক প্রশান্ত। এমন দুষ্টহাসি হাসিতে আমি আর কাহাকেও দেখি নাই। বুঝিলাম, চিঠিটা তিনি পড়িয়াছেন এবং অদ্ভুত এমন কিছু ইহাতে দেখিয়াছেন, যাহাতে তিনি যথেষ্ট কৌতুক অনুভব করিতেছেন। তাঁহার মেজাজটা তখন অত্যন্ত হালকা ছিল, নতুবা এ ধরনের চিঠি আমাকে না দিয়াই ছিঁড়িয়া ফেলিতেন। তাঁহার এই পঞ্চষষ্ঠি বৎসর বয়স পর্যন্ত কত অদ্ভুত চিঠিই যে তিনি পাইয়াছেন! সুতরাং নেহাত মেজাজ ভাল না থাকিলে এ সব তিনি গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন না।

যাহা হউক, চিঠিখানা হাতে লইয়া প্রথমেই লেখকের নামের দিকে নজর করিয়াই দেখিলাম—খি-লি-চাং। চিনিতে না পারিয়া কবির মুখের দিকে চাহিলাম, তিনি একটু হাসিয়া অন্য কাজে মন দিলেন।

চিঠিটা পড়িতে পড়িতে আমার এত হাসি পাইল যে, কবির সম্মুখে থাকিতে সাহস করিলাম না। বারান্দা হইতে একটি কুঠরির মধ্যে গিয়া পেটে খিল ধরাইয়া একলা একচোট হাসিতেছি, এমন সময়ে রসিকপ্রবর খি-তাং ঘরে ঢুকিয়াই বলিলেন, কি হে আ-লি-স্বা-স্থ্য, ব্যাপার কি, একলা একলাই যে হাসছ? ভারতবর্ষের রঙিন হাওয়ায় বুদ্ধিভ্রংশ হয় নি তো? তুমি যে সেই গল্পের নায়কের মত করলে—সেই আমাদের হাং-চু-ফু-চুংয়ের গল্প। আমি কথা না বলিয়া তাঁহার হাতে চিঠিখানি দিলাম। চার লাইন পড়িতে না পড়িতেই দেখি, তাঁহার ভুঁড়ির উপর হইতে হাসির চোটে কাপড় খসিয়া পড়িতেছে, তিনি পেটে হাত বুলাইতে বুলাইতে বসিয়া পড়িলেন। আমি বলিলাম, কি, এবারে বলুন আপনার হাং-চু-ফু-চুংয়ের গল্প। কিন্তু গল্প আর বলাই হইল না; ঠিক সেই সময়েই হাসির তোড়ে শিল্পী নাং-দাং আসিয়া উপস্থিত এবং তিনজনে কে কত হাসিতে পারে তাহার পাল্লা শুরু হইল।

হাসির প্রথম জের সমাপ্ত হইলে তিনজনে মিলিয়া একত্রে আবার সেই অপূর্ব লিপিকা পাঠ করা হইল। সেটি হুবহু এইরূপ—

গুরুদেব, কং-লি

আজ কতকাল যে আপনি এই দুর্ভাগা দেশকে ছেড়ে রয়েছেন! এখনও কি দেশের মাটি আপনাকে ঘরের পানে হাতছানি দিয়ে ডাকছে না? আমার যেন মনে হচ্ছে, আপনি কত যুগ আমাদের কাছে নেই; শেল্‌ফের ওপর আপনার বইগুলোর দিকে যখন চাই আর কাগজে যখন

আপনার কথা পড়ি, মনটা হু-হু করতে থাকে, চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। এ দুর্বিষহ বিরহ আর কতকাল সইতে হবে প্রভু!

আপনার নতুন কবিতা চিংচা পিংলা—অর্থাৎ যৌবন-রসে উচ্ছলিত পেয়ালার কবিতাটি মোট একার বার পড়লুম। অহো-.হা গুরুদেব, আপনি মানুষ নন। আপনার কবিতাতে বার্ধক্য এসেছে বলাতে ক্ষুংচির সঙ্গে সেদিন হাতাহাতি পর্যন্ত করেছি। হায় হায়! আপনাকে এমন দেশেও জন্মাতে হয়েছিল!

গুরুদেব, আমি এক মহা সমস্যায় পড়েছি। আমার কবিতা (আপনার কাছেও আমার কবিতার কথা উল্লেখ করতে হ'ল, হায় দুরদৃষ্ট!) প'ড়ে একটি কিশোরী, 'পঞ্চদশ বসন্তের একগাছি মালা'* আমাকে মনপ্রাণ সমর্পণ ক'রে মানস-মিলন-মাল্য অর্পণ করেছে। সামাজিক মিলন যদি না ঘটে, তবে সে আর জীবন রাখবে না স্থির করেছে। সেই প্রেমার্ত কিশোরী চাতকিনী ইতিমধ্যে আমার প্রেমময়ী পত্নীর অনুমতি সংগ্রহ করেছে। আমি কি করব কিছুই ঠিক করতে পারছি না। এ সময়ে তুমি কোথায় গুরুদেব?

আমার নতুন কাব্য পিং-চু-তি বের হয়েছে। গুরুদেব, বড় আশা ছিল, তোমার চরণে স্বহস্তে এই অকিঞ্চনের ব্যর্থপ্রয়াস অঞ্জলি দেব, কিন্তু হায়—

প্রভু, আর কেন? দেশে ফিরে আসুন। সস্ত্রীক আমার এবং সেই অস্ফুট-মঞ্জরী কিশোরীটির শত শত প্রণাম জানবেন। ইতি

ভক্ত শিষ্য খি-লি-চাং

পুনশ্চ—গুরুদেব, আমাদের কালো গাইটির একটি বাছুর হয়েছে। তার নামকরণ নিয়ে বড় গোলমালে পড়েছি। তুমি কাছে থাকলে

* বাঙালী পাঠক শুনিয়া চমৎকৃত হইবেন যে, ঠিক এই ভাবের একটি কবিতা কবি ছা-চেন-ভাবের আছে, এবং খি-লি-চাং সেইটিরই প্রথম লাইন উদ্ধৃত করিয়াছিল।—অনুবাদক।

ভাবনা করতুম না,—মঙ্গলবারে হয়েছে ব'লে "মঙ্গলী" নাম রাখব মনে করছি। গুরুদেব, সেটা কি কাব্যহিসাবে অসঙ্গত হবে?

খি-তাং এই চিঠিখানি অতি মিহি গলায় (খি-তাংয়ের মিহি গলা।) থিয়েটারী ঢঙে পড়িতে লাগিলেন। আমার ও নাং-লাংয়ের তো প্রায় দম বন্ধ হইবার মত হইল। নাং-লাং জিজ্ঞাসা করিলেন, কে হে এই চিজটি? আমি বলিলাম, আমি তো চিনি ব'লে মনে হচ্ছে না। লিখেছে কবি, কিন্তু ওর কবিতা পড়েছি ব'লে তো মনে পড়ে না।

খি-তাং খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, হয়েছে, হয়েছে, কবি খি-লি-চাংকে এবার চিনতে পেরেছি। কেন তুমি দেখ নি, কংলির রাং মা লাইব্রেরির প্রত্যেক সভায় তো সে উপস্থিত থাকে। বিশেষত কবি চ্যু-চেন-তান সংক্রান্ত কোনও ব্যাপার হ'লে তার তো থাকা চাইই। হ্যাঁ, ভক্ত বটে!

আমি বলিলাম, তাঁর একটু বর্ণনা করুন তো।

খি-তাং তাঁর বিপুল হাত নাড়িয়া বলিলেন, টেকো মাথা, বেঁটে, কালো, মোটা, মাথার পেছন দিকে কিছু চুল আছে, ভুঁড়িওয়ালা। পেশা জিজ্ঞাসা করলে বলেন—কবি।

বর্ণনা শুনিয়া একটি অস্পষ্ট আকৃতি আমার মনে আসিতে লাগিল।

খি-তাং বলিলেন, ওঁর স্ত্রীর নাম করলে চিনতে পারবে। উনি হচ্ছেন লেখিকা তং মা'র স্বামী।

পরিষ্কার চিনিতে না পারিলেও লোকটিকে দেখিবার জন্য দারুণ আগ্রহ হইল, কিন্তু কবি তখন বাংলা দেশের অপূর্ব পল্লীশ্রী দেখিয়া ফিরিতেছেন। শীঘ্র ফিরিবেন বলিয়া বোধ হইতেছিল না। সুবিশাল পদ্মানদীতে তাঁহার সহিত নৌকাবাস করিয়া আমরা প্রায় জলচর প্রাণী হইয়া পড়িয়াছিলাম। নদী এবং বালুচরের অপূর্ব সৌন্দর্যে মোহিত হইলেও মাঝে মাঝে মন আমার দেশমাতার কোলে ফিরিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছিল।

গজানন্দ

গজানন্দ শেষাশেষি সত্য সত্যই একটা পাকা ব্যবসাদারী অফিসে ঠিক পঞ্চাশ টাকায় কেরানী-সেল্‌স্‌ম্যান-এর কাজ নিলে। কাঠের ব্যবসা সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে সে গোড়াতেই সমস্ত পার্বত্য অরণ্যই ইজারা নেওয়ার কথা ভেবেছে, ট্যাক্সি চালাবার কথা হ'লেই সে ইন্দো-টিবেটান রেলওয়ে সম্বন্ধে স্কীম কেঁদেছে, দু কোটি হামানদিস্তা রাখার সুবিধা মতন গুদামঘর না পাওয়াতে সে কবরেজি ব্যবসাটাতে হাতই দিতে পারলে না, অথচ সে-ই আজ ঠিক সাড়ে নয়টায় সময় ছাতাটি গলায় আটকে দোকানে হাজির হয়ে হাসিমুখে প্রথমেই বড়বাবুকে দর্শন দেয়, তারপর সারাদিন হাতে বাজিয়ে, হাতুড়ি ঠুকে, নখের আঁচড় দিয়ে মালের চিরস্থায়িত্ব প্রমাণ ক'রে, পূর্ববঙ্গের সওদাকারীদের ষ্টীল ট্রাঙ্ক বিক্রি করে।

জ্যোতিবিদ আজন্ম অনন্ত আকাশের গ্রহনক্ষত্রের গতি ও অবস্থান পর্যালোচনা ক'রে একদিন হঠাৎ মাটির দিকে তাকিয়ে পিঁপড়েরাও বুদ্ধিমানের মত সার বেঁধে চলাফেরা করছে দেখে সহসা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে দূরবীক্ষণকে বিসর্জন দিয়ে অণুবীক্ষণকেই, ধর্মত্যাগী নবলব্ধ ধর্মকে যেমন গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে দেখে, তেমন ক'রে পূজা করে; গজানন্দও আজ হঠাৎ হাই ফাইনান্স ও ইকনমিক্স-ক্লিষ্ট মস্তিষ্কে ষ্টীল ট্রাঙ্ক ব্যবসায়ের অসম্ভব জটিলতা ও চরম পূর্ণতা উপলব্ধি ক'রে ভাবগদগদ প্রাণে দোকানে ক্রেতার অভাব-অবকাশে ভক্তের মত লক অ্যাণ্ড কী ডিপার্টমেণ্টের হেড ছোটবাবুর দিকে ঈষৎ বিস্ফারিত বদনে তাকিয়ে থাকে।

এই তো ব্যবসা! বিল আসে, বিল যায়। দর-দস্তুর, কেনা-বেচা, লাভ-লোকসান, ক্রেডিট-ক্যাশ, ব্যাঙ্ক-চেক, ড্রাফ্ট-রিমাইণ্ডার, লেজার-ডে'বুক, মেমো-পেটিক্যাশ প্রভৃতির আবর্তে সে আপনাকে হারিয়ে ফেললে। যে বড়বাবু ক্রশ্‌ড-চেক পোস্ট ডেট ক'রে ছাড়া পেমেন্ট করেন না, দশ পারসেন্ট-এ টাকা ধার ক'রে চব্বিশ পারসেণ্ট-এ খাটিয়ে মার্জিন রেখে লাল হয়ে ওঠেন, তিনি কি মানুষ! না, ছোটবাবুই যিনি দিশী লকের উপর স্বহস্তে ইংলণ্ডের প্রস্তুত লিখে দুনো দামে বিক্রি ক'রে দাঁও মেরেছি ভেবে বহির্গমনোন্মুখ ক্রেতার দিকে সস্মিত বদনে চেয়ে থাকতে পারেন, তিনিই মানুষ!

গজানন্দ এতদিন দেবতাহীন ভক্তের মত তার উচ্চব্যবসায়-উন্মত্ত হৃদয়টি নিয়ে আজ কমার্শিয়াল ইন্‌স্টিটিউট, কাল করেস্‌পণ্ডেন্স কোর্স নিয়ে কথঞ্চিৎ ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছে। আজ সে ধর্ম পরিবর্তন করলে বটে, কিন্তু নবাবিষ্কৃত দেবতার দিব্যভাতিতে ধর্মত্যাগের দুঃখ তার মনে একবারও জাগল না। বড়বাবু বললে সে এখন একটা হামানদিস্তা নিয়েই কবরেজি শুরু করতে পারে; একখানা ট্যাক্সির মালিক হয়েই পথে পথে ভাড়া খুঁজে ছোটাছুটি করতে পরে; পাঁচ কিউবিক ফুট সেগুনকাঠ কিংবা দুই স্কোয়ার ফুট টিনের পাত নিয়ে দু ঘণ্টা দরদস্তুরও করতে পারে। আর বিজ্ঞাপনের কথা! সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় যখন সে দেখত যে, বদনচন্দ্র গুড় অ্যাণ্ড সন্স-এর খাঁটি স্টীল ট্রাঙ্ক পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তখন এই শ্রেষ্ঠত্বের আভা তার নিজের মুখকেও উজ্জ্বল ক'রে তুলত। যে স্টীল ট্রাঙ্ক দুশো বছর পূর্বে কেউ কল্পনাও করতে পারত না, যা আজ বাংলার ঘরে ঘরে হাঁড়ি ও কাঠের সিন্দুককে দূর ক'রে বিরাজমান, যার অভ্যন্তরে ছিন্নবস্ত্র থাকলেও বস্ত্রের মালিককে সমৃদ্ধিশালী ব'লে ভুল হয়, যার পেটেন্ট লক ছোটবাবুর

নিজের আবিষ্কৃত এবং সকল চোরের শরমের মূল, সেই ষ্টীল ট্রাঙ্ক-মাহাত্ম্যে গজানন্দ আজ নিজেকে ধন্য মনে করলে।

নব-নব ব্যবসায়ের নব-নব স্কীম যার উর্বর মস্তিষ্ক হতে অহরহ গজিয়ে উঠত, কাল্পনিক ব্যবসায়ের বিরাট উন্নতিতে মুগ্ধ হয়ে যে দুনিয়ার সাধারণ ব্যবসায়ে হাতই দিতে পারলে না, সেই গজানন্দ এখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিমুগ্ধ নয়নে তালার কলকব্জা নিরীক্ষণ করে; অদ্ভুত বিস্ময়ে দেখতে থাকে, বর্ণহীন ষ্টীল কি ক'রে বর্ণবৈচিত্র্যে বিচিত্র হয়ে ওঠে। ষ্টীল ট্রাঙ্কের গায়ে সে দেখে, কখনও বা পীত সাগরের উত্তালতরঙ্গবিক্ষোভ, কখনও বা লোহিত সাগরের মৃদুমন্দ বীচিভঙ্গ, কখনও বা সুদূর সুদান প্রান্তরের পার্বত্য বালু-গুহায় পশুরাজের পাংশুল কেশররাজি; কোথাও দুর্গম সুন্দরবনের কৃষ্ণ-পীতরেখ রয়্যাল বেঙ্গল শার্দুলের মসৃণগাত্রকণ্ডূয়ন কোথাও তিব্বত উপত্যকার বাইসনের কৃষ্ণকান্তি, কোথাও অতলান্তিক মহাসাগরের অশান্ত বর্তুলাকার আবর্ত। কখনও বা সে কোন ট্রাঙ্কের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন-এর শো-কেস-স্থিত মানবগাত্রচর্মের বীভৎস রেখাবৈচিত্র্য দেখে যুগপৎ বীভৎস ও মাধুর্য রসাপ্লুত হয়; কখনও বা বিন্ধ্যাচলের শ্যামল বনানীর হরিৎ, মালয়সাগরবেলাভূমিস্থিত তমালতালীবনরাজিনীলার নীল নয়নসম্মুখে ট্রাঙ্কাকারে সজ্জিত দেখে এই সকলের মূলাধার বড়বাবুর চরণে বারম্বার শত শত প্রণাম-নিবেদন করে।

গজানন্দের ধোঁয়াটে জীবন এমনই ক'রে রূপে রসে বর্ণে গন্ধে ভ'রে উঠতে লাগল। সে মুখে নিজেকে কেরানী ব'লে প্রচার করলেও বড়বাবুর ব্যবসা-সাফল্য-গর্বে নিজেকে গৌরববিমণ্ডিত মনে করত, পথে ঘাটে মাসিক সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠায় বদনচন্দ্র গুড়ের ষ্টীল ট্রাঙ্কের বিজ্ঞাপন দেখে নিজেরই প্রশংসাপত্র ভেবে আত্মগর্বে স্ফীত হ'ত, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে,

নাকের কাছে, দূরে বেঁকা ক'রে, সোজা ক'রে, বিজ্ঞাপনের টাইপ-সেটিং পজিশন বর্ডার স্পেসিং-এফেক্ট প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যেত।

কোনদিন হয়তো বড়বাবু বাড়ি ফেরবার পথে ছোট গোলাপী-রঙ-করা হলদে ১৯০৩ সালে সেলে-কেনা ফোর্ড গাড়িটিতে গজানন্দকেও নিয়ে আসতেন। গজানন্দের বাড়ির গলির মুখে গজানন্দকে নামিয়ে দিয়ে বড়রাস্তা-বরাবর বড়বাবুর গাড়ি যখন দৃষ্টির অন্তরালে চ'লে যেত, তার অনেকক্ষণ পরেও দেখা যেত, গজানন্দ তার ভক্তি-গদগদ দেহটি নিয়ে মহাশিল্পীর হস্তপ্রসূত সছত্র কোনও গতায়ুশ্রেষ্ঠের স্মৃতিমূর্তির মত নিশ্চলভাবে গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে, সে সময়ে কোন পরিচিত লোক তাকে ডাকলে কোনও উত্তর পেত না। গজানন্দ তন্ময় ও তদ্গত চিত্তে অনন্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে স্থাণুর মত নিঃশব্দ মাদকতায় উন্মত্ত হয়ে কখনও আধ ঘণ্টা কখনও এক ঘণ্টা সেই কোলাহলমুখর ডাস্টবিন-সঙ্কুল গলির মোড়টিতে দাঁড়িয়ে কাটিয়ে দিত।

আগে আগে যেদিন যত বড় স্কীম গজানন্দের মাথায় খেলত, নিজের জীবন ততখানি নৈরাশ্যময় মনে হ'ত; কিন্তু আজকাল জীবনকে সহজ সরল উজ্জ্বল বিরাট মনে হয়; ষ্টীল ট্রাঙ্ক, বিল আর লেজারের নিরেট সত্তার ভিতর দিয়ে ফোজ আর মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারতে পারে না। গজানন্দ আজ খুশি, গজানন্দ আজ সুখী।

দিন যায়। বড়বাবু আজকাল অনেকক্ষণ গজানন্দের সঙ্গে ব্যবসা সম্বন্ধে সলাপরামর্শ করেন। গজানন্দ বড়বাবুর প্রতি প্রেম ও ভক্তিতে বিগলিত হয়ে উঠতে থাকে। রোজ ঠিক অভ্যস্ত সময়ে বড়বাবু ডাকেন, গজানন্দ!

গজানন্দ মাথা চুলকোতে চুলকোতে বিনীত ছাত্রের মত এসে বড়বাবুর সামনেটিতে বসে।

বড়বাবু বলেন, দেখ, ক্যাবিন-সাইজ ট্রাঙ্কে জোর লিভার দক দেওয়াটাই দরকার। কি বল হে ?

গজানন্দ বলে, আজ্ঞে।

আর দেখ, বিজ্ঞাপনের দিকে আর একটু বেশি নজর দেওয়া চাই, হ্যাঁ, স্টীল ট্রাঙ্ক সম্বন্ধে একটা সার্কুলার বের করতে হবে। তা দেখ, আমরা তো মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, এন্‌ট্রান্সও পাস করি নি। তা তুমিই এটা লিখো। তবে আমি একটা লিখেছি, দেখ তো, যা ভুল-টুল আছে, তা সংশোধন ক'রে চালানো যায় কি না ?

গজানন্দ বিস্ফারিত নয়নে সার্কুলারখানি প'ড়ে দেখলে। বললে, ওর চেয়ে ভাল সে কল্পনাও করতে পারে না।

তারপর নিজের জায়গায় এসে ক্রেতার প্রতীক্ষায় গজানন্দ বড়বাবুর মহানুভবতা আর তীক্ষ্ণতার কথা ভাবতে ভাবতে ঢুলতে থাকে। চোখ তার ধীরে ধীরে নিমীল হয়ে আসে। কার যেন ক্ষীরস্পর্শে পক্ষ্ম ও চক্ষে এমন একটা নিবিড় ঘনিষ্ঠতা গজিয়ে ওঠে যে, চক্ষুরুন্মীলন অসাধ্য হয়ে ওঠে।

...আহা, কে যেন একতাল গিনি-সোনা পিঁজে আকাশের কোলে ছড়িয়ে দিয়েছে! বড়বাবু কি বলেছেন ? গিনি-সোনা বাইশ না তেইশ ক্যারেট ? মন্দানিলে ভাসমান পায়রার পালকের মত ও কি ভেসে আসছে ? ও কি পুষ্পক রথ ? প্রাচীন ভারতের Dirigible-এ কি Hydrogen থাকত ? না, Helium gas ? তাই তো Sheman-doah-টা গেল—বড়বাবু বলেছেন, ভারতে ইংরেজ আসবার আগে বিজ্ঞান বা ব্যবসাবুদ্ধি বা সিস্টেম ব'লে কিছু ছিল না; তা নইলে এত

অশোকস্তম্ভ, এত প্রস্তরফলক, অথচ কোথাও বিজনেস পাব্লিসিটির গন্ধ নাই কেন? Waste of energy! আসছে, আসছে, ওই আরও এগিয়ে এল—এ কি Streamline body—এ কি Valspar, না Robaillac? না, পুষ্পক রথ তো নয়, মোটরকারও নয়, মেঘের কোলে ভেসে ভেসে ও তো আমারই দিকে আসছে—শো-উইন্‌ডোর কাঁচটার ভিতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, সোজা এদিকেই এল; তাই তো, কাঁচটা ভেঙে যাবে না তো! যাক, বড়বাবু উইন্‌ডো-পেন ইন্‌সিওর করেছেন। আহা, প্রভঞ্জন-জননী গজেন্দ্রগামিনী মেঘমালার কোলে দোদুল্যমান, এ তো রথ নয়, এ যে বিশালকায় স্বর্গীয় রঙে রঞ্জিত একটি ষ্টীল ট্রাঙ্ক, গ্লাস পেন-এর ভিতর দিয়ে ওটা যে ভিতরে ঢুকে গেল, কই, কাঁচ তো ভাঙল না—তাজ্জব ব্যাপার! কাউণ্টারের ওপর ভাসমান ষ্টীল ট্রাঙ্কটা এসে দাঁড়াল। ধীরে ধীরে তার re-inforced brass knobbed ঢাকনিটা খুলে গেল—ও কি! ও কি! কি যেন একটা চাপা হাসির আভাস ওর অন্তরতম প্রদেশ থেকে যেন বেরিয়ে আসছে আমারই দিকে—কত নূপুরশিঞ্জন, কত বলয়নিক্কণ, কত মন্দ গন্ধানিল—এ কি! উর্বশী, রম্ভা, তোমরা? কোথেকে? এই ষ্টীল ট্রাঙ্কের গর্ভ থেকেই হাসিমুখে নৃত্যপরায়ণা নটীর মত বেরিয়ে এলে না? না, এ তো শম্ভুদের ছোট খোকার ঝি! খোকাকে লেডিজ পার্কে রোজ ঠেলা-গাড়িতে ক'রে নিয়ে যায়; আর তুমি, তোমায় যেন কাদের বাড়ির না গাড়ির জানলাতে দেখেছি, ছি ছি, এ কি করছ? লুকিয়ে পড়, লুকিয়ে পড়—ছোটবাবু দেখলে কি ভাববেন? চকিত আতঙ্কে গজানন্দ সটান জেগে উঠল।—দেখলে, আজানুলম্বিত-খদ্দরপরিহিত কতিপয় ক্রেতা; তাহাদের 'ক্যাম্‌নে' 'ক্যাম্‌তে' ও 'হ—বটে' শব্দে দোকান মুখরিত হয়ে উঠেছে। গজানন্দ কাস্টমার

পেয়ে স্বপ্ন-শোক ভুলে ট্রাঙ্কের ক্রেতা আর কলকব্জার পিছনে মেতে উঠল।

দিনগুলো এমনই নানা রঙে রঙিন হয়ে গজানন্দের সেল্‌স্‌ম্যান জীবনকে রাঙিয়ে তুলতে লাগল। সে এখন বড়বাবু, ছোটবাবু আর ম্যানেজার মদনমোহন—এই তিনটি Trinity Godhead দেখতে শুরু করেছে; লক আঁটবার স্ক্রু-ড্রাইভারটিতেই সোনার কাঠির পরশ পায়—গজানন্দ আজ ধন্য!

পুজোর ছুটি এগিয়ে আসছে;—দোকানে প্রত্যহ এবারকার বিজ্ঞাপন কি ভাবে দেওয়া যাবে, এই নিয়ে বিরাট জল্পনাকল্পনা চলছে। বড়বাবু বলছেন, সব কাগজে ভাল স্পেস নিয়ে খুব অল্প কথায়, খুব effective campaign করতে হবে। প্রতিদ্বন্দ্বী সামসুল ও সালিমার কোং-কে একেবারে বসিয়ে দেওয়া চাই; ছোটবাবু বলেছেন, একটা বিরাট effect produce করবেন। ম্যানেজার একবার বড়বাবুর কথা শুনে তাঁর দিকে চেয়ে ঘাড় নাড়ে আর একবার ছোটবাবুর কথায় তালে তালে সজোরে মাথা নাড়ে। আর গজানন্দ এই আর্থিক দুরবস্থার সময়েও একটা তেইশ শিলিং দামের বিলিতী বিজ্ঞাপনের বইই অর্ডার দিয়ে ফেললে। মোটের ওপর, একটা বিরাট রকম বিজ্ঞাপন দিয়ে পুজোর হিড়িকে বড়বাবুকে বিশেষ কিছু লাভ পাইয়ে দেবে। সামান্য কিছু বোনাস পাবার ভরসায় কর্মচারীদের হৃদয় আন্দোলিত হতে লাগল।

পুজোর দিনকয়েক আগে নিত্য দোকান-জীবনযাত্রার স্রোতে একটু বাধা পড়ল।

বড়বাবু একদিন অফিসে এসে ডাকলেন, গজানন্দ! গজানন্দ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সামনের চেয়ারে এসে বসল। বড়বাবু তার হাতে

একটি টেলিগ্রাম দিয়ে ফ্যানের দিকে তাকিয়ে দাড়িতে অঙ্গুলিসঞ্চালন করতে লাগলেন। গজানন্দ পড়ল, বড়বাবুর ভগিনীর বেনারসে খুব অসুখ। বড়বাবু আর ছোটবাবুকে সেখানে অবিলম্বে যেতে হবে। এই পুজোর বাজারের সময় দোকান ছেড়ে যাওয়া! বড়বাবু বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন, তবে গজানন্দ আছে, এই যা ভরসা। বড়বাবু বললেন, দেখ গজানন্দ, আমাদের তো যেতেই হবে—মদন বিজ্ঞাপনের দিকটা তেমন বোঝে না, অথচ এই বিজ্ঞাপনের ওপরেই পুজোর বিক্রি সব নির্ভর করছে। আমি আর কচি (ছোটবাবু) আজকেই বেনারস যাব, কবে ফিরব বলা যায় না। একটু সাবধানে বিজ্ঞাপন দেবে। তুমি এ সব বেশ বোঝ, তবু আমি সামান্য দু-চারটে কথা ব'লে যাচ্ছি। দেখ, সব কাগজে বেশ ভাল স্পেস নেবে। টাকা খরচে ভয় ক'রো না, কারণ টাকা না গেলে টাকা আসে না। সব জায়গায় এক বিজ্ঞাপন দেবে, তাতে কাজ হয় বেশি। অল্প কথায় বেশ ফাঁক রেখে বিজ্ঞাপন লিখবে! খদ্দেরদের কাছে বেশ একটু intellectual appeal থাকবে—এ বিষয়ে তুমি বেশ বোঝ, একটু বিবেচনা ক'রে কাজ করবে। আর দেখ, জিনিসটা একটু নতুন ধরনের হওয়া চাই—নতুনের দিকে লোকের চোখ সহজেই আকৃষ্ট হয়। টাইপ-সেটিং বেশ ভাল হবে, আর প্রত্যেকটা লাইন আলাদা পয়েন্ট-এর টাইপে দেবে—মোটের ওপর তোমাকে সব ভার দিয়ে যাচ্ছি, জানি তুমি কাজটা ঠিক পারবে।

গজানন্দ বিনীত হাস্যে একবার 'হ্যাঁ হ্যাঁ' ক'রে সম্ভ্রমপূর্ণ হৃদয়ে আনন্দাশ্রু গোপন করতে চেষ্টা ক'রে বললে, সে যথাসাধ্য কাজ করতে চেষ্টা করবে।

বড়বাবু ও ছোটবাবু চ'লে গেলেন। গজানন্দ মহা ভাবনায়

পড়ল, অথচ আনন্দ আর তার হৃদয়ে ধরে না। এত বড় দায়িত্বের ভার! এত অখণ্ড বিশ্বাস! এমন সহানুভূতি! সে একদিন বদনচন্দ্র গুড় অ্যাণ্ড সন্সের অংশীদার হবার স্বপ্ন দেখতে লাগল; তার মনে পড়তে লাগল, এমন অনেক সব ঘটনার কথা সে জানে, যেখানে গোড়াতেই এর চেয়ে কম বিশ্বাস সত্ত্বেও ভবিষ্যতে কতজনে ব্যবসায়ে অংশীদার হয়েছে। এই তো সেদিন কুমিল্লার কেশব রায় জার্মানির একটা কাচের কারখানায় কারিগরের কাজ করতে করতে তার অংশীদার তো হয়েইছে, আবার কর্তার মেয়েটি পর্যন্ত পেয়েছে। সে চারবার মাটির দিকে চেয়ে আর তিনবার সিলিং-এর দিকে চেয়ে সমস্ত ষ্টীল ট্রাঙ্কগুলোর চার পাশে ঘুরে এল। থ্যাকার স্পিঙ্ক-এ ফোন ক'রে জানলে, তার সেই বিজ্ঞাপনের বইটা তখনও এসে পৌঁছয় নি।

গজানন্দ সেদিন অনভ্যস্ত হাসিমুখে চায়ের দোকানের বন্ধুদের সঙ্গে অল্পক্ষণ আলাপ ক'রে বাড়ি গিয়ে ভাবতে লাগল; যত ভাবে ভাবনার আর অন্ত নেই। বিজ্ঞাপন—বিজ্ঞাপন! বিজ্ঞাপন, টাইপ, স্পেস, ইন্‌টেলিজেন্স, অ্যাপীল,—ঝাঁকে ঝাঁকে ক্রেতা, বড়বাবুর হাসিমুখ, অংশীদার—গজানন্দ ঘামতে শুরু করলে, সে লেখে আর কাটে, কাটে আর ছেঁড়ে, একখানা উর্বশী প্যাড প্রায় শেষ হ'য়ে এল; শেষকালে রাত্রি আড়াইটার সময় তিন প্যাকেট ট্যাট্‌লার সিগারেট পুড়িয়ে একটা লেখা খাড়া হ'ল, যেটা তার বেশ মনঃপূত হ'ল। সে সাতখানা কাগজে বড়-ছোট হরফে সাত রকম ক'রে বিজ্ঞাপনটা লিখে কাছে নিয়ে, দূরে নিয়ে, চোখের ওপর তার এফেক্ট দেখতে লাগল; স্কেল নিয়ে টাইপ-ফেস কি রকম হবে ঠিক ক'রে নিলে; most up-to-date করবার জন্যে বিশ্বভারতীর নবপ্রচারিত বৈজ্ঞানিক বানানবিষয়ক পুস্তিকাটি একবার দেখে নিয়ে সেই অনুসারে বানান ঠিক ক'রে নিলে,

তারপর যেটি পছন্দ হ'ল, সেইটে হাতে ক'রে বহুক্ষণ ব'সে ব'সে কত কি ভাবলে।

আহা, বেচারা মদনমোহন!

তার পরদিন গজানন্দ দোকানে এসেই জোরে জোরে পা ফেলে পায়চারি করতে লাগল। দু-একটি খদ্দের আসছে, গজানন্দের ক্ষোভ নেই। একটা দুটো কি, দশটা পাঁচটা কি, বিজ্ঞাপন দেওয়া হ'লে ঝাঁকে ঝাঁকে লাখে লাখে খদ্দের জুটবে। সেল্‌স্‌ম্যানরা হাঁফ ছাড়বার অবসর পাবে না; মদনবাবুকেও স্ক্রু-ড্রাইভার ধরতে হবে। গজানন্দ মদনবাবুর দিকে চেয়ে একটা অবজ্ঞার হাসি হাসলে; মদনবাবু বললে, গজানন্দবাবু, এদের দেখুন।

গজানন্দ ম্যানেজারকে বিজ্ঞাপনের কপিটা দিলে। ম্যানেজার চমকে উঠল, না মশায়, এ চলবে না, লোকে বুঝবেই না, পেটেন্ট ওষুধের বিজ্ঞাপন, না, স্টীল ট্রাঙ্কের বিজ্ঞাপন। গজানন্দ একটু বাঁকা হাসি হেসে বললে, ঠিক চলবে মশাই।—ব'লে ডান পাটা নাচাতে শুরু করলে। মদনবাবু কি করবেন, বড়বাবুর হুকুম, গজানন্দ বিজ্ঞাপন যা দেবে তাই দিতে হবে। আর বড়বাবুর মত নেবার সময়ও নেই, সে অগত্যা সব কাগজের অফিসে গজানন্দের কপির একটা ক'রে নকল পাঠিয়ে দিলে।

গজানন্দ বড়বাবুকে চিঠি দিলে। বিজ্ঞাপন দেওয়ার পরদিন থেকে এক ঘণ্টা আগে দোকানে যেতে শুরু করলে। কাল 'প্রবাহিনী' কাগজ বের হবে। পরশুদিন আরও গোটাকয়েক বের হবে, গজানন্দ কর্মচারীদের একটু সকাল সকাল আসতে অনুরোধ করলে।

কিন্তু গজানন্দ মাপকাঠি আর স্ক্রু-ড্রাইভার নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; সাধারণ যেমন খদ্দের আসে, তেমনিই আসে; গজানন্দ মহা ভাবনায়

পড়ল। মদনবাবু ডাকলেন, কি গজানন্দবাবু? গজানন্দ জোরের সঙ্গে বললে, আরে, দেখুন না, এখনও কাগজ লোকের হাতে পৌছয় নি।

এদিকে বড়বাবুর কাছে সব কাগজ পৌছুতে লাগল। তিনি গজানন্দের কীর্তি দেখে চমকে উঠলেন। সব কাগজেই এই অদ্ভুত বিজ্ঞাপনটি বেরিয়েছে।—

"দেখা, শোনা, বোঝা, কেনা

চোখের কাজ

আমাদের কাজ

তোমাদের কাজ

পূজা বাজারে পথের মাঝারে

কী জন্য এত হুলস্থূল?

আধুনিক ব্যবসায়ের পাঁচটি মূল মন্ত্র

সাবধানতা!

শঠতা নিবারণ!!

সুচিন্তিত প্রণালী-অনুসরণ!!!

অগ্রগামী ব্যবহারিকতা!!!

কিম্বদন্তীর মতো প্রচারিত হওন!!!!!

সামাজিক ডাক্তার কেহ থাকিলে বলিবে

Re: One or more Badan Chandra Gur's Pure Steel Trunk

মফস্বলে সব বড় বড় দোকানে ও কলিকাতার সেণ্ট্রাল অ্যাভিনিউর মোড়ে আমাদের শো-রুমে প্রাপ্তব্য।"

বড়বাবু প্রমাদ আশঙ্কা ক'রে তৎক্ষণাৎ কলকাতায় রওনা হলেন। এসেই দোকানে হাজির হয়ে গজানন্দকে ডাকলেন, শোন তো হে।

গজানন্দ আধ-শঙ্কায় কম্পিত জড়িত চরণে তাঁর কাছে এসে দাঁড়াল।

এ কি সর্বনাশ করেছ!

আজ্ঞে এই তো ইন্‌টেলেক্‌চুয়েল অ্যাপীল হয়েছে, অথচ নতুন ধরনের—

না বাপু, তুমি এই বিজ্ঞাপন দিয়ে আমার মহালোকসান ক'রে দিলে। দেখ তো, আজ অষ্টমী, অথচ আটজনও খদ্দের নেই! তোমাকে, বাপু, জবাব দিলাম। ওহে মদন, গজানন্দকে এই মাসের মাইনেটা পুরো দিয়ে দাও তো।

গজানন্দ কি যেন বলতে চেষ্টা করলে, কিন্তু তার শুষ্ক মুখ দিয়ে কথা বের হ'ল না। ধীরে ধীরে নিজের জায়গাটিতে এসে ছাতাটি নিয়ে কাঁধে ফেললে, তারপর একবার দোকানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সেই বিচিত্র ট্রাঙ্ক-সমন্বিত ঘরখানি দেখে একটা সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করলে। বেরিয়ে আসবার পথে মদনবাবুকে একটা শুষ্ক প্রণাম ক'রে বাইরে এসে দাঁড়াল। বড়বাবুকে আর প্রণাম করা হ'ল না।

গজানন্দ বাইরে দাঁড়িয়ে একবার জগতের অকৃতজ্ঞতার কথা ভেবে বড়বাবুর বাড়ির কথা ভাবলে; তারপর ধীরে ধীরে আবার দু-কোটি হামানদিস্তা আর তরাই ইজারা নেওয়ার কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরে এল।

তিন দিন পরে থ্যাকার স্পিঙ্ক-এর দোকান থেকে খবর এল, তার অর্ডারি সেই পিক্‌ফলাসের 'পার্সপিকিউয়াস পাব্‌লিসিটি' বইখানা এসেছে—নতুন এক্সচেঞ্জ-এ দাম ৩॥০ টাকা বেশি লাগবে।

গজানন্দ আবার একটি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লে। তখনও বাইরে বিসর্জনের করুণ সুরে কলিকাতার ধোঁয়াটে আকাশ থমথম করছিল। গজানন্দ তার নিরীশ্বরবাদ ভুলে ব'লে উঠল, হায় মা!

নভেল

প্রথম পরিচ্ছেদ

'সুন্দর আসিছে পিছে অবগাহি বেদনার রুধিরাক্ত হ্রদে,
ওড়ে তার ধূলি-রাঙা গৈরিক পতাকা'—

—কাজি নজরুল ইসলাম

'গান্ধীমায়ীকী জয়', 'স্বরাজকুমারকী জয়' রবে আবার রণভূমি প্রকম্পিত হইয়া উঠিল। দিগন্ত ব্যাপিয়া রুদ্রদেবতার অট্টহাসি শ্রুত হইল, মহাকাল যেন গগনপাত্রে স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া দিলেন, কি লিখিলেন পড়িবে কে? কে সেই বিরাটকে, ভূমাকে, সেই বিপুলকে, সেই ইঙ্গিতকে প্রত্যক্ষ করিবে? সাধনা কোথায়? এক পদে ভর করিয়া ঊর্ধ্ববাহু হইয়া শুধু মহাব্যোমের অপানবায়ু পান করিয়া অনন্ত ঊর্ধ্ব-লোকপানে রুক্ষ সজল দৃষ্টি স্থাপন করিয়া দেবতার সে আরাধনা কই? তাই আবার বাজিয়া উঠিল ভেরী, কাড়া, নাকাড়া, দামামা, দুন্দুভি। এক দিকে এক লক্ষ ধাঙড় সেনা, অন্য দিকে—কিন্তু অন্য দিক মেঘাবৃত ইন্দ্রজিতের মত বিশালকায় প্রাসাদের অন্তরাল হইতে দ্রুতগামী মোটর-যানের অভ্যন্তর হইতে ঘনবর্মাবৃত হইয়া কৌশলে কাপুরুষের ন্যায় যুদ্ধ করিতেছে,—তাহারা সংখ্যায় কত, কে নির্ণয় করিবে?

কিন্তু তবু যুদ্ধ বাধিল। অকস্মাৎ বাধিল, হঠাৎ বাধিল। কোনও আভাস নেই, ইঙ্গিত নেই, নোটিশ নেই, ultimatum নেই—সহসা 'গান্ধীমায়ীকী জয়', 'স্বরাজকুমারকী জয়' রবে সমগ্র পৃথিবীর বেতার-বার্তা বিকল হইয়া গেল। এই দুই প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ ক্ষিপ্ত ও উন্মত্ত সেনাদলের ঠিক কেন্দ্রস্থলে করালবদনী দিগ্‌বসনা মহাকালীর

ন্যায় এক হস্তে ব্যাগ ও অন্য হস্তে বরাভয় লইয়া কে দণ্ডায়মানা—পাঠক, বলিতে পার কি, বলিতে পার কি পাঠক, ওই আলুলায়িতকুন্তলা কমলকোমলা নারী কোথায় চলিয়াছে? কোনও দিকে দৃষ্টি নাই, বেপথুমানা বেতসলতার ন্যায় চঞ্চলিত আন্দোলিত নহে, দৃপ্ত ভঙ্গীতে সম্মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নারী কোথায় চলিয়াছে? পাঠক, তুমি কিছু ভাবিতে ভরসা পাইবে না জানি, কিন্তু হে পাঠিকা, তুমি যদি ভাবিয়া থাক, নারী অভিসারে চলিয়াছে, তাহা হইলে তুমি ভুল করিলে! নারী কি এমনই করিয়া অভিসারে যায়? রমণী অভিযানে চলিয়াছে; হ্যাঁ, অভিযান, পাঠক, অভিযান। নগরপালদের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযান, পশ্চাতে অনন্ত ধাঙড়বাহিনী—কেহ কোঁদালিকা, কেহ খুন্তিকা, কেহ শতমুখী, কেহ সহস্রমুখী হস্তে 'গান্ধীমায়ীকি জয়' রবে বিপুল উৎসাহে মানসিংহ-পরিচালিত মোগল সৈন্যের ন্যায় চলিয়াছে। পাঠিকারা না হয় ইচ্ছা করিয়াই এই প্রদীপ্ত স্বরূপিনী নারীকে চিনিবে না; কিন্তু পাঠক, তুমিও কি চিনিলে না? ইনি সেই গান্ধাররাজকুমারী রঞ্জাবতী, 'গান্ধীমায়ী' নামে সাধারণ্যে খ্যাত।

রমণী অকস্মাৎ বামহস্তে লীলায়িত ভঙ্গীতে বংশীবাদন করিলেন, এক ফুঁ। অমনই সেই বিরাট বাহিনী গগন-দৃষ্ট্যাহত সৈন্যদলের ন্যায় প্রস্তরীভূত না হইয়াও স্তব্ধ হইয়া গেল। আবার বাঁশী বাজিল, এবার দুই ফুঁ। ধাঙড়বাহিনী রামচন্দ্র-পাদস্পর্শে পাষাণী অহল্যার মত চঞ্চলিত হইয়া উঠিল, তারপর যুদ্ধ শুরু হইল। সে কি ভীষণ যুদ্ধ! পাঠক, যদি পুরুষ হও, তবে নয়ন বিস্ফারিত করিয়া দেখ—পাঠিকা, তুমি যদি নারী হও, চক্ষু আচ্ছাদিত কর, এ যুদ্ধ দেখা তোমার কর্তব্য নহে, বিশেষ করিয়া তোমার যদি 'ফিটে'র ব্যারাম থাকে।

যুদ্ধ বাধিল, প্রত্যক্ষ—অপ্রত্যক্ষে; দৃষ্টে ও অদৃষ্টে; গোচরীভূত ও

[ব]াহিরে। সংঘে ও ব্যক্তিতে, শ্রমিকে ও ধনিকে ভয়াবহ আহব।
[প]াঠক, এই অদ্ভুত অপরূপ যুদ্ধ বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই, আমি
[হা]র মানিলাম। কতটুকু আমাদের জ্ঞান, কতটুকু বা দেখিয়াছি যে, এই
[যু]দ্ধ বর্ণনার স্পর্দ্ধা করিব! তবে হে পাঠক, তোমরা এই যুদ্ধের কথা
[জ]ানিবে না, পড়িবে না? কেন পড়িবে না? ভগবান সর্বমঙ্গলময়—উপায়-
[বি]ধান তিনি করিবেনই, তাই তিনি তোমাদের 'ফরোয়ার্ড' দিয়াছেন,
'বাংলার কথা' দিয়াছেন, 'আত্মশক্তি' দিয়াছেন। যে কোন সংখ্যা
'ফরোয়ার্ড', 'আত্মশক্তি' ও 'বাংলার কথা' পাঠ কর, সম্পাদকীয় মন্তব্যে
বা সংবাদ-স্তম্ভে এই যুদ্ধের বর্ণনা পাইবে।

যুদ্ধ বাধিল, দিগ্‌দিগন্তে ধূলি উড়িল। ভাঙা ক্যানেস্তারা, ছেঁড়া চটি,
ফুটা হাঁড়ি, শুকনা পাতা, খালি ঠোঙা, ভাত-ডাল, মাছের কাঁটা,
ডিমের খোলা, বোরিক তুলা, ছেঁড়া ফরোয়ার্ড, পচা ইঁদুর ডাস্টবিন
ছাপাইয়া রাজপথে উন্মত্ত নৃত্য শুরু করিল। রোগের বীজ গজাইতে
লাগিল—কাগজের মসলা জমিতে লাগিল। সমস্ত নগরীর উপর আবর্জনা
ও জঞ্জালের একটা স্তর জমিয়া গেল—বিসুবিয়াসের পাদদেশে প্রাচীন
পম্পিয়াই শহরের ন্যায় লোকজন-অট্টালিকা-শোভিত নগরী কোথায় গেল?

কোথায় গেল কে বলিবে? শুধু রাহয়া রহিয়া 'গান্ধীমায়ীকী জয়',
'স্বরাজকুমারকী জয়' ধ্বনি বাষ্পাচ্ছন্ন গগনবক্ষ বিদীর্ণ করিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

তূর্যধ্বনি

'When great O'Connel died,
That man whome all did trust,
That man whome Henglish pride
Beheld with such disgust

Then Erin free fixed eyes on me,
And swoar I should be fust.'

—William Makepeace Thackeray

বিবর্ত-রাজপুত্র স্বরাজকুমারের নাম কে না শুনিয়াছে! ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় কাহার নাম আজ জনসাধারণের মুখে মুখে! কে এই স্লেচ্ছ-আহবে রুদ্র-ভৈরব সাজিয়া ডমরু বাজাইতেছে আর কাঁদিতেছে, কাঁদিতেছে আর বক্তৃতা দিতেছে, বক্তৃতা দিতেছে আর— থাক্ পাঠক, আর বলিব না। সর্বজনবিদিত কথার আর নববিজ্ঞপ্তি করিব না।

স্বরাজকুমার আজ বালখিল্য ঋষিদের জাগাইয়াছেন। হেদুয়াতলায় তাই সভা বসিয়াছে। সম্মুখের প্রাসাদোপম অট্টালিকা-তপোবন ভেদ করিয়া বালখিল্য ঋষিরা হেদুয়ার নৈঋতকোণে সমবেত হইয়াছে। আচার্য লম্বা চুলের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছেন, স্বাধীন কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন; তপোবন-বিরুদ্ধ বলিয়া চুলের অবমাননা করিয়াছেন—আজ বালখিল্যদের নবজাগরণ হইবে।

বেঞ্চ পাতা হইয়াছে—বক্তৃতামঞ্চ হইবে। একখানি চেয়ার আসিয়াছে—স্বরাজকুমার বসিবেন, তাঁহার বুকের দোষ, তিনি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন না। গায়ক ও বাদকদল চারিদিকে সমবেত হইয়াছে—আসে নাই কেবল সেই ধ্বজবাহিনী ও তাহার নেত্রী। তাহারা কোথায় গেল? পাঠক, এখনও কি বলিয়া দিতে হইবে, তাহারা কোথায় গেল? বাতাসকে জিজ্ঞাসা কর, সে বলিয়া দিবে; আকাশকে প্রশ্ন কর, সে অর্থহীন ইঙ্গিতে জবাব দিবে, তাহারা কোথায় গেল!

তাহারা হেদুয়াতে ডুবিয়া মরে নাই। তাহা হইলে কি সেখানে সভা বসিতে পারিত?

স্বরাজকুমার আসিলেন, সঙ্গে কাঞ্চী-রাজকন্যা মেখলাময়ী। দেখুন

কলেজ ও স্কটিশ চার্চ কলেজ প্রকম্পিত করিয়া ধ্বনিত হইল—'স্বরাজ-কুমারের জয়', 'স্বাধীনতার জয়'। চারণ গান গাহিল—'এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালবাসি।' হেদুয়ার জল বীচিভঙ্গে মুখর হইল।

মেখলাময়ী বক্তৃতা দিলেন—

লম্বা চুল রাখিয়াছে তো হইয়াছে কি? চুলই তো সর্বস্ব; আত্মসর্বস্ব, কালসর্বস্ব, ইহকালসর্বস্ব, পরকালসর্বস্ব; তাই, আমিসর্বস্ব, তুমিসর্বস্ব। তাই সব, আমরাও তো বিদ্যুৎবাহক চুল মস্তকে ধারণ করিতেছি—অতএব কলেজ ছাড়িয়া দাও, চুল রাখ।

সুন্দরী পাঠিকা, তুমি অঞ্চলে বদন আচ্ছন্ন করিয়া হাস্য করিতেছ কি, সখীর কানে কানে অস্ফুট গুঞ্জনে বলিতেছ কি, মেয়েটা (গ্রাম্যভাষায়) কি বেহায়া গো, বেটাছেলেদের এসব কি কথা বলিতেছে!' সুন্দরী, তুমি এসব কথা যদি নাই বোঝ, এইখানেই পুঁথি বন্ধ করিয়া দাও। চুলের জয় হউক।

বাত্যাহত কদলীবৎ কম্পান্বিতা সেই কোমলাঙ্গীর মুহুর্মুহু ভাষণে স্কটিশ চার্চ কলেজ দুলিতে লাগিল। অমনই স্বরাজকুমার উঠিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে শুরু করিলেন— তিনি কি বলিলেন, বলিবার প্রয়োজন নাই। পাঠক! আমেরিকায় যাও, সে কথা শুনিতে পাইবে। মস্কোতে সেই কথাই অহরহ ধ্বনিত হইতেছে। আফগানিস্তানের আমির সেই বার্তা লইয়াই দেশে বিদেশে ঘুরিতেছেন। শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত অর্থকরী অর্থপুস্তকে সেই বাণীই ছাপার অক্ষরে দেখিতে পাইবে, গিরিশ বসু মহাশয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞানের তাহাই গোড়াকার কথা। অতএব পাঠক, ক্ষান্ত হইলাম।

কিন্তু লেখক ক্ষান্ত হইলেই কি প্রকৃতি ক্ষান্ত হয়? ওই দেখ, তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতাবাণে আহত হইয়া দোদুল্যমান স্কটিশ চার্চ কলেজের

এক-একখানি ইঁট খসিতে লাগিল এবং অচিরকাল মধ্যে সেই সুবৃহৎ প্রাসাদ একখানি পাহাড়পুর-স্তূপে পরিণত হইয়া গেল। প্রত্নতাত্ত্বিক পাঠক, এ কথা স্মরণ করিয়া রাখিও।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মূক

'কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল,
এ তাজমহল।'

—রবীন্দ্রনাথ

কিছুতেই কিছু হইল না, পাঠক! এখনও তাহা খাড়া হইয়া আছে, বড় রাস্তার ঠিক মাঝখানে আঙুল উঁচাইয়া যেন সকলকে উপহাস করিতেছে। করুক উপহাস—মহাকাল প্রতীক্ষা করিতেছেন; মড়োয়ারীরা দিন গনিতেছে। কি হইবে? হাসপাতাল, হোটেল, তাড়িখানা, খবরের কাগজের আপিস—না, স্বরাজ-আশ্রম? বাবা স্বরাজকুমার শেষ বয়সে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়া ওই স্থানেই লীলা করিবেন। শিষ্যেরা সস্ত্রীক অপেক্ষা করিতেছেন।

কিন্তু হে ভাই পাঠক, বুকে যে বড় বাজে! গুর্খা সান্ত্রী রাস্তায় পায়চারি করিতে করিতে পাহারা দিতেছে, থুথু ফেলিবার জন্যও সেখানে যাইবার জো নাই। বিদ্রোহীরা দূর হইতে মুষ্টি উত্তোলন করিয়া দেখাইতেছে; তাহাদের সে উদ্যত মুষ্টি কি সেখানে পৌছাইবে না? ভগবান কি এত নিষ্করুণ?

কিন্তু, দেহহীন অদৃশ্য ভগবান যাহাই হউন, তাঁহারই অবতার, তাঁহারই রক্ত-মাংসের প্রতীক, তাঁহারই নিরাকার কোলজোড়া খোকা,

মা কালীর নিকট মানত করিতেছেন—তিনি চুপ করিয়া নাই। দেখিতেছ না, তাঁহার ললাটে সিন্দুররেখা গাঢ়তর হইতেছে ; তাঁহার বক্ষের বেদনা জমাট বাঁধিয়া অশ্রুধারায় প্রবহমান ? দেখিতেছ না, তাঁহার দিনে শান্তি, রাত্রে নিদ্রা নাই ? তাই পাঠিকা, তাঁহার জন্ম তুলসীতলায় অন্তত দিনান্তে একবার দেবতার কৃপা ভিক্ষা করিও।

কিন্তু তবু দাঁড়াইয়া আছে মূক বধির ওই— সহৃদয় পাঠক ! ও নাম লেখনীমুখে আনিতে পারিব না।

হতাশ হইয়া স্বরাজকুমার দেবতার সন্ধানে বাহির হইলেন। বর চাই—আশীর্বাদ চাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সন্ধান

'And in God's presence, Moses took his place
Veiled in the cloud—and saw Him face to face.'
—Alfred DeVigny

কিন্তু কোথায় দেবতা ? কোথা সেই ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু প্রেমময় হরি ? স্বরাজকুমার দেশভ্রমণে বাহির হইলেন।

কিন্তু মূক হইলে কি হয়, দেবতা যে অন্তর্যামী। সন্তানের কাতর প্রার্থনা তাঁহার নিকট পৌছিল। দেবতা ধরাধামে দর্শন দিলেন।

স্বরাজকুমারের নিকট এ সংবাদ দেবতা স্বয়ং স্বপ্নে গোচর করাইলেন। তিনি আলুথালু বেশে মেখলাময়ী সমভিব্যাহারে বিন্ধ্যগিরি হইতে অবতরণ করিলেন—একেবারে মানিকতলা ও আমহার্স্ট স্ট্রীটের জংশনে। সেখানে একটি কর্তিত নিম্ববৃক্ষমূলে দেবতা স্বয়ং ভাণ্ডরূপে দর্শন দিয়াছেন।

উন্মত্তের মত দুই ধারের জনতা সরাইয়া পশ্চাদ্বর্তিনী যেথলামরীর হস্ত আকর্ষণ করিয়া স্বরাজকুমার 'বাবা কই, বাবা কই' বলিয়া একেবারে অকু-স্থলে উপস্থিত হইলেন। আজ তাঁহার 'পকেট মারুসে হুঁশিয়ার' -বিজ্ঞাপন নজরে পড়িল না, পকেট হইতে স্বরাজের চাঁদার খাতাটি চুরি হইল। 'দশ হাজার ভলান্টিয়ার চাই' এই নোটিসও ভলান্টিয়ার-রাজ স্বরাজকুমারের দৃষ্টিপথে পড়িল না। 'বাবা বাবা' বলিয়া তিনি সেই বংশদণ্ড-ঘেরা শালু-চাঁদোয়া-তলবর্তী কর্ত্তিত নিম্ববৃক্ষমূলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূর্চ্ছাভঙ্গে দেখিলেন—

কি দেখিলেন, হে ভাই পাঠক, হে ভগিনী পাঠিকা, তাহা আমাদের প্রচার করিবার হুকুম নাই। তবে যদি তোমরা আর কাহাকেও আভাসে ইঙ্গিতেও এ কথা বলিবে না বলিয়া কথা দাও, তাহা হইলে বলিতেছি।

স্বরাজকুমার দেখিলেন,—বাবার একটি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ। আর কোনও অঙ্গ নাই। সেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ মাথায় তুলিয়া লইয়া স্বরাজকুমার কাশী গেলেন, দার্জিলিং গেলেন, ঢাকা গেলেন, নওগাঁ গেলেন, যদি পরমপিতার অন্য অঙ্গেরও সন্ধান মিলে। কিন্তু বহু চেষ্টায় সে সন্ধান মিলিল না। স্বরাজ-কুমার কালীঘাটের কালীমন্দির-সন্নিহিত এক উদ্যানে বাবার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বয়ং পাণ্ডা হইয়া বসিলেন।

তারপর—

দখল লইয়া মকদ্দমা শুরু হইল। আবার তিনখানি কাগজ বাহির হইল, কিন্তু তাহা অন্য উপন্যাসের বিষয়।

'Hindu Religion Insulted'

'Hindu Religion Insulted, Don't Join City College.' প্রাতঃকালে বাসী মুখে বিশেষ জরুরি কাজে বাহির হইয়া শ্যামবাজার ডিপোয় ট্রামের অপেক্ষা করিতেছি, অকস্মাৎ শুষ্ক শাখে বায়সধ্বনি, শূন্যকলস, বামে সর্প ও দক্ষিণে শৃগালের ন্যায় প্রাচীরগাত্রে সাদা কাগজের উপরে লাল অক্ষরাঙ্কিত এই মহা অমঙ্গলচিহ্ন দেখিয়া চমকিয়া উঠিলাম, একসঙ্গে যেন সহস্র টিকটিকি কানের কাছে সমবেত টিকটিক শব্দে গর্জন করিয়া উঠিল, শতাধিক গর্দভ রজকবিতাড়িত হইয়া একেবারে যেন গা ঘেঁষিয়া চলিয়া গেল, চমকিয়া রাম-নাম উচ্চারণ করিয়া নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিলাম, দুর্গতিনাশিনী দুর্গার শরণ লইলাম। কিন্তু তবু ভয় ভাঙিল না, বিফলতা ও নৈরাশ্য চোখের সম্মুখে নৃত্য জুড়িয়া দিল। হিন্দুধর্ম অপমানিত হইয়াছে! সর্বনাশ!—যে ধর্মকে আজ পর্যন্ত স্বয়ং ধর্মরাজও অপমান করিতে পারিলেন না, যে ধর্ম নিবাতনিষ্কম্প শিখার মত যুগে যুগে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, শক হূন পাঠান মোগল পর্তুগীজ ওলন্দাজ ফরাসী ইংরেজ সকলের অত্যাচার ও স্পর্শ বাঁচাইয়া গতকল্য পর্যন্তও যাহা মনুমেন্টের মত মাথা উঁচাইয়া ছিল, কোরান, বাইবেল হ্যাভেলক এলিস, ইণ্ডিয়ান পিনাল কোড, এমন কি, মিস মেয়োর 'মাদার ইণ্ডিয়া' পর্যন্ত যে ধর্মের বহিরঙ্গেও বিন্দুমাত্র কালিমা লেপন করিতে সক্ষম হয় নাই, অকস্মাৎ সেই ধর্ম অপমানিত হইল!

শঙ্কা হইল, বুঝি বা যুগ-বিপর্যয় সাধিত হইতেছে। পাশে মুদীর দোকানের সদ্যোত্থিত ছোকরার নিকট গিয়া একখানি গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা চাহিলাম। কুলুঙ্গিস্থিত গণেশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম,

তিনি অচল হইয়া বিরাজ করিতেছেন, তাঁহার মাথার উপর দেওয়ালে তিনটি সিন্দুর-দাগ জলজল করিতেছে এবং তাঁহার বাহন জীবন্ত হইয়া বহু দেহ ধারণ করিয়া কখনও চালের বস্তায়, কখনও ময়দার ধামায় ছুটাছুটি করিয়া ফিরিতেছে।

পাঁজি খুলিয়া আশ্বস্ত হইলাম, যুগপরিবর্তনের এখনও ১,৩৯,২০,১২২ বৎসর বাকি আছে। কিন্তু আইনস্টাইন গোলযোগ বাধায় নাই তো? সে তো এখনও জীবিত আছে। অকস্মাৎ যদি Theory of Relativity-র জোরে সেই খ্রীষ্টানটা হিন্দুধর্মের ৯৯৯৮৮৮৭৭৭,৬৬৬৫৫৫৪৪৪,৩৩৩২২২১১১ বৎসরের ইতিহাসের মধ্যে এই ক্ষুদ্র কয়টা বৎসর গরমিল করিয়া দেয়—কিন্তু না, ধর্ম-বিষয়ে এরূপ চিন্তাও দূষণীয়।

বর্ষফল দেখিলাম, এই বৎসরে একজন বৈদেশিক রাজা গতায়ু হইবেন, পাটের দর চড়িবে ও পৃথিবীর বায়ুকোণে যুদ্ধবিগ্রহের আশঙ্কা আছে। মাসফলে দেখিলাম, নিকারাগুয়াতে চন্দ্রগ্রহণ দৃষ্ট হইবে—অর্ধগ্রাস। ইহার নীচে দেখি, কে যেন পেনসিল দিয়া লিখিয়া রাখিয়াছে, খোকা-ভগবানের দাড়ি গজাইবে ও বিবাহ হইবে। মুদী-বালককে জিজ্ঞাসা করিলাম, পেনসিলে কাহার গণনা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে? শুনিলাম, বেহালার পঞ্চানন ভট্টাচার্য, ওরফে পাঁচুঠাকুর এই গণনা করিয়াছেন। মনে ভয় হইল, যুগান্তের কথা সত্য হইতে পারে, কারণ পণ্ডিতে যখন পঞ্জিকার গণনার উপরেও হস্তক্ষেপ শুরু করিয়াছেন, তখন আর যুগবিপর্যয়ের বাকি কি?

তাড়াতাড়ি কাজ সারিয়া বাড়ি ফিরিতে হইবে ভাবিয়া পাঁজিখানি শ্রদ্ধার সহিত প্রত্যর্পণ করিয়া ট্রামে উঠিলাম। যতদূর যাই, লাল নীল বিচিত্র কালিতে দেওয়ালগাত্রে হিন্দুধর্মের অবমাননার বার্তা পড়িতে পড়িতে চলিলাম। Are you a Hindu? আলবৎ হিন্দু, কিন্তু

হিন্দুর definition কি? ট্রামের ঝাঁকানিতে মাথাটা ঠিক থাকিতেছিল না, definition ঠিক করিতে পারিলাম না। মনে পড়িল, বেদ-উপনিষদ রামায়ণ-মহাভারত পুরাণ-গীতা মনু-পরাশর বর্ণাশ্রম-পার্টির প্যাক্ট কোথাও তো হিন্দুর সংজ্ঞা দেওয়া নাই। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরিতে গিয়া Cyclopaedia of Religion and Ethics দেখিতে হইবে।

'Your Religion Insulted, Hindu Religion Insulted'—বুকের ভিতর হিন্দুরক্ত টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল, ইচ্ছা হইল, টুঁটি ছিঁড়িয়া ফেলি, ভীমের মত দুঃশাসনের বক্ষরক্ত পান করি, কিন্তু কাহার রক্ত পান করিব? কে insult করিল? তবু ইন্সল্ট করিয়াছে, হিন্দুধর্ম অপমানজর্জরিত হইয়াছে, ছাপার অক্ষরে কখনও কি মিথ্যা কথা লেখে? হেদুয়ার নিকটবর্তী হইয়া সন্দেহ-নিরসনের জন্য কলিযুগের কাগজরূপী যুধিষ্ঠির শ্রীশ্রীফরোয়ার্ড একখণ্ড ক্রয় করিয়া তাঁহারই মুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিলাম, আমাদের সুবু বোস, লোটুলাল বাঁড়ুজ্জে, পাঁচুঠাকুর সকলেই এই অপমানের কথার উল্লেখ করিয়াছেন,—নিপাত যাউক, নিপাত যাউক।

নিদারুণ উত্তেজনায় তন্দ্রা আসিল, টিকিট কিনিতে ভুলিয়া গেলাম। আশেপাশের বাড়িঘর দোকানপাট লোকজন গাড়িঘোড়া কিছুই আর প্রত্যক্ষ হইল না। শুধু অসীম শূন্যের ডাইনে এবং বামে সবুজ এবং লাল আগুনশিখার মত 'Hindu Religion Insulted' এই বার্তা নিঃশব্দে ধ্বনিত হইতে লাগিল।

তন্দ্রা গাঢ়তর হইতেই এই দৃশ্যও আর দেখিলাম না। কিন্তু Relativity-র এক অদ্ভুত খেল দেখিয়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিলাম। চন্দ্র-হাউস হইতে রায়-মঠের দূরত্ব কতটুকুই বা! কিন্তু এইটুকুর

ভিতরেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি,—ইলাবৃত বর্ষে আর্যদিগের আগমনকাল হইতে রামের বনগমন, তারার বিবাহ হইতে মন্দোদরীর বিবাহ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা হইতে শূদ্রকবধ, শূদ্রকবধ হইতে অষ্টাবক্রের জন্ম, অষ্টাবক্রের জন্ম হইতে বেদব্যাসের জন্ম, বেদব্যাসের জন্ম হইতে ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম, ধৃতরাষ্ট্রের জন্ম হইতে কর্ণের জন্ম; কর্ণের জন্ম হইতে দ্রৌপদীর বিবাহ, দ্রৌপদীর বিবাহ হইতে যদুবংশীয় নারীহরণ, বৌদ্ধ শ্রমণদের ব্রহ্মচর্য, আলাউদ্দীন খিলিজী, আকবর বাদশাহ, কেরঙ্গরোগ, নীলকুঠি, সতীদাহ, সেণ্ট পলস্ কলেজে সরস্বতী-পূজা, বেঙ্গল টেক্‌নিক্যাল স্কুলের সরস্বতী-বিসর্জন, সুভাষিণী হরণ, শশিমোহন, বিধবাশ্রমের শুকদেব, ঢাকায় নজরুল ইসলামের লাঞ্ছনা,—মায় একেবারে সুনীল বোস ও প্রভু গুহ ঠাকুরতার দারপরিগ্রহ পর্যন্ত অনেক কিছুই মাথার মধ্যে খেলিয়া গেল। সেই অল্প কয়েক মুহূর্তের তন্দ্রার ঘোরে দেখিলাম, শূকর-গো-খাদক আর্য-ঋষিরা হিন্দুধর্মের গোড়াপত্তন করিতেছেন, 'ক'-এর স্ত্রীতে 'খ' উপগত হইতেছেন, বউদিদির দেহ দেবর দাবি করিতেছেন, বিবাহ-সংস্কার, বিচার-আচারের চিহ্নমাত্র নাই, ছলে-বলে-কৌশলে অনার্য দ্রাবিড়দিগের মঠ-মন্দির, জমি-জায়গা, স্ত্রী-কন্যা আর্যেরা হস্তগত করিতেছেন, পঞ্চনদীর তীরে হিন্দুর শাস্ত্র গড়িয়া উঠিতেছে, সরস্বতী নামধেয়া অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ভোগ্যা ও সহকারিণী এক সাধারণ ধাত্রী ইন্দ্রের নজরে পড়িয়া তাঁহাকেই দেহদান করিতেছেন, এবং ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র-বৃহৎ বহু দেবতার উপভোগ্যা হইয়া কৌশলে বাগ্‌দেবী বীণাপাণি সরস্বতী আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া ভবিষ্যৎযুগের পূজার ব্যবস্থা করিয়া লইতেছেন। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের যুগে দেখিলাম, শূদ্রের প্রতি ব্রাহ্মণের অকথ্য অত্যাচার, গুহকচণ্ডালকে যে রামচন্দ্র কোল দিয়াছিলেন তিনিই তপস্যানিরত শূদ্রকের শিরশ্ছেদনরত, রাজা ও রাজপুত্রেরা

অসংখ্য পত্নী-উপপত্নী ও সেবাদাসী-পরিবৃত হইয়া দেহধর্মের চর্চা করিতেছেন, কাহার সন্তান কে, নির্ণয় করিবার উপায় নাই। দেখিলাম, বৌদ্ধযুগের শ্রমণগণ দেহধর্মকে নিগ্রহ করিতে গিয়া শ্রেষ্ঠীদের বিলাস-কল্পনাকেও পরাভূত করিতেছে, উচ্চ-নীচে, ব্রাহ্মণে-শূদ্রে নিবিড় রক্তের সম্পর্ক ঘটিতেছে, নারীর সতীত্ব নাই, পুরুষের ব্রহ্মচর্য বা সংযম উপহাসের বিষয় হইয়া পড়িয়াছে; ঈশ্বর নাই, পরলোক নাই, আত্মসুখ ও দেহধর্ম প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। দেখিতে দেখিতে শক-হূন-মঙ্গোল-মগের রক্তের সহিত হিন্দুর রক্ত মিশিল, সহজ-সাধকগণ সমস্ত দেশে যে সহজধর্মের বান ডাকাইলেন তাহাতে রক্তের শুচিতা, ধর্মের শুচিতা বলিয়া কিছু রহিল না; সহজ-যানের প্রভাবে হিন্দুর আচার-ব্যবহার, সাধারণ জীবনযাত্রা পর্যন্ত পরিবর্তিত হইয়া গেল। তাহার পর মুসলমান আসিল, কয়েক সহস্র মাত্র ভিন্নদেশীয় ইসলামধর্মীর দ্বারা ভারতবর্ষের বুকে অসংখ্য মুসলমানের উদ্ভব হইল; হিন্দুর ধর্ম, বংশ ও রক্তগৌরব স্রোতের মুখে তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া গেল। ভারতের হিন্দুনারী স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় মুসলমানের অঙ্কশায়িনী হইল; ভারতের হিন্দুপুরুষ পবিত্র ধর্মের মাহাত্ম্য ভুলিয়া স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় কলমা পড়িল। হিন্দুর শুচিতা বাড়িল, পবিত্রতার জয়জয়কার হইল; নারীর মুখে অবগুণ্ঠন, গৃহ-বাতায়নে আবরণ পড়িল। দেখিলাম, হিন্দুর মঠে-মন্দিরে মুসলমানের অর্ধচন্দ্র-শোভিত পতাকা উড়িতেছে, হিন্দুর দেবদেবীমূর্তি মুসলমান মন্দিরের সোপানে পরিণত হইয়াছে। মূর্তিসমূহের নাসিকা কর্তিত হইতে লাগিল, হস্তপদভগ্নাবস্থায় তাহারা মৃত্তিকাগহ্বরে আত্মগোপন করিয়া লজ্জা নিবারণ করিল। দেখিলাম, হিন্দু পালকি চড়ে না, বাদ্য বাজায় না, মুসলমানধর্মকে সম্মান দেখাইবার জন্য নিয়মিত কর যোগায়। সতীরা স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় স্বামী ও উপপতির চিতায় দগ্ধ হইতে লাগিলেন,

জননীরা নদীনীরে সন্তান বিসর্জন দিতে ইতস্তত করিল না, আর্যের ভক্ষ্য গোজাতি জননী বসুন্ধরার প্রতীক হইয়া পূজা পাইল, গোবর ও গোময় পতিতের শুচিতা ফিরাইয়া আনিল। ব্রাহ্মণ পুরোহিত নির্বোধ যজমানের বিবাহের পর গুরু-প্রসাদীর নামে তাহার সদ্যবিবাহিত স্ত্রীতে উপগত হইবার জন্য শাস্ত্রের বিধান সংগ্রহ বা বিধিবদ্ধ করিতে লাগিলেন। মন্দির ও মঠে মোহান্ত মহারাজেরা ধর্মসাধননিরতা ধর্মভীরু হিন্দুনারীদের ছলে বলে কৌশলে শ্রীকৃষ্ণের অবতাররূপে আপনাদের প্রচার করিয়া অথবা তাহাদের সহিত ওই সকল নারীদের দেহ-সম্বন্ধ ঘটিলে তাহারা অচিরাৎ স্বর্গলাভ করিবে এই প্রলোভন দেখাইয়া, তাহাদের সর্বনাশ করিতে লাগিলেন। বল্লাল সেনের প্রবর্তিত কুলীন, অন্ত্যজ, জলচল, নমশূদ্র ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত হওয়ায় বঙ্গ-সমাজের দুর্বলতা ও দুর্গতি ঘটিতে লাগিল, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন হওয়াতে বঙ্গের জনগণের উন্নতির পথে প্রচণ্ড অন্তরায় উপস্থিত হইল, মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কালীপূজার নামে মানুষ ও মহিষবলির রক্তে সমস্ত দেশ প্লাবিত হইল, কৌলীন্য-প্রথার জন্য অকথ্য কারণে বাংলার কুলীন ব্রাহ্মণের বংশবৃদ্ধি হইল, কুলীনকুমারীর গর্ভাধান ও তাহার প্রতিকার-বিধানের পাপে সমাজ কলুষিত হইতে লাগিল। ভদ্রবংশীয় মাতাপিতা আপনার কন্যাসন্তানকে মন্দিরের দেবদাসী নিযুক্ত করিয়া সাধারণের ভোগ্যা করিতে লাগিল। বামাচারী তান্ত্রিকেরা পঞ্চ-মকার সাধনের নামে বীভৎস কাণ্ড শুরু করিল; দাক্ষিণাত্যে এবং আর্যাবর্তেরও বহু স্থলে দেশের মানুষ দেশের মানুষের কাছে ঘৃণ্য হেয় অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হইল, নীচজাতীয়দের ছায়াস্পর্শেও উচ্চজাতি পতিত হইতে লাগিল। তারপর আবার বিলাস-ব্যসনের এক প্রবল বন্যা আসিয়া ভারতবর্ষকে ভাসাইয়া দিল। হিন্দু-মুসলমানের রক্ত, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, ভাষা, সংস্কার একাকার হইয়া গেল। ইংরেজ আসিল, কয়েক শত বিদেশীর চরণতলে ভারতের হিন্দু-মুসলমান একত্রে করজোড়ে দণ্ডায়মান হইল, ভারতের পবিত্র রক্তের সহিত ম্লেচ্ছের অপবিত্র রক্ত মিশিয়া গেল, দেবভাষা যাবনীমিশাল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। নীলকর সাহেবেরা ভারতবর্ষের দরিদ্র কৃষক-নারীদের উপর বীভৎস অত্যাচার করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে একেবারে বর্তমান কালে আসিয়া পড়িলাম। দেখিলাম, বেশ্যা লইয়া হিন্দুবাবুদের বাগানবিলাস,—কাশী পুরী নবদ্বীপ কালীঘাটে ধর্মের নামে বীভৎস ব্যভিচার, পূজা-পার্বণের নামে মদ ও বারনারী লইয়া নির্লজ্জ উন্মত্ততা। দেখিলাম, মুসলমান ও হিন্দু বহু প্রতাপশালী ব্যক্তির নিকট নির্বিবাদে নিরীহ হিন্দু প্রজারা স্ত্রী-কন্যা-ভগিনীকে প্রেরণ করিতেছে; পিতা ভ্রাতা পাড়াপ্রতিবেশীর চোখের সম্মুখে নিরীহ নারীকে পিশাচেরা উপভোগ করিতেছে। সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দেশের কাজে যাহারা আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহাদের জঘন্য চরিত্রের পরিচয় পাইলাম; দেশের দরিদ্রের নিকট হইতে গৃহীত চাঁদার সাহায্যে ঘৃণিত বারপল্লীতে উৎসব জুড়িয়াছে—এ দৃশ্য যে কত দেখিলাম তাহার ইয়ত্তা নাই। দেখিলাম, নির্বোধ আত্মসর্বস্ব ব্যক্তিরা নিজেদের খেয়াল পরিতৃপ্ত করিবার জন্য দেশের লোকের ধনপ্রাণ লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে। শাশুড়ী পুত্রসহযোগে বধূর উপর অমানুষিক নির্যাতন করিতেছে; বহু স্থলে তাহাকে ঘৃণিত গণিকার জীবন যাপন করাইবার জন্য উৎপীড়ন চলিতেছে; সামাজিক পদস্খলনে ধনীদের কোনও প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না, কিন্তু দরিদ্রকে সর্বস্বান্ত—

রূঢ় ধাক্কা খাইয়া চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া দেখি যে, ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে আসিয়া পড়িয়াছি, ট্রামের কণ্ডাক্টার টিকিট চাহিতেছে। পকেট হইতে পয়সা বাহির করিতে গিয়া দেখি, মনিব্যাগটি কখন চুরি গিয়াছে। থতমত খাইয়া শুষ্কমুখে কণ্ডাক্টারের দিকে ফ্যালফ্যাল করিয়া চাহিয়া শাখা হইতে শুষ্ক পত্রের মত ট্রাম হইতে টুপ করিয়া নামিয়া পড়িলাম। সম্মুখের দেওয়ালে দৃষ্টি পড়িল, দেখিলাম—

Boycott City College
Hindu Leaders' Appeal
Impossible for Self-respecting Hindus to Join City College.

Orion বা কাল-পুরুষ

(একাঙ্ক যথার্থ নাটক—কথা-নাট্য বা নাটিকা নহে)

অবতরণিকা

এই নাটকটি আমার প্রথম প্রচেষ্টা নহে। আমি এই ধরনের নাটক অনেকগুলি লিখিয়াছি, কিন্তু প্রকাশ করি নাই—কতকগুলি বিশেষ কারণে। প্রথমত, এই ধরনের নাটক প্রকাশ করিবার সাহস কলিকাতায় কোনও সম্পাদকের নাই। বন্ধুবর মন্মথ রায় এম. এ. ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'বাসন্তিকা'র 'সেমিরিমিস্' নাটকের 'শেষের কথা'য় ঠিক এক কথাই লিখিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, আমার লিখিত কয়েকটি নাটক উক্ত বন্ধুবর মন্মথ রায় এম. এ. রচিত, 'সবুজপত্র' ও 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত, 'কালরাত্রি', 'লক্ষহীরা' প্রভৃতি কয়েকটি নাটকের সহিত ভাব, ভাষা এমন কি প্লট ও ড্যাশে হুবহু মিলিয়া যাওয়াতে প্রতিভা-সম্পন্ন লোকের চিন্তাধারার সমতা লক্ষ্য করিয়া চমৎকৃত হইয়াছি ও চৌর্যাপবাদ-ভয়ে আমার লেখাগুলি প্রকাশ করি নাই। ইহাতে আমি দুঃখিত নহি। আমি কাল্‌চারের উপাসক। আমার নাম না হয় নাই হইল, কিন্তু আইডিয়াগুলি 'সবুজপত্র' ও 'ভারতবর্ষে'র পৃষ্ঠায় রক্ষিত হইয়া দিকে দিকে ছড়াইয়া পড়িবে তো! তাহাতেই আমার তৃপ্তি। আমরা নূতন যুগের প্রবর্তন করিতে চাই। পুরাতনের দিন চলিয়া গিয়াছে, ক্রিমিনলজি ও সাইকো-অ্যানালিসিসের শুষ্ক পাতায় যৌন-সম্বন্ধীয় আধুনিক থিওরিগুলি নষ্ট হইতে বসিয়াছে। আমরা সরস নাটকে তাহাদিগকে সজীবভাবে জগতের সম্মুখে ধরিতে চাই। কে এই কার্য করিতেছে, তাহার বিচারের প্রয়োজন নাই।

এই ধরনের লেখাগুলিকে অনেকে ভুল করিয়া কথানাট্য বা নাটিকা আখ্যা দিয়া থাকেন। কিন্তু প্রবীণ সাহিত্যিক সুরসিক শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় এগুলিকে 'যথার্থ নাটক' নাম দিয়াছেন; এই নামে এগুলিকে অভিহিত করা সমীচীন মনে করি।

বন্ধুবর মন্মথ রায় এম. এ. ও আমি সমসাময়িক। কে কাহার পথপ্রদর্শক, পরবর্তীয়েরা তাহার বিচার করিবে। আসলে শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় ও ঢাকা-প্রবাসের পর চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের উভয়েরই গুরু এবং কলিকাতার 'কল্লোল'-সম্প্রদায় আমাদের পৃষ্ঠপোষক। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের 'শুভা' 'পাপের ছাপ' 'শাস্তি' 'ব্যবধান' 'দত্তগৃহিণী' প্রভৃতি পুস্তক ও শ্রীযুক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের 'নষ্টচন্দ্র' 'হাইফেন' কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির কর্তৃক প্রকাশিত ফোটোচিত্র-সম্বলিত 'রূপের ফাঁদ' প্রভৃতি পুস্তকগুলির ভিতর দিয়া আমাদের সুপ্ত প্রতিভার উন্মেষ হইয়াছে ও 'কল্লোলে'র নব নব রূপ আমাদিগকে নব নব ভাবের আহার্য যোগাইয়াছে। ইহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার না করিলে পাপ হইবে।

মানব যন্ত্রবিশেষ মাত্র নহে; যন্ত্র দিয়া তৈলরূপ আহার্য যোগাইয়া দিলেই কল নির্বিবাদে চলিতে পারে, কিন্তু মানুষের হৃদয় বলিয়া আর একটি সূক্ষ্ম জগৎ আছে। সেখানে সে রচনা করে; সে গ্রহণ করে, সে বিলাইয়া দেয়। সে ভালবাসে, সে আঁকড়িয়া ধরিতে চায়—সে বাঁচিতে চায়, সে নিঃশেষে মরিতে চায় না। সে ডোবে, সে ওঠে, সে কাঁদে, সে কাঁদায়, সেখানে সে চিরবুভুক্ষু; আর একটি বা একাধিক হৃদয়জগৎকে সে গ্রাস করিতে চায় এবং একাধিক দেহকে সে ভোগ করিতে চায়। কিন্তু সে তাহা পারে না, সমাজ ও শাস্ত্র, লোকাচার ও লোকলজ্জা গণ্ডির উঁচা করিয়া বসিয়া আছে। হৃদয়কে পীড়া দেওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য।

কখনও কখনও এই সঙ্কীর্ণ গণ্ডি ভাঙিয়া ফেলিয়া মানব-হৃদয় মহাসাগরের কল্লোল শুনিতে পায়—আমরা সেই শুভক্ষণের প্রতীক্ষায় বসিয়া আছি। আমরা এই যথার্থ নাটকে সেই গণ্ডি ভাঙিবার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করি। এইগুলিতেই মানবের যথার্থ পরিচয়, সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনে নয়।

বর্তমান নাটকটির সহিত শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেন গুপ্ত মহাশয়, চারু বন্দ্যো মহাশয়, বন্ধুবর মন্মথ রায় এম.এ. মহাশয়, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত মহাশয় ও 'কল্লোল' দলের শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুনীতি দেবী, যুবনাশ্ব ও বুদ্ধদেব বসু প্রভৃতির ভাব-সংক্রান্ত যোগ আছে। তাঁহাদের লেখা দ্বারা নাটকটি উদ্বোধিত।

এই নাটকের কোনও প্লট নাই, বস্তুত, এই ধরনের নাটক প্লটের অপেক্ষাও রাখে না। কথার পর কথা আসিয়া জোটে—ইতিহাস আপনি রচিত হয়। কে কোন্ কথা বলিল, ইহাও নির্দেশ করিয়া দিবার প্রয়োজন নাই। নাটকটি সম্পূর্ণ লেখা হইলে ইহার আখ্যানভাগ ও পাত্রপাত্রী নির্দেশ করা যাইতে পারে, তাহার পূর্বে কে আসিবে, কি ঘটিবে অন্তর্যামীই বলিতে পারেন। লেখকের অন্তরের ভাব-নীহারিকা প্রবলবেগে ঘূর্ণ্যমান। এই ঘূর্ণ্যাবেগে ধূম্ররূপী ভাব জমাট বাঁধিয়া আকার পরিগ্রহ করিবে, রূপ ঠেলিয়া উঠিবে। এই নাটকের নামটি এই ভাবটিই সূচিত করে; বিজ্ঞানবিদ্‌গণ জানেন যে, Orion বা কাল-পুরুষ নক্ষত্রপুঞ্জের অভ্যন্তরে নীহারিকাপুঞ্জ ঘূর্ণ্যমান অবস্থায় ঘনীভূত হইয়া রূপ ধরিবার চেষ্টায় আছে। বস্তুত, নাটকের নামের সহিত নাটকের ঘটনার যোগ না থাকাই বাঞ্ছনীয়; শিশু-সন্তানের মধ্যে কোনও বিশেষ পরিণতি লক্ষ্য করিবার পূর্বে তাহার নামকরণ করা হয়। বীরেন্দ্র দ্বিজেন্দ্র চারুশীলা নাম দেওয়া হয় এমন অবস্থায় ও বয়সে, যখন বীরত্ব দ্বিজত্ব বা চারুত্বের কিছুমাত্র শিশুর মধ্যে পরিলক্ষিত

হয় না। এই নামগুলিতে জনক-জননীর আকাঙ্ক্ষার সূচিত করে; টিরের কাপুরুষতায়, ভিজের দুরাশয় ও চাঞ্চল্য বংশগোলাদি ভুমীর্য হইয়াছে দেখিয়াছি। এ ক্ষেত্রেও নাটকের নামকরণে আমার মনের অবস্থা ব্যক্ত নির্দেশ করিতেছি; নাটকোল্লিখিত ঘটনা কি হইবে, তাহা নাটক শেষ হইলে বুঝিতে পারিব।

ডট (......) ও ড্যাশ (—) দিয়া লিখিলে ভাবগুলি ছন্দোবদ্ধ হয়, জোর পায়। সেইজন্ত আমরা ডট ও ড্যাশের প্রবর্তন করিয়াছি। তবে পাঠকের টেম্পারামেন্ট অনুযায়ী ডট-ড্যাশের প্রয়োগের বিভিন্নতা হওয়া আবশ্যক। আমরা এখানে অনেকগুলি ডট ও ড্যাশ দিয়া রাখিলাম। পাঠকেরা অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রয়োজনানুযায়ী ডট ও ড্যাশ দিয়া পড়িবেন—নতুবা নাটকের সৌন্দর্য্যহানি ঘটিবে। বিশেষ নির্দিষ্ট স্থলে নাটকের মধ্যেই ডট ও ড্যাশের প্রয়োগ করিয়াছি।

... ...

— — — — — — —

প্রথম দৃশ্য

[পদ্মাবক্ষে ওমেগা ষ্টীমার, বর্ষাকাল, সায়ংসন্ধ্যা। দৃশ্যাভাস—উত্তাল তরঙ্গময়ী স্রোতস্বতী; কূলে কূলে পরিপ্লাবিত; যতদূর দৃষ্টি যায় সীমাহীন অনন্ত জলরাশি তরঙ্গভঙ্গে অস্তগামী সূর্য্যকিরণে রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। পশ্চিমে বহুদূরে আকাশ জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, তপ্ত তাম্রবর্ণ বৃহদাকার সন্ধ্যাসূর্য্য অর্দ্ধজলমগ্ন—স্বর্ণসূর্য্য যেন প্রবল উত্তাপে বিগলিত হইয়া তরলাকার ধারণ করিয়াছে। নাম-না-জানা পাখিরা সার বাঁধিয়া দূরদিগন্তে উড়িয়া চলিয়াছে।

ষ্টীমার নদীর এক ধার দিয়া চলিতেছিল, পাড় দেখিয়া মনে হয়, যেন মৃত্তিকা এককালীন খসিয়া গিয়া পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে; স্থানে স্থানে তখনও মৃত্তিকা-চাপ প্রবলশব্দে খসিয়া পড়িয়া নিয়ে অন্ধকার জলবক্ষে আবর্ত্তের সৃষ্টি করিতেছিল। তীরে বহুদূরব্যাপী ঝাউবন; গাছগুলি অনতিদীর্ঘ কিন্তু ঘনসন্নিবিষ্ট। খাড়া পাড়ের গায়ে গায়ে গাছের শিকড় আর জলচর পাখির নীড়।

নদীর সে পাড়ে কোনও ঘাট ছিল না, আশেপাশে জনমানবের চিহ্ন পর্যন্ত নাই; শুধু মাঝে মাঝে দীর্ঘশির তালীবন ও শিবমন্দির-চূড়ার ত্রিশূলগুলি দৃষ্টিপথে পড়িয়া লোকালয়ের পরিচয় দিতেছিল।

নদীবক্ষে অসংখ্য নৌকাবিন্দু; দাঁড় ফেলার ছপছপ শব্দ বা মাঝি-মাল্লার ঐক্যতান ভাটিয়াল সঙ্গীত সন্ধ্যাকাশের শান্তিকে চকিত করিয়া তুলিতেছিল।

একটি বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ ভয়ঙ্করী পক্ষিণীর মত ষ্টীমারখানি ধীর মন্থর গতিতে নদীজলকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া চলিতেছিল। সেই বিপুল যন্ত্রের জীবিত ও জড় অঙ্গগুলি হইতে বিচিত্র স্বরতরঙ্গ উত্থিত হইয়া মনকে পীড়িত করিতেছিল। জাহাজে সারেঙ্গ খালাসী ও নানা দরের ও স্তরের আরোহী আপন আপন খেয়ালমত সময়ক্ষেপ করিতেছিল; জাহাজের চাকায় জল কাটিবার একটা একটানা শব্দ এই বিচিত্র স্বরলহরীর পট-ভূমির মত কাজ করিতেছিল।

ফার্স্ট ক্লাস কেবিনের সম্মুখে পিত্তলদণ্ড-ঘেরা ডেকে মাত্র তিনজন আরোহী। দুইজন পাশাপাশি দুইটি ডেক-চেয়ারে মুখামুখি বসিয়া। তন্মধ্যে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক। দূরে রেলিঙের উপর ঝুঁকিয়া একটি ভদ্রলোক নিয়ে নদীবক্ষে ফেনপুঞ্জ নিরীক্ষণ করিতেছিলেন ও হস্তস্থিত প্রজ্জ্বলন্ত সিগারেটে ধূম্রপুঞ্জের সৃষ্টি করিতেছিলেন। মাঝে

মাঝে তিনি স্মিতহাস্তে কথোপকথননিরত ভদ্রলোক ও মহিলাটির দিকে কটাক্ষ করিতেছিলেন—মহিলাটির দিকে বিশেষ করিয়া।]

সুষমা!

মনীশ, কেন, এই নিয়ে সাতবার আমায় ডাকলে? তোমার আজ কি হয়েছে? [অদূরস্থিত ভদ্রলোকটির দিকে কটাক্ষ করিলেন; ভদ্রলোকটি নড়িয়া চড়িয়া অর্ধদগ্ধ চুরুটটি তাক করিয়া নীচে ফেলিলেন, এবং দক্ষিণ করতলের উল্টাদিক ওষ্ঠে সংযুক্ত করিয়া চুম্বনের অভিনয় করিলেন। মহিলাটির চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।]

[আবেগে মহিলাটির হস্ত ধরিয়া] তুমি জান না সুষমা, আমি এমনিই তোমায় ডাকি। 'শিশু যেমন মাকে নামের নেশায় ডাকে।' তোমার চোখে ও কি দৃষ্টি সুষী! আমি আর সইতে পারছি না। মোহমুগ্ধ পশুকে বশ করবার জন্মে নতুন ক'রে জাল পাতা কেন, সুষী?

কি সুন্দর সন্ধ্যা! আমি একটা গান গাই।···না থাক্, এখুনি ভিড় জ'মে যাবে। কিন্তু আশ্চর্য ওই ভদ্রলোকটি; আজ সাত দিন আমরা একসঙ্গে পাড়ি দিয়েছি, আমাদের সঙ্গে একটি বার যেচে কথা কইলেন না, খালি পালিয়ে বেড়াচ্ছেন; দেখ দেখ, জলের দিকে কেমন চেয়ে আছেন, যেন জলে না নেমেই জল থেকে রত্ন সংগ্রহ করবেন। ওঁকে চেন নাকি?

না, কখনও দেখি নি। সুটকেশের ওপর লেখা আছে Dr. N. C. Roy। মরুক গে, তুমি গান গাও।

উনি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে গান গাইতে লজ্জা হচ্ছে; তুমি যাও না, ওঁর সঙ্গে গল্প করতে করতে ওঁকে কেবিনের ও-পাশটায় নিয়ে যাও, আমি গান গাইছি।

[মনীশ বিরক্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইতেই সুষমা বলিল]

বহু, আজ কষ্টে,···বল, যাইছি।

[মনীশের মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে সুষমার বাঁ হাতখানি আবেগে তুলিয়া ধরিয়া একটি নিবিড় চুম্বন তাহাতে অঙ্কিত করিয়া দিল। সুষমার মুখে একটা বিরক্তিপূর্ণ হাসি; রেলিঙের ধারের ভদ্রলোকটি সুষমার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিলেন। সুষমা দক্ষিণ হস্ত দ্বারা ললাট স্পর্শ করিল।]

সুষী, তোমার কষ্ট হবে, আমি যাচ্ছি, ওই ভদ্রলোকটিকে সরিয়ে নিয়ে যাই। তুমি কিন্তু সেই গানটা গাইবে, 'রাখো মিনতি রাখো'।

[সুষমা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল; মনীশ ততক্ষণ ভদ্রলোকটির কাছে গিয়া তাঁহার সহিত আলাপ শুরু করিয়া দিল ও ধীরে ধীরে গল্প করিতে করিতে কেবিনের পশ্চাতে অদৃশ্য হইয়া গেল।]

[সুষমা গাহিতে লাগিল]

রাখো মিনতি রাখো—
মম সুন্দর যৌবন যেয়ো না—যেয়ো না-কো—
মিনতি রাখো।
আজো কুঞ্জবীথিকা ছাওয়া ঝরা-ফুলে,
ঘোরে উন্মন পথিক মনের ভুলে;
আজো লালসাভরে—কচি কোরক মরে,
বলে মধুপ চরণ চুমি, 'থাকো থাকো।'—
মিনতি রাখো।

মিলন নিশিভোর
রেখো না শোকে;

মোহ-অঞ্জন ঘোর
লাগাও চোখে।
আজো ব্যাকুল ঢালিতে সুধা পরাণ-বঁধু
যেয়ো না আছে বাকি অনেক মধু।
রয়েছে মনের ভুল—না হয় ঝরেছে ফুল,
ধরণী-শয়নে তায় ধুলায় ঢাকো—
মিনতি রাখো।

[গান শেষ হইলে সুষমা শূন্য দৃষ্টিতে অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। মনীশ একলা আসিয়া চেয়ারে বসিল।]

সুষী!

কেন?

কি ভাবছ?

ভাবছি···থাক্।

[সুষমার আলুলায়িত চুলগুলি হাতের মুঠায় ধরিয়া] বল, বল সুষী।

ভাবছি, তুমি আমায় কতখানি ভালবাস—

আজ হঠাৎ এ কথা কেন সুষী? তোমার জন্যে জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা হেলায় ভাসিয়ে দিয়ে এক দুস্তর অজানা সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছি ওই আকাশের মত নিবিড় অন্ধকারে,—ধ্রুবতারার মত তুমি আমায় চালিয়ে নিয়ে চলেছ কোথায়! আজ এ কথা কেন সুষী?

আমি ভাবছি, তুমি আর কাউকে কখনও ভালবেসেছ কি না। সত্যি ব'লো, আমায় ফাঁকি দিয়ো না।

থাক্ সুষী, যা অন্ধকার কালসমুদ্রে মিলিয়ে গেছে, তাকে অন্ধকারেই

থাকতে দাও, সে বীভৎস নগ্নতাকে তোমার সামনে টেনে আনলে তুমি সইতে পারবে না।

খুব পারব। আমাকে কি এত দুর্বল মনে কর ? মনে রেখো, আমি তোমার জীবনসঙ্গিনী।

[কিছুক্ষণ দুজনে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। হঠাৎ মনীশ বলিয়া উঠিল]

তবে শোন···কিন্তু না শুনলেই ভাল করতে। আমার আর একটু কাছে স'রে এস। তোমার সান্নিধ্য আমায় অনুভব করতে দাও। উঃ, কি নিবিড় অন্ধকার!

[সুষমা চেয়ারটি টানিয়া লইয়া মনীশের বাম হাঁটুর উপর দুই হাত রাখিয়া বসিয়া রহিল]

[মনীশ তাহার কৈশোর-জীবনের ইতিহাস বলিতে লাগিল। ম্যাট্রিকুলেশন পাস করিয়া ঢাকা হইতে তাহার কলিকাতায় পড়িতে আসা; বালিগঞ্জে পিতৃবন্ধু এক ব্যারিস্টারের বাড়িতে থাকা। সেই বাড়ির ত্রয়োদশ হইতে তেত্রিশ বর্ষ বয়স্কা তেইশজন মেয়ের সহিত পরিচয়। প্রত্যেকের সহিত নিবিড় প্রেমের বাঁধনে বাঁধা পড়া—লালসা ও বিলাসের মনোরম খেলা। তারপর রজনীযোগে অন্ধকার শয্যায় ইহাদের মধ্যে এক বা একাধিক জনের সহিত ঘনিষ্ঠ প্রেমের সম্পর্ক—তাহার বা তাহাদের পরিচয় না পাওয়া এবং দিনের আলোকে প্রত্যেককে সন্দেহ করা···সেই বিষম ক্ষুধিত শয্যার ইতিহাস এবং কোন গতিকে সেই লালসা-বিটপী হইতে বাহির হইয়া আসা।]

[মনীশ চুপ করিল, সুষমা ঘুমের ওজুহাত দেখাইয়া কেবিনের ভিতরে গেল; মনীশ নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে সেখানে ডেক-চেয়ারে ঘুমাইয়া পড়িল।]

[খানিক পরে সুষমা পা টিপিয়া কেবিনের বাহিরে আসিয়া দেখিল, মনীশ ঘুমাইতেছে ; সেই ভদ্রলোকটি অন্ধকার আকাশের দিকে চাহিয়া রেলিঙের ধারে দাঁড়াইয়া আছেন। সে তাঁহার নিকট গিয়া মৃদু হাসিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিল। দুইজনে হাত ধারাধরি করিয়া কেবিনের অপর পার্শ্বে গিয়া অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলিল। দৃষ্টি-বিনিময়ে প্রেম গজাইয়াছিল ; কথোপকথনে তাহা ঘনীভূত হইল। সুষমা ভদ্রলোকের কথাবার্তায় ও চমকপ্রদ জীবনের ইতিহাস শুনিয়া একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। মনীশের সহিত থাকিয়া বিরক্তিতে তাহার হৃদয় ভরিয়া গিয়াছিল ; অনেক কথাবার্তার পর দুইজনে এক পরামর্শ স্থির করিল। ভদ্রলোকটি কেবিনের পাশে গেলেন। সুষমা ব্যস্তসমস্তভাবে মনীশকে ঘুম হইতে তুলিয়া বলিল যে, তাহার হাতের আংটি রেলিঙের ধারে কোথায় পড়িয়া গিয়াছে। মনীশ রেলিঙের ধারে ঝুঁকিয়া আংটি খুঁজিতেছিল, এমন সময়ে সেই ভদ্রলোকটি হঠাৎ পশ্চাদ্দিক হইতে আসিয়া একটি গামছা দিয়া তাহার মুখ বাঁধিয়া ফেলিলেন ও তাহারা দুইজনে ধরাধরি করিয়া মনীশকে জলে ফেলিয়া দিল।

[অন্ধকার পদ্মাবক্ষে ঝুপ করিয়া একটি শব্দ হইল···সুষমা একবার শিহরিয়া উঠিয়া নীরেন্দ্রের বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বলিল]

···প্রিয়তম আমার!

[দেখিতেছি, প্রথম দৃশ্যটি 'কল্লোলে' প্রকাশিত শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু মহাশয়ের একটি গল্প "রজনী হ'ল উতলা" ও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের কোন এক উপন্যাসের ঘটনাবিশেষ লইয়া রূপ ধরিয়া উঠিয়াছে। দ্বিতীয় দৃশ্য কি হইবে এখনও বুঝিতে পারিতেছি না।]

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—মৈমনসিংহ জেল, সময়—দ্বিপ্রহর

[সুষমা ও নীরেন্দ্র মনীশের হত্যাপরাধে ধৃত হইয়া মৈমনসিংহ জেলে আবদ্ধ আছে; তাহাদের বিরুদ্ধে মকদ্দমা চলিতেছে। সুষমার অপূর্ব সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া ক্রিমিনলজির ছাত্র এম. এ. বি. এল. যুবক উকিল ইন্দ্রজিৎবাবু তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। তিনি প্রত্যহ একবার করিয়া সুষমার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। সুষমাও ছলাকলা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে আরও অভিভূত করিয়া দেয়। সুষমা ও নীরেন্দ্র বিভিন্ন গৃহে আবদ্ধ।]

[দৃশ্যাভাস—নির্জন কারাকক্ষে একাকী সুষমা। আলুলায়িতকুন্তলা, শ্লথবসনা। লৌহ গরাদের বাহিরে কনস্টেবল নসিরুদ্দিন শেখ বন্দুক হস্তে ঝিমাইতেছে। তাহার দাড়ি হাওয়ায় উড়িতেছে; মুখ ঈষৎ বিস্ফারিত; বিকট নাসিকাগর্জন হইতেছে।]

[সুষমা মিয়া সাহেবকে জাগাইবার জন্য গান ধরিল]

আমার মন যারে চায়
সে হায়, পিছন ফিরেছে,
মন ধরতে তারে ধায়—
সে দূরে চ'লে যায়—
মায়া-বাঁধন ছিঁড়েছে।
সে হায়, পিছন ফিরেছে।

হায় রে আমার রূপ, হায় রে দেহ মোর—
তুই ধরতে কারে চাস, হ'ল উধাও মন-চোর;
মনের মাঝখানে ঘনায় আঁধার ঘনঘোর,
থামল দখিন বায়;
তরী কোথায় ভিড়েছে!
সে হায়, পিছন ফিরেছে।

তুই বৃথাই হৃদয় উজাড় করি
চাইলি তারে রাখতে ধরি—
মজিয়ে গেল ডুবিয়ে গেল অথৈ পাথারে;
তুই বৃথাই হানিস কর তার বন্ধ দুয়ারে;
যারা রইল তোমায় চেয়ে তারা পথের দুধারে—
তাদের বিলাস কায়—
যারা তোমায় ঘিরেছে;
সে হায়, পিছন ফিরেছে।

[মিয়া সাহেব জাগিল। কেমন করিয়া নানা ভাবের আদিরসাশ্রিত কথাবার্তায় মিয়া সাহেবকে বিহ্বল করিয়া এবং পরিশেষে একটি চুম্বন পর্যন্ত দান করিয়া সুষমা সেই কারাগারের অপর কক্ষে আবদ্ধ নীরেন্দ্রের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিবার ব্যবস্থা করিল, তাহার বর্ণনাটি চমৎকার হইত; কিন্তু একান্ত স্থানাভাব, সংক্ষেপে সারিতে হইবে। নানা ভাবের ও ধরনের অনেকগুলি দৃশ্য আমার মনে জমাট বাঁধিয়া উঠিতেছে। কিন্তু পরিষ্কার নিখুঁত করিয়া কুঁদিয়া তুলিবার মত স্থান নাই, সুতরাং ঘূর্ণ্যমান নীহারিকাপুঞ্জকেই গ্রহ-উপগ্রহরূপে ফুটাইয়া তুলিবার পূর্বে কালি-কলমে

করিয়া দিতেছি, ইহাতে সাহিত্যের অপবিদের ক্ষতি হইতেছে সন্দেহ নাই; কিন্তু নাই-মামা অপেক্ষা কানা-মামার ভোটের স্বীকৃত হয়।

ইন্দ্রজিৎবাবু সুষমার সহিত দেখা করিতে আসিয়া সুষমার কোলে মাথা দিয়া নীরেন্দ্রকে শুইয়া থাকিতে দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইলেন। তাঁহার মন বলিল, এ born criminal, একে reclaim করার চেষ্টা বৃথা। কিন্তু হৃদয় হাল ছাড়িল না—তিনি অপেক্ষা করিবেন। অধঃপতনের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত সে তলাইয়া যাক—চরম অধঃপতনের পঙ্কেও যখন তাহার কূল মিলিবে না, তখনও তিনি হৃদয়খানি উন্মুক্ত করিয়া তাহাকে বলিবেন, এস এস, তোমার জন্য পথ চাহিয়া আছি। ইহা অপেক্ষা অধম criminal-এর সুবুদ্ধি হওয়ার কথা তিনি পড়িয়াছেন। অবশ্য instinct মাঝে মাঝে মাথা খাড়া করিয়া উঠে বটে।

ইন্দ্রজিৎবাবু সুষমা ও নীরেন্দ্রকে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া এ মকদ্দমায় একটা কূল পাইলেন।

মিয়া সাহেব আসিয়া নীরেন্দ্রকে তাহার নিজের ঘরে লইয়া গেল। সুষমা ইন্দ্রজিতের দিকে সপ্রেম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বুকের বসন একটু দৃঢ় করিয়া আঁটিল, ইন্দ্রজিৎবাবু মজিলেন, আত্মপর বিস্মৃত হইয়া ডাকিলেন]

সুষমা!

কেন বাবু?

তুমি নিশ্চয় ছাড়া পাবে বুঝতে পারছি, কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে কি করবে মনে করছ?

আপনার বাড়িতে কি একটু ঠাঁই দেবেন না?

কিন্তু সুষমা, আমি যে এই মাত্র দেখলুম, তুমি নীরেন্দ্রের সঙ্গে…

ছি ছি! ও কিছু না…ওকে ভুলিয়ে এই মকদ্দমার কথা বের ক'রে নিচ্ছিলুম…নইলে ও আমার কেউ নয়।

লজ্জা ?

লজ্জা, লজ্জা, লজ্জা !

[সুষমা ইন্দ্রজিৎবাবুর বুকে মাথা লুকাইল, ইন্দ্রজিৎবাবু সস্নেহে তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিলেন। মিয়া সাহেব হাঁকিল]

সোওয়া ঘণ্টা হো গিয়া, বাবুসাব।

[দ্বিতীয় দৃশ্যটি পাঁচকড়ি দে প্রণীত একটি চমকপ্রদ ডিটেক্‌টিভ উপন্যাসের এক অধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের 'পাপের ছাপ' নামক উপন্যাসের কোনও ঘটনা লইয়া রূপ পরিগ্রহ করিতে চাহিতেছিল, কিন্তু স্থানাভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারিল না। দেখা যাক, তৃতীয় দৃশ্য আমাকে কোন্ দিকে লইয়া যায়।]

তৃতীয় দৃশ্য

ময়মনসিংহ—ইন্দ্রজিতের বাড়ির বৈঠকখানা। প্রাতঃকাল

[দৃশ্যটি অতি সংক্ষেপে সারিতে হইবে। সুষমা ও নীরেন্দ্র ছাড়া পাইয়াছে। সুষমার সঙ্গলোভে ইন্দ্রজিৎবাবু তাহাকে নিজের বাটিতে স্থান দিয়াছেন। নীরেন্দ্রকে আশ্রয় না দিলে সুষমা থাকিবে না, সুতরাং ইন্দ্রজিৎবাবুর বৈঠকখানা-ঘরে সেও অধিষ্ঠিত হইয়াছে। ইন্দ্রজিৎবাবুর বিধবা ভগিনী মনোরমার সহিত নীরেন্দ্রের গভীর প্রেম হইয়াছে। মনোরমার পুত্র খোকা এবার আই. এস-সি. পরীক্ষা দিয়াছে; কন্যা খুকী শ্বশুরালয়ে আছে। সুষমা অন্দরে নিদ্রামগ্ন; ইন্দ্রজিৎবাবু বাহিরে গিয়াছেন। নীরেন্দ্র ঈজি-চেয়ারে বসিয়া খবরের কাগজ পড়িতেছিল। মনোরমা চা ও খাবার হাতে বৈঠকখানায় প্রবেশ

করিয়া অন্যমনস্ক নীরেন্দ্রের কপোলে একটি চুমা খাইয়া চা ও খাবার সম্মুখের টেবিলে রাখিয়া নীরেন্দ্রের কোলে বসিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া নানা প্রেমের ও ভবিষ্যতে তাহাদের বিবাহের ও বিবাহিত জীবনের কথাবার্তা বলিতে লাগিল। মনোরমা একবার নীরেন্দ্রকে আবেগে জড়াইয়া ধরিতে গেল, ঈজি-চেয়ারখানি ভাঙিয়া দুইজনেই ভূমিসাৎ হইল। নীরেন্দ্রের হস্তস্থিত পেয়ালার গরম চা মনোরমার সর্বাঙ্গে গড়াইয়া পড়িল, মনোরমা 'উঃ' বলিয়া উঠিল। এমন সময় খোকা ঘরে ঢুকিয়াই মায়ের এই অবস্থা দেখিয়া 'মা মা' বলিয়া কাছে ছুটিয়া আসিয়াই আনুপূর্বিক ঘটনাটি সন্দেহ করিয়া লজ্জায় অধোবদন হইল। মনোরমা ও নীরেন্দ্র দুইজনেই উঠিয়া দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। খোকা সরোষে সজল নয়নে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মনোরমা বলিল]

ওগো, খোকা কি মনে করছে, ছি ছি, আমার মরণ ভাল।

মনো, ছি, এ কথা কেন? তোমার খোকা কি আমার খোকা নয়। ওই তো আমার ভবিষ্যৎ বংশধর। ওকে ডাক, আমি ঠাণ্ডা করছি।

[আবেগ-কম্পিত স্বরে মনোরমা ডাকিল]

খোকা, শুনে যা।

[খোকা আসিল। নতমস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।]

[নীরেন্দ্র খোকার কাছে গিয়া নানা কথাবার্তায় তাহাকে ভুলাইতে লাগিল। দেশী ও বিদেশী নানা যুক্তি দিয়া বিধবা-বিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে উপদেশ দিয়া তাহাকে নরম করিয়া আনিয়া বলিল]

তোমার মাকে আমি বিয়ে করছি খোকা, আমার পুত্রের স্থান শূন্য ছিল, তুমি কি তা পূরণ করবে না?

[খোকা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর সহসা নীরেন্দ্রের পদধূলি লইয়া ডাকিল]

বাবা !

[নীরেন্দ্র তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। মনোরমা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া পুত্রকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার চুমা খাইল। খোকা ডাকিল]

মা !

বাবা !

[এমন সময় ইন্দ্রজিৎ আসিয়া সমস্ত শুনিয়া খুশি হইয়া উঠিলেন। শোনা গেল, সুষমা পাশের ঘরে হারমোনিয়াম সহযোগে গান ধরিয়াছে]

হৃদয়ের সাথে হৃদয় মিলিল ওই,
অন্তর-দেব, তুমি কই, তুমি কই !
কত বাদল নিশীথ জাগি রে
প্রিয়ের পরশ মাগি রে—
দেহ আছে, তার মন গেছে কত দূরে,
জড় নিয়ে খেলা কেমনে বল তো সই !
অন্তর-দেব, তুমি কই, তুমি কই !

এ যেন নিশার স্বপন-শেষে
শুধু স্মৃতি জ্বালাময়,
এ যেন বাসর-মিলন-বেশে
শ্মশানের পরিচয়।

হায়, মিলন মিলার চকিতে,
দেখি রয়েছি শূন্য তরীতে—
ছিঁড়ে গেছে পাল, হালখানি গেছে ভেঙে,
দুস্তর বারি চারিদিকে থইথই—
অন্তর-দেব, তুমি কই, তুমি কই।

[এই দৃশ্যটি শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয়ের 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত 'বিপর্যয়' নামক একখানি উপন্যাসের ছায়া লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছে দেখিতেছি।]

চতুর্থ দৃশ্য

কেশী সেবাব্রত আশ্রম—নিশীথ রাত্রি

[মনোরমা ও নীরেন্দ্রের বিবাহ হইয়া গিয়াছে; খুকীকে তাহার শ্বশুরবাড়ি হইতে পাঠায় নাই; সে মায়ের বিবাহে আসিতে পারে নাই বলিয়া সাত দিন ধরিয়া কাঁদিয়াছিল। ইতিমধ্যে নন-কো-অপারেশনের বন্যায় বাংলা দেশ ভাসিয়া গেল। সুষমা একজন প্রকৃত কর্মী হইয়া উঠিল। তাহার নাম এখন দেশের লোকের মুখে মুখে। সে বহু স্থলে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিল। দেশবিদেশ হইতে তাহার ডাক আসিতে লাগিল। ইন্দ্রজিৎবাবু বাধা দেওয়া সত্ত্বেও সে একদিন দেশের কাজে বাহির হইয়া গেল। খোকা বলিয়াছিল—মা, বাধা-বন্ধন চুলোয় যাক—চল, আমরা সন্তান ও মাতা মিলিয়া দেশের কাজে লাগিয়া পড়ি। তাহারা দুইজনে সর্বত্র খ্যাতি লাভ করিল। কিন্তু স্বদেশ-সেবার ফাঁকে ফাঁকে খোকার নব-উন্মেষিত যৌবন বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে লাগিল। সে

দেশের কাজে মাতার কল্যাণ চায়, কিন্তু তাহার স্নেহ অন্য জিনিস দাবি করে। সুষমা মা হইয়াছে বটে, কিন্তু সেও নারী চিরযুগের। যাহা হইবার হইল। দেশের সেবায় তাহারা রহিল মাতা ও সন্তান, কিন্তু অবসর-সময়ে তাহারা প্রেমিক-প্রেমিকা। শেষে দুই অবস্থায় রফা হইয়া গেল। দেশী সেবাব্রত আশ্রমে দিবসের প্রভূত পরিশ্রমের পর তাহারা দুইজনে পাশাপাশি শয্যায় শুইয়া। অন্যান্য কর্মীরা পাশের ঘরে তখনও জটলা পাকাইতেছে। ঘর অন্ধকার।]

[তাহারা দুইজনে নিঃশব্দে পরস্পরের হাতে হাত রাখিয়া পড়িয়া রহিল। খোকা বলিল]

মা, দেশ বড়, না হৃদয় বড় ?

খোকা, দেশ তো সামান্য ভূমিখণ্ড মাত্র, হৃদয় এক মহাবিশ্ব—দুয়ের তুলনাই হতে পারে না।

তোমার হৃদয় কি বলছে মা ?

বলছে, দেশকে বলি দাও ; হৃদয় জয়লাভ করুক।

তবে চল নারী, আমরা কোনও দূর দেশে গিয়ে আদিম মানবের মত নগ্ন প্রকৃতির বিচিত্রতার মধ্যে অবগাহন করি, ডুবে যাক সব ; অতল নিবিড় তমিস্রা—তুমি আর একটু কাছে এস।

[পাশের ঘরে কর্মীরা একসঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত গাহিয়া উঠিল]

মুক্তিপথের যাত্রী ওরে
ডুবিয়ে দে সব ডুবিয়ে দে রে
কাট্ রে মোহ-বাঁধন—
মায়ের মুক্তি লাগি তোরা
কর্ রে শক্তি-সাধন

পিছন থাকুক পিছে প'ড়ে,
অনেক দূরের যাত্রী ওরে—
কারাগারের শিকল ভেঙে
মিথ্যা তোদের কাঁদন—
কাট্ রে মোহ-বাঁধন।

চরণতলে হৃদয় দ'লে যা,
ভাসে ভাস্তুক নয়নজলে গা—

যা গেল তা আবার হবে
চল্ জননীর জয় রবে—
দে রে থলি উজাড় ক'রে
আছে রে তোর যা ধন—
কাট্ রে মোহ-বাঁধন।

[খোকা শিহরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ও অন্ধকারে সুষমার পায়ের ধূলি লইয়া বলিল]

মা, আশীর্বাদ কর, আমি চললুম—বন্দে মাতরম্।

[সুষমা মূর্ছিতার মত পড়িয়া রহিল।]

[চতুর্থ দৃশ্যে নরেশবাবুর 'শান্তি'র প্রভাব দেখিতেছি।]

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—পদ্মাতীর, বৈশাখ-সন্ধ্যা

[এই দৃশ্যটি অতি সংক্ষেপে লিখিবার হুকুম হইয়াছে ; দেখিতেছি, বাস্তব-জগৎ কবির কল্পনারাজ্যেও অধিকার বিস্তার করিতেছে। যাক, নন্‌-কো-অপারেশনের হিড়িক চলিয়া গিয়াছে ; সুষমা ফুটা নৌকার মত চড়ায় আসিয়া ঠেকিয়াছে। তাহার জীবনের আর কোনও স্বাদ নাই। তাহার মন চায় নীরেন্দ্রকে, কিন্তু মনোরমা তাহাকে বাঁধিয়াছে। নীরেন্দ্র মৈমনসিংহে ডাক্তারি করিতেছে। একবার সে নীরেন্দ্রকে সর্বস্ব বিলাইয়া দিয়া তৃপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার ভাগ্যে তাহা সহিল না। ভাগ্যের ফেরে সে আজ নিঃস্ব, হৃদয়ে ও মনে। বর্ষাক্ষিপ্ত উত্তালতরঙ্গময়ী পদ্মার দিকে সে স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইল। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। তাহার মনে হইল, তাহার জীবন একদিন অমনই উদ্দাম গতিতে ছুটিয়াছিল ; এমনই আবিল, এমনই পঙ্কিল, কিন্তু কি তীব্র গতিশালী! কত কালবৈশাখী তাহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে! আজ কোথায় সে জলস্রোত—শুষ্ক শীর্ণ চড়া-মাত্রে সে পর্যবসিত হইয়াছে। তাহার মনে পড়িয়া গেল, যৌবনে তাহার কবিপ্রেমিক ক্ষীণেন্দ্রকুমার তাহার নামে গান বাঁধিয়াছিল। সে ধীরে ধীরে গাহিতে লাগিল]

ওগো যৌবন-দেবতা,
আমি গাহিব তোমার গান।
নিঃস্ব বিশ্বে কি দিব তোমায়
লহ উজ্জ্বল প্রাণ—

আমি পাত্র ভরিয়া ওষ্ঠে তোমায় ধরিব,
নিঃশেষে পান করিয়া না হয় মরিব,
জরা-জয়ী হব, মৃত্যুকে নাহি ডরিব—
তারে হানিব মৃত্যুবাণ—
লহ উচ্ছল প্রাণ।

কিসের শঙ্কা অভয় দৃষ্টি যদি হানো,
ভৃত্য বলিয়া যদি মানো—

এস পূর্ণ দেহের সব আবরণ ফেলিয়া,
এস লজ্জা শরম চরণের তলে ঠেলিয়া,
আমি বক্ষে তোমায় ধরিব হৃদয় মেলিয়া—
ওষ্ঠে করিব পান,
লহ উচ্ছল প্রাণ।

[পুরাতনের স্মৃতিতে সে শিহরিয়া উঠিল। হায় রে সেই যৌবন-বেদনা-রসে উচ্ছল দিনগুলি!

সহসা তুমুল ঝড় উঠিল—সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বর্ষণে আকাশ মেঘ মাটি একাকার হইয়া গেল, পদ্মা ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। অদূরে তরঙ্গাঘাতে একটি নৌকা আছাড়িবিছাড়ি খাইতেছিল। সুষমার চিত্ত 'হায় হায়' করিয়া উঠিল, পর-মুহূর্তেই নৌকাখানা তলাইয়া গেল। সুষমা উত্তাল পদ্মাবক্ষে ঝম্পপ্রদান করিয়া নৌকাভিমুখে সন্তরণ করিয়া চলিল। বহুকষ্টে একজনকে সে উদ্ধার করিয়া তীরে আনিয়াই মূর্ছিত

হইয়া পড়িল; মূর্ছাভঙ্গে বিদ্যুৎচমকে দেখিল, সেই নগ্নগাত্র পুরুষ তাহারই চিরবাঞ্ছিত নীরেন্দ্রনাথ। সেই মূর্ছিত দেহকে জড়াইয়া সে এলাইয়া পড়িল, বলিল]

বিদ্যুৎ, আর একবার—আর একবার…

[কড়্‌কড়্‌ করিয়া বজ্র হাঁকিয়া গেল। সুষমা সভয়ে দেখিল, নীরেন্দ্রের বুকে উল্কি দিয়া শাখাবৃত আঁকা; সে তৎক্ষণাৎ তাহার বহু-দিন-নিরুদ্দিষ্ট দাদাকে চিনিতে পারিয়া শিহরিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িল; তাহার মুখ হইতে অস্ফুট উচ্চারিত হইল]

ভগবান, এ কি সর্বনাশ করলে!

[পদ্মার এক প্রবল তরঙ্গ আসিয়া দুইজনকেই তাহার গর্ভে টানিয়া লইল।]

যবনিকা পতন

[পঞ্চম দৃশ্যে দেখিতেছি বন্ধুবর মন্মথ রায় এম. এ.-র 'সেমিরামিস' নাটকের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে।]

শেষের কথা

নাটক শেষ হইল। এইবার নাটকের যথার্থ নাম ও পাত্র-পাত্রী নির্দেশ করা যাইতে পারে। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অন্য কোন নাম ঠিক করিতে পারিলাম না।

পাত্রপাত্রীগণ এইরূপ—

মনীশ—ফরিদপুর ঝাড়গ্রামের যুবক জমিদার

নীরেন্দ্র—রাওলপিণ্ডির ডাক্তার, সুষমার নিরুদ্দিষ্ট জ্যেষ্ঠ সহোদর

ইন্দ্রজিৎ—মৈমনসিংহের উকিল, মনস্তত্ত্ববিদ্

খোকা—ইন্দ্রজিতের ভাগিনেয়, মনোরমার পুত্র

মিয়া সাহেব—কারারক্ষী

সুষমা—[illegible] বিধবা পুত্রবধূ

মনোরমা—ইন্দ্রজিতের বিধবা ভগিনী

স্থানাভাবে নাটকটির নানা স্থলে মনস্তত্ত্বমূলক সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ সম্ভবপর হইল না। তবে এই সূত্রে, নরেশবাবু, চারুবাবু প্রভৃতির উপন্যাস ও 'কল্লোল' ও 'কালি-কলম' সম্প্রদায়ের লেখা পাঠ করিতে সকলকেই অনুরোধ করি, তাহাতে অনেক দুর্বোধ্য স্থান পরিষ্কার হইয়া যাইবে, এখানে তাঁহাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

যদি কেহ নাটকটির অভিনয় করিতে চান; আমার অনুমতি লইবার প্রয়োজন নাই, তবে অলিখিত স্থানগুলি আমাকে দিয়া লিখাইয়া লইলেই ভাল হয়। গানগুলিতে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় মহাশয় সুর দিলেই চমৎকার ওতরাইবে; তবে এগুলি অভিনেতাদের ইচ্ছাধীন, না করিলেও ক্ষতি নাই।

পরিশেষে, বিশেষ বক্তব্য এই যে, ইন্দ্রজিতের পার্ট যেন কোন এক-জন বিশেষ শিক্ষিত লোককে দেওয়া হয়।]

রসিকতার মূল্য

কবি ও ঔপন্যাসিক ভূগোল চট্টোপাধ্যায়ের নাম আজ কে না জানে? উত্তরে কেপ কমোরিন ও দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর অবধি যেখানে যত বাঙালী অধ্যাপক এবং স্কুলমাস্টার আছেন ভূগোল চাটুজ্জের অদ্ভুত মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের কথা দিনান্তে কে না একাধিকবার স্মরণ করিয়া থাকেন? কাব্য-জগতে ভূগোল চাটুজ্জের 'কমলে কণ্টকে'র স্থাননির্ণয় লইয়া এমন সাহিত্য-সভা নাই যেখানে হাতাহাতি না হইয়া থাকে, উপন্যাস-রাজ্যে তৎপ্রণীত 'লোটাকম্বল' যে যুগান্তর আনিয়াছে সে বিষয়ে কলিকাতার যাবৎ-মেসের ম্যানেজারবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া মেদিনীপুরী ব্রাহ্মণ পর্যন্ত সকলে একমত।

মাধ্যন্দিনের প্রচণ্ড মার্তণ্ড উষার অব্যবহিত পূর্বে অন্ধকারের কবলায়িত থাকে—ইহা বিশ্বাস করিতে যেমন আমাদের প্রবৃত্তি হয় না, এমন যে ভূগোল চট্টোপাধ্যায় তিনিও একদা যশের কাঙাল ছিলেন—সে কথাও আজ তেমনই অবিশ্বাস্য মনে হয়। কিন্তু বস্তুত এ কথা সত্য। তাঁহার যশোরবি যখন সবেমাত্র অন্ধকার তিমিরবক্ষ ভেদ করিয়া উঁকি দিতে শুরু করিয়াছেন, আমরা তখন হইতেই তাঁহাকে জানিতাম। তিনি তখন পটলডাঙার এক মেসে অবস্থান করিতেন, 'নবীন' মাসিক-পত্রে তাঁহার কয়েকটি গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে এবং 'নন্দন-সমাচারে' তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'ভিত্তির প্রেমে'র শেষ কিস্তি বাহির হইয়াছে; দুইটি-একটি ছাত্রসংঘে তাঁহার নাম আলোচিত হইতেছে এবং তদানীন্তন ধূর্জটীপ্রসাদ ও দিলীপকুমারের দল তাঁহাকে অভিনন্দন-লিপিও দুই-একটি প্রেরণ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত

মহিলা-কবি নবতারা সরকার এক সান্ধ্যভোজে সমসাময়িক সাহিত্য-প্রসঙ্গে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

নিজের নাম সম্বন্ধে তাঁহার দুর্বলতা তখন হইতেই লক্ষ্য করিয়াছিলাম। অভিনন্দন-লিপিগুলি তাঁহার পকেটে পকেটেই ফিরিত এবং আলু হইতে হিমালয় পর্যন্ত যে কোন আলোচনায় তিনি সুকৌশলে আপনার কবিতা ও উপন্যাসের প্রসঙ্গ অবতারণা করিয়া পকেট হইতে প্রশংসাপত্রগুলি বাহির করিতেন এবং পরিশিষ্টে বলিতেন, জাস্টিস অমুকের ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকটে শুনিলাম, অমুক গঞ্জের মহিলারা 'ভিস্তির প্রেম'কে এই যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলিতে দ্বিধা করেন নাই, ইত্যাদি।

ভূগোল চাটুজ্জের প্রতি আমাদের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও প্রীতি ছিল, তবু তাঁহার এই যশোলিপ্সা লইয়া তাঁহাকে ক্ষ্যাপাইতে কসুর করিতাম না। হীরেনের রসিকতা মাঝে মাঝে মাত্রা অতিক্রম করিয়া যাইত। মেয়েলী ছাঁদে চিঠি লিখিয়া ভূগোল চাটুজ্জের নামে ডাকে পাঠানো, বেথুন কলেজের ছাত্রী হীরেনের কল্পিত ভগিনীর সহিত তাহার সহপাঠিনীদের 'ভিস্তির প্রেম' ও সঙ্গে সঙ্গে লেখক ভূগোল চাটুজ্জে সম্বন্ধে ব্যক্তিগত ও ঘনিষ্ঠ আলাপাদির সংবাদ দেওয়া প্রভৃতি মামুলী রসিকতা তো প্রত্যহই করা হইত। এক-একদিন হীরেনের রসিকতা এমন নূতন ও আকস্মিক ধরনের হইত যে, পরিণাম ভাবিয়া আমরাও ভড়কাইয়া যাইতাম।

সকল কবি ও সাহিত্যিকের মতই নারীজাতি সম্বন্ধে ভূগোল চাটুজ্জের দুর্বলতা ছিল, একটু যেন অতিরিক্তই ছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে অবতরণ করিবার অব্যবহিত পূর্বে একবার তাঁহার বিবাহের কথাবার্তা হইয়া ভাঙিয়া যায়। তাই যশের দেবীর কৃপা-কটাক্ষের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নারীজাতির প্রীতি-কটাক্ষেরও কামনা করিতেন, এই কামনা তাঁহার

মনের মধ্যে পাক খাইতে খাইতে তাঁহাকে এমন অবস্থায় আনিয়া ফেলিয়াছিল, যেখানে মানুষের সহজ বুদ্ধির বালাই থাকে না এবং রাজকন্যা ব্যতিরেকে অর্ধেক রাজত্বও তুচ্ছ মনে হয়।

একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। পটলডাঙার যে মেসে কবি ভূগোল চট্টোপাধ্যায় নীড় রচনা করিয়াছিলেন, ঠিক তাহার সম্মুখেই এক স্বনামধন্য ব্যারিস্টারের বাড়ি। এই ব্যারিস্টারের সুন্দরী কন্যা কবির চক্ষের সম্মুখেই ধীরে ধীরে পরিবর্দ্ধমান হইতেছিল। এই বালিকাটির প্রতি কবির একটু লোলুপ ও সিক্ত দৃষ্টি ছিল। কবির ধারণা ছিল, মাসের পর মাস 'ভিস্তির প্রেম' পড়িয়া বালিকা লেখকের প্রতি অনুরক্ত হইয়া পড়িবে এবং একদা চকিতবিস্ময়ে অনুভব করিবে, তাহারই উপাস্য কবি সম্মুখবর্তী মেসের তেতলার বারান্দায় দাঁড়াইয়া তাহারই দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া আছেন। পূজানিরত পার্বতী কম্পান্বিতকলেবরে দাঁড়াইয়া থাকিবে, তপোমগ্ন মহাদেবের বিহ্বল দৃষ্টি ধুতুরার মালার মত তাহার গলে বিলম্বিত হইবে। তারপর—। কবি আর ভাবিতে পারিতেন না।

কিন্তু একদা প্রত্যুষে ব্যারিস্টারের বাড়িতে সানাই বাজিয়া উঠিল এবং সন্ধ্যায় এক সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া কবি-প্রেয়সীকে জীবনসঙ্গিনী করিয়া লইল। ক্ষোভে, রোষে কবি আত্মহত্যা করিতে না পারিয়া মেস ত্যাগ করিয়া গেলেন এবং দ্বিচারিণী চপলপ্রকৃতি নারীজাতি সম্বন্ধে এক ঘোর অভিশাপ-কণ্টকিত কবিতা লিখিয়া ফেলিলেন।

কবি ভূগোলচন্দ্রের অন্তরে যশাগ্নি যতই প্রজ্জ্বলিত থাকুক, বাহিরে কেমন করিয়া তাহা শান্তভাব ধারণ করিল, সেই কথাই বলিতেছি। হীরেনের এই চরম রসিকতার ফল যাহাই হউক, আমাদের প্রত্যেককেই যে কিছু কিছু অর্থদণ্ড দিতে হইয়াছিল, আজিও তাহা স্মরণ আছে।

সকালে ডাক খুলিয়াই এক অপ্রত্যাশিত আমন্ত্রণ-লিপি পাইলাম। বেলেঘাটার মহিলা-সংঘ সংঘের সাম্বৎসরিক উৎসবে যোগদান করিবার জন্ত আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। যথারীতি মুদ্রিত পত্র। আমি থাকি সিমলায়, বেলেঘাটায় কোনও মহিলা-সংঘের নাম শোনা দূরে থাকুক, বেলেঘাটায় কোনও মহিলা আছে কি না, সে বিষয়েই অজ্ঞ ছিলাম, হঠাৎ সেখান হইতে ছাপা নিমন্ত্রণ-পত্র! পিছনের স্মারকলিপি দেখিয়া ব্যাপারটা কিছু হৃদয়ঙ্গম হইল। অন্তান্ত আয়োজনের সঙ্গে বড় বড় অক্ষরে ছাপা—বিখ্যাত কবি ভূগোল চট্টোপাধ্যায়ের স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি। বুঝিলাম, কবি স্বয়ং বন্ধুহিসাবে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিবার উপদেশ দিয়া থাকিবেন। কবি-বন্ধুর এই খ্যাতিবিস্তারে আনন্দিত হইলাম।

নির্দিষ্ট দিবসে সন্ধ্যার প্রাক্কালে মহিলা-সংঘের ঠিকানায় পৌছিলাম। একটা প্রাচীন লাইব্রেরি-ঘর। দরজায় মঙ্গল-ঘট। একটি বালিকা স্বাগত সম্ভাষণে আমাকে ভিতরে লইয়া গেল। লোক মন্দ জমায়েৎ হয় নাই, তবে মহিলা একটিও দেখিলাম না। পাশের এক দিকে পরদা বিলম্বিত ছিল। ভাবে বোধ হইল, আয়োজনকর্ত্রীরা সকলেই ইহারই অন্তরালে অবস্থান করিতেছেন। বেলেঘাটার মহিলা-সংঘ এখনও পরদা ছিঁড়িয়া বাহির হইতে পারেন নাই। আনন্দও হইল, দুঃখও হইল। সমবেত সকলেই ভূম্যাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, কেবল এক দিকে একটি সুঠাম চেয়ারে আমাদের ভূগোলচন্দ্র ডান হাতে এক গোছা কাগজ ও বামহস্তে একটি যষ্টি ধারণ করিয়া গম্ভীরবদনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার মুখ উজ্জ্বল, চশমার অন্তরালে চোখের কোণে স্মিত হাসিও দেখিলাম। একটি ক্ষীণকায় বৃদ্ধ ভদ্রলোক (মনে হইল সভাপতি) তাঁহার বক্তৃতা শেষ করিয়া কবিবরকে আবৃত্তি করিতে

অনুরোধ করিয়া ভূম্যাসন গ্রহণ করিতেই ঘোর করতালিধ্বনি হইল। আমি সেই অবসরে কাশির সাহায্যে কবি ভূগোল চাটুজ্জের দৃষ্টি আমার দিকে আকর্ষণ করিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া ভিড়ের মধ্যে বসিয়া পড়িলাম।

কোঁচাটি ঝাড়িয়া, ফাউণ্টেন পেনের ক্লিপে একবার হস্তস্পর্শ করিয়া কবি ভূগোলচন্দ্র দণ্ডায়মান হইলেন। ঘন কৃষ্ণ যবনিকার অন্তরাল ভেদ করিয়া দৃষ্টি কি যেন অন্বেষণ করিতে গিয়া আহত হইয়া ফিরিয়া দক্ষিণহস্তস্থিত কাগজগুচ্ছের উপর পতিত হইল। সঘষ্টি বামহস্ত পৃষ্ঠের উপর সংলগ্ন হইল। তিনি উদাত্তস্বরে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি শুরু করিলেন। বৈদ্যুতিক পাখার বাতাসে ভারী পরদা যতই হেলিতে দুলিতে লাগিল, কবির কণ্ঠও ততই উদারা-মুদারা-তারায় খেলিতে লাগিল। হঠাৎ এক সময়ে পরদার আবরণ একটু সরিয়া যাওয়াতে ভিতরে কিয়দ্দূর অবধি আমার দৃষ্টি গেল, চকিতের মধ্যে আলুলায়িত কেশ বলিয়া ভ্রম হইলেও ঠাহর করিয়া দেখিলাম, খোঁপা নহে, ফেজ-টুপি; সুতরাং আলুলায়িত কেশ নয়, দাড়ি। ভিতরে সস্মিতবদন হীরেনকেও যেন দেখিলাম।

নিমেষমধ্যে ব্যাপারটি বুঝিতে পারিলাম—হীরেনেরই খেলা। শুনিয়াছিলাম, বেলেঘাটার কোথায় হীরেনের শ্বশুরালয়। হীরেনের শ্বশুরালয়ে বসিয়াই বন্ধুর লাঞ্ছনা দেখিতেছিলাম। কবির কিন্তু কোনও খেয়াল নাই; তাঁহার চকিত দৃষ্টি আলুলায়িত কেশপাশই দেখিয়া থাকিবে, তিনি কণ্ঠস্বর মধুর করিবার চেষ্টা করিয়া আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

গগনে কাহার পিঙ্গল জটাভার—
জটা নহে, ও কে দেয়াশিনী এলোচুলে
আকুল করিয়া ছড়ায়ে মনের ভুলে,

মেঘের ভেলায় গগন হতেছে পার!
কে তুমি আড়ালে, বিরলে বসিয়া আমি
গাঁথিতেছি মালা ঝ'রে-পড়া স্বপনের,
লাগিতেছে চোখে শেষ চুমা তপনের;
দিবা অবসান, নামিছে তিমির-যামী।
তুমি দেখা দাও ওগো অরূপিণী—

হঠাৎ এক বিপর্যয় ব্যাপার ঘটিল—অবশ্য এরূপ যে ঘটিবে, আমি তাহা পূর্বেই উপলব্ধি করিয়াছিলাম। কাহার চঞ্চল হস্তচালনায় পরদা ফাঁক হইয়া গেল, সমবেত সকলে বিস্ময়াপ্লুত চক্ষে দেখিলেন, বেলেঘাটার মহিলা-সংঘ নহে, ভিতরে চারিটি প্রবীণ মৌলভী বসিয়া কাতরভাবে দাড়িতে হস্তের প্রলেপ দিতেছেন। কবি থতমত খাইয়া মাঝপথে আবৃত্তি সমাপ্ত করিয়া চশমাজোড়া চোখ হইতে খুলিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন এবং পরক্ষণেই অশ্রুগদ্‌গদ বদনে চশমা সজোরে মেঝের উপর নিক্ষেপ করিয়া উন্মত্তের মত সভাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। চশমাজোড়া চূর্ণ-বিচূর্ণ অবস্থায় মেঝেতে পড়িয়া রহিল। বাহিরে একটা রব উঠিল, ধর ধর, গাড়ি চাপা পড়বে।

পরদিনই ১৮৷৹ মূল্য দিয়া কবিবরের চশমাজোড়া আমাদিগকেই পুনর্স্থাপন করিতে হইয়াছিল।

স্বরাজ-স্বপ্ন

অ্যানিভার্সারি নম্বর 'ফরোয়ার্ড'খানা পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া কখন যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, জাগিয়াই দেখি, এক বিস্তীর্ণ মরুভূমি। খররৌদ্রে ধূ-ধূ করিতেছে। কোথায় আসিয়া পড়িয়াছি, কিছুই ঠিক করিতে পারিতেছিলাম না। হঠাৎ দেখি, কিছুদূরে মরুভূমির বালুর উপরেই একদল লোক নামাজ পড়িতেছে। আরবীদের ছবি সুবল মিত্রের ডিক্‌সনারিতে দেখিয়াছিলাম, ইহাদিগকে আরবী বলিয়াই মনে হইল। বুঝিলাম, আরব দেশের মরুভূমির মধ্যে শুইয়া আছি। ধূলা ঝাড়িয়া উঠিলাম। কিছুদূর চলিবার পর তৃষ্ণায় ছাতি ফাটিবার উপক্রম হইল, বহুকষ্টে সেটিকে মুড়িয়া রাখিয়া পথ চলিতে লাগিলাম।

কতক্ষণ পথ চলিয়াছিলাম, মনে নাই; দেখিলাম, মরুভূমির মধ্যে এক রাজপথের উপর দিয়া চলিয়াছি। লাল মাটি—ঠিক গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের মত, কিন্তু গাছপালা বা জনমানবের চিহ্ন নাই। এক স্থানে রেল-লাইন পার হইয়াই একটি বৃহৎকায় খর্জুরবৃক্ষ দৃষ্ট হইল, সটান একাকী দাঁড়াইয়া আছে, গুচ্ছ গুচ্ছ তাম্রাভ খর্জুর রৌদ্রালোকে ঝলসিয়া উঠিতেছে। পথের পাশেই গাছ, আশেপাশে গুল্মলতাদির চিহ্ন পর্যন্ত নাই। বৃক্ষতলে একজন বিপুলকায় লোক ভুটিয়া কম্বলে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া চিত হইয়া শুইয়া আছে, পায়ের খড়মজোড়া কম্বলের ভিতর হইতে উঁকি দিতেছে। খেজুর খাইয়া তৃষ্ণা নিবারণের বাসনা হইল। গাছের সন্নিকটবর্তী হইয়া দেখি, গুম্ফশ্মশ্রু-সমাকীর্ণ বিরাট একখানা মুখ, হাঁ করিয়া ঊর্ধ্বে খর্জুরগুচ্ছের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পড়িয়া আছে; মুখখানা আরবী নয়, চেনা চেনা মনে হইল। সাহস সঞ্চয় করিয়া যতদূর

সম্ভব বিনীতভাবে বলিলাম, মহাশয়, আমি তৃষ্ণার্ত্ত পথিক, কিছু খর্জুর প্রার্থনা করি। আপনি যে ভাবে শয়ন করিয়া আছেন, আপনাকেই এই গাছের মালিক বলিয়া বোধ হইতেছে, যদি এই অধমের প্রতি কৃপা করেন—। সুপক্ক খর্জুরগুচ্ছগুলি দেখিয়া জিহ্বা ও তালু সরস হইয়া উঠিতেছিল; গদগদ স্বরে বলিলাম, শুনিয়াছি, আপনারা অতীব অতিথি-পরায়ণ, আপনাকে দেখিয়া তাহাই প্রতীতি হইতেছে—

উত্তর নাই, বিরক্ত হইয়া মনে মনে বলিলাম, আচ্ছা অভদ্র লোক তো! শিশুকাল হইতেই গাছে চড়া অভ্যাস ছিল। একবার ভাবিলাম, চড় চড় করিয়া বৃক্ষারোহণপূর্ব্বক কয়েকগুচ্ছ খর্জুর পাড়িয়া লইয়া এই অভদ্রতার প্রতিশোধ লই, কিন্তু লোকটির বিপুল দেহ আমাকে নিরস্ত করিল। এই মরুভূমির মধ্যে গলা টিপিয়া মারিয়া বালুর মধ্যে পুঁতিয়া দিলেও কেহ দেখিবে না। কাজ নাই, বলিলাম, ও মশাই, শুনছেন? ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাহিয়া চমকিয়া উঠিলাম, কি করুণ হতাশার ভাব! কেমন সন্দেহ হইল, চক্ষু রগড়াইয়া দেখি—অবাক কাণ্ড, এ যে আমাদের ভারতবর্ষ!—এখানে আসিল কেমন করিয়া, আর এমন নির্জ্জীবভাবে আরবের মরুভূমিতে ভুটিয়া কম্বল গায়ে রোদই বা পোহাইতেছে কেন? সম্ভবত ম্যালেরিয়া হইয়াছে মনে করিয়া কুইনিনের বড়ি ট্যাঁক হইতে বাহির করিব ভাবিতেছি, খর্জুরবৃক্ষটি নড়িয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখি, গাছটি আমাদের ইংলণ্ড—আমাদের রাজার দেশ। নিমিষের মধ্যে এই অভূতপূর্ব পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। ইংলণ্ড খর্জুরবৃক্ষরূপে দণ্ডায়মান, নিম্নে পাদদেশে ভারতবর্ষ চিত হইয়া জড়ের মত পড়িয়া আছে, শুধু চোখের হতাশ দৃষ্টি তাহার প্রাণের পরিচয় দিতেছে। ফলগুলির দিকে তাকাইয়া দেখি, লাল শালু মুড়িয়া কে যেন সেগুলিতে

লেবেল মারিয়া দিয়াছে। চশমাজোড়া ঠিক করিয়া নাকে বসাইয়া দেখি, ফলের গায়ে 'স্বরাজ' এই কথা লেখা আছে।

তৎক্ষণাৎ সমস্ত ব্যাপারটি উপলব্ধি করিতে পারিলাম। বুঝিলাম, পক্ব ফলের লোভে বেচারা ভারতবর্ষ বহু কষ্টে বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া নিবিড় আলস্যবশত গাছে চড়িতে না পারিয়া চিত্ত হইয়া শুইয়া ফল পতনের অপেক্ষা করিতেছে। বোধ হইল, বেচারা বহুকাল এইভাবে পড়িয়া আছে, কারণ তাহার বাঁ পায়ের খড়মে শিকড় গজাইয়াছে দেখিলাম। একটি ফলও ইতিমধ্যে নীচে পড়ে নাই, কারণ একটি আঁটিও বৃক্ষতলে পড়িয়া থাকিতে দেখিলাম না।

কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময়ে দূরে মহা গোলমাল শুনিতে পাইলাম। আরবদস্যু আসিতেছে মনে করিয়া তাড়াতাড়ি বালু খুঁড়িয়া আকণ্ঠ বালুতে নিমজ্জিত হইয়া উটপক্ষীর ডিমের ন্যায় শব্দ করিতে লাগিলাম; ডিম মনে করিয়া সম্ভবত উহারা আমার দিকে নজর দিবে না।

কোলাহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। মনে হইল, যুদ্ধক্ষেত্র কোনও বিরাট বাহিনী মহোল্লাসে বাড়ি ফিরিতেছে; পাঁচটার একটু পরেই হাওড়া ব্রিজের উপর ঘরমুখো কেরানীকুল যেরূপ কলরব করিতে করিতে ফিরে এই কোলাহলও প্রায় তদ্রূপ মনে হইল। ভাবিলাম, কোকেনখোর ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই এই হট্টগোলে উঠিয়া বসিবে। দূর হইতে সর্বপ্রথমে রঙবেরঙের ধ্বজা দৃষ্টিগোচর হইল, তারপর সব চেনা চেনা মুখ; আমাদের দেশের বিভিন্ন সময়ের ও দলের নেতৃবৃন্দ নানা ভাষায় ও নানা ঢঙে আস্ফালন করিতে করিতে সেই খর্জুরবৃক্ষের সমীপবর্তী হইতে লাগিলেন। ভারতবর্ষের কোনও বিকার নাই; পূর্ববৎ অসাড় হইয়াই পড়িয়া রহিল।

সেই বিরাট দল ভারতবর্ষের কাছাকাছি আসিয়া তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল; তখনও সকলের মুখে খই ফুটিতেছে, হাত নাড়িতেছে, পা নাড়িতেছে এবং নানা কৌশলে শূন্তে মুষ্ট্যাঘাত করিয়া গলার জোর দেখানো হইতেছে। সকলের মুখেই এক কথা, আহা, বেচারা লোলুপ-ভাবে তাকাইয়া তাকাইয়া পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইয়াছে, খর্জুরফল ইহাকে খাওয়াইয়া দিতেই হইবে।

সহসা সেই সমবেত নেতৃবৃন্দ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন; নেতাদের ভিড় ভেদ করিয়া কিছু লক্ষ্যগোচর হইল না, তবে কথায় বার্তায় বুঝিলাম, একটি পক্ব খর্জুরফল ভারতবর্ষের গোঁফের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু গোঁফের উপর হইতে মুখাভ্যন্তরে তুলিয়া মুখে ফেলিয়া দিবার মত ধৈর্য বা ক্ষমতা ভারতবর্ষের নাই। তাহার চক্ষুপ্রান্ত দিয়া জল ও ওষ্ঠপ্রান্ত দিয়া লালা নির্গত হইতেছে। কিন্তু ফলটিকে গোঁফের উপর হইতে মুখাভ্যন্তরে তুলিয়া দিবার কষ্টটা কেহ লইতে স্বীকৃত হয় না। সবাই খর্জুরবৃক্ষতলে আসিয়া হল্লা করিতে লাগিল।

বেচারা ভারতবর্ষকে সকলে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে; আকণ্ঠ বালুকা-নিমজ্জিত হইয়া তাহাকে দেখিতে পাইতেছিলাম না, অথচ সমাগত জনমণ্ডলী তাহাকে লইয়া কি করে দেখিবার জন্ত উত্তরোত্তর আগ্রহ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দেখিলাম, খর্জুরবৃক্ষচূড়া ঘন ঘন আন্দোলিত হইতেছে; শালু-আবৃত ফলগুলি ছিঁড়িয়া পড়ে পড়ে।

সকলে ভারতবর্ষকে লইয়াই ব্যস্ত ছিল, আমার দিকে কাহারও নজর ছিল না, বহুকষ্টে রৌদ্রের শিকড় ধরিয়া বালুকা হইতে নিজেকে উত্থিত করিলাম। উঠিবামাত্র তাজ্জব ব্যাপার, দেখি, আমি গড়ের মাঠে মনুমেণ্টের পাদদেশে দাঁড়াইয়া আছি; মনুমেণ্টটি একটি খর্জুরবৃক্ষের আকার ধারণ করিয়াছে, গগনভেদী মুকুটখানি হইয়াছে গাছের চূড়া—

হাওয়ায় তাহাই আন্দোলিত হইতেছে। কলগুলি আর শালু-মোড়া নাই, রেলিং দিয়া কে যেন তাহা ঘিরিয়া দিয়াছে। সমাগত লোকেরা মনুমেণ্টের চারপাশে দাঁড়াইয়াই হল্লা করিতেছে।

আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইডেনগার্ডেন আর ক্যালকাটা ক্লিক টপকাইয়া গঙ্গা একেবারে মনুমেণ্টের ধারে আসিয়া পড়িয়াছে ; সেখানে নিমতলা ঘাটে শবদাহ হইতেছে, শৃগাল প্রভৃতি নির্বিঘ্নে হুক্কা-হুয়া করিয়া ফিরিতেছে, উর্ধ্বে শকুনি-গৃধিনীরা সশব্দে উড়িয়া বেড়াইতেছে।

সন্তর্পণে সেই ভিড়ের পাশে আসিয়া গলা বাড়াইয়া ভিতরে দেখিতে চেষ্টা করিলাম ; দেখি, ভারতবর্ষ বেচারা শিবনেত্র হইয়া চিত হইয়া পড়িয়া, বেচারীর নাভিশ্বাস শুরু হইয়াছে। ইচ্ছা হইল, ভদ্রলোকদের বলি, মশাইরা, একটু ভিড় ছাড়িয়া উহাকে নিশ্বাস লইতে দিন, নহিলে ও যে গেল। কিন্তু সাহস হইল না, সশঙ্কচিত্তে ভারতবর্ষের মৃত্যু প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।

অবস্থা দেখিয়া মনে হইল, আর বেশিক্ষণ নহে, পরলোকে যাহাতে তাহার সদ্‌গতি হয়, এইজন্য ছুটিয়া গিয়া অঞ্জলি ভরিয়া গঙ্গোদক আনিয়া মাথা দিয়া ভিড় ঠেলিয়া 'হরিনারায়ণব্রহ্ম' বলিয়া তাহার মুখে দিতে যাইব, দেখি, কে একজন আমার কাঁধ ধরিয়া আমাকে পিছনে টানিয়া আনিল। সৎকাজে বাধা পাইয়া চটিয়া গেলাম, ফিরিয়া দেখি, আমাদের রহিম সাহেব। আশেপাশে অসংখ্য তুর্কীক্যেজ দেখিয়া ভয় খাইয়া গেলাম, হাতের জলটুকু রহিম সাহেবের জুতার উপর পড়িল, তিনি 'তোবা' করিয়া পা টানিয়া লইলেন। রাগে ফুলিতে ফুলিতে বলিলেন, ছোকরা, ভারতবর্ষের মুখে জল দিবার তোমার কোন অধিকার নাই, ভারতবর্ষ হিন্দু কি মুসলমান তাহা এখনও ঠিক হয় নাই। আমরা উহার কবর দিবার জন্য প্রস্তুত আছি। তুমি উহার মুখে 'অমুক' জল দিয়া উহার

মৃতদেহ অপবিত্র করিতে পারিবে না। সমবেত মুসলমান-মণ্ডলী আল্লা-ধ্বনি করিয়া উঠিল।

সহসা ঠিক সম্মুখে কাঁদুনিমিশ্রিত হুঙ্কার শুনিতে পাইলাম। কলেজ স্কোয়ারে বক্তৃতা শোনা অভ্যাস ছিল, বুঝিলাম, শ্যামদাদার গলা। খালি গায়ে চাদর জড়াইয়া কাছা আঁটিতে আঁটিতে তিনি রহিম সাহেবের সম্মুখে আসিয়া অশ্রু-গদ্‌গদ হুঙ্কারে বলিয়া উঠিলেন, চ'লে এস, কে আছ কোথায় হিন্দু, আমরা মায়ের শবদাহ করিব—আমাদের আদিকালের জননী ভারতবর্ষ—যবনের করস্পর্শে তাঁহাকে অপবিত্র হইতে দিব না, বল—বন্দে মাতরম্।

একটা প্রচণ্ড কোলাহল আরম্ভ হইল, ভাবিলাম, আবার এপ্রিল মাসের মত দাঙ্গা শুরু হয় বুঝি! পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিব কি না ভাবিতেছি, হঠাৎ 'জয় চিত্তরঞ্জন-কি জয়,' 'স্বরাজ-কি জয়' শব্দে চমকিয়া উঠিলাম। দেখি, আমাদের চিত্তরঞ্জনই বটেন! খদ্দরের চাদরের অভ্যন্তর হইতে দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, সমবেত মহিলামণ্ডলী, হিন্দু ও মুসলমান ভ্রাতৃগণ, আপনারা স্থির হউন, যদি মাতা ভারতবর্ষ সত্য সত্যই গতায়ু হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার শবদেহ প্যাক্ট-অনুযায়ী ভাগ করিলেই গোল চুকিয়া যাইবে, পায়ের দিক হইতে ৫৪'৪ অংশ মুসলমানেরা গোর দিবেন। মাথার দিকের ৪৫'৬ অংশ হিন্দুরা দাহ করিবেন। কিন্তু আমার মনে হইতেছে, মাতা এখনও জীবিতা আছেন, যথাযোগ্য শুশ্রূষা করিলে তিনি এখনই সুস্থ হইবেন। বহুকাল নিরাহারে আছেন বলিয়া তিনি দুর্বল আছেন, আপনারা সকলে মিলিয়া স্বরাজ-ফণ্ডে চাঁদা দিয়া ও স্বরাজ-ক্রীডে সহি করিয়া ওই ঊর্ধ্ববিলম্বিত স্বরাজ-ফল দ্বারা মাতার ক্ষুধা পরিতৃপ্ত করুন। তিনি অবিলম্বে বল পাইবেন ও উঠিয়া বসিবেন। নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ও প্রতাপ

গুহরায় মহাশয় আপনাদের নিকট চাঁদা লইবেন, যতীন্দ্র সেনগুপ্ত মহাশয় স্বরাজ-ক্রীডে সহি করাইবেন, ততক্ষণ ভগিনী সরোজিনী ও সন্তোষ-কুমারী ভারত-মাতার শুশ্রূষা করুন। শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ও বসন্ত মজুমদার মহাশয়কে একটু ভিড় পরিষ্কার করিতে অনুরোধ করিতেছি। বিধানচন্দ্র রায় মহাশয় ভারতমাতার ইন্টারজেকশন মতে যথাযোগ্য চিকিৎসা করিবেন। সকলে হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

আমি বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া দেখিলাম—ভারতবর্ষ পুং অবস্থা হইতে স্ত্রী-আকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, আলুলায়িত কেশ ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছে, গুম্ফ ও শ্মশ্রুদেশ একেবারেই লোমশূন্য। সরোজিনী দেবী কানের কাছে তাঁহার নাইটিঙ্গেলী গলায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করিতে লাগিলেন, সন্তোষকুমারী দেবী তাঁহার কপালে সুলেমানী লবণ ঘষিতে লাগিলেন, বিধানচন্দ্র স্টেথেস্কোপ সহযোগে কিছুক্ষণ ভারতমাতার বুক পরীক্ষা করিয়া, ফীজের জন্য অন্যমনস্কভাবে বাম হস্ত বাড়াইয়াই লজ্জিত হইলেন।

শ্যামুদাদা কিন্তু নিরস্ত হইবার পাত্র নহেন, তিনি উল্লম্ফন করিতে করিতে মাথার চুল ছিঁড়িতে লাগিলেন, সবেগে ভারতমাতার সন্নিহিত হইয়া তাঁহার মোহন নাকীস্বরে বলিতে লাগিলেন, না না না, তা হবে না। আমাদের মা মরেন তো আমাদের হাতেই মরবেন—কে বললে, তিনি বেঁচে আছেন? ওগো, কে আছ কোথায় হিন্দু, তোমরা এস, মৃত্যুকালে মায়ের গঙ্গাজলী কর—ছেলের কাজ কর—ও ম্লেচ্ছদের কথা শুনো না। বলিতে বলিতে অশ্রুধারায় বিধৌত হইয়া তাঁহার কেরানী-চশমাজোড়া এক কানে ঝুলিতে লাগিল, তাঁহার দ্বারভাঙ্গা-মহারাজ-উপহৃত চাদরখানা স্কন্ধচ্যুত হইয়া ধূলায় লুটাইতে লাগিল, তাঁহার পরিধানধুতি নীবিদেশ হইতে স্খলিত হইয়া নেমাজরত ফজলু সাহেবের স্কন্ধে পড়ি-পড়ি করিতে লাগিল;

তাঁহার এই বেসামাল অবস্থা দেখিয়া চিরলজ্জাশীলা সন্তোষকুমারী মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। আবার একটা কোলাহল পড়িয়া গেল।

দেখিয়া শুনিয়া আমার দম বন্ধ হইবার মত হইল। একটু হাঁফ ছাড়িবার জন্য বাহিরে আসিয়া দেখি, মনুমেণ্ট হইতে একটু দূরে একটি ছোট দল ঊর্ধ্বে খর্জুরফলগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কি যেন বলাবলি করিতেছেন। আলগোছে তাঁহাদের নিকটে গিয়া দেখি, আমাদেরই মডারেট নেতৃবৃন্দ। নামাজ পড়িবার মত হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া নিমীলিত-নেত্রে স্তোত্র গাহিবার মত করিয়া বলিতেছেন, হে ইংরেজ-খর্জুরবৃক্ষ আমরা তোমাতে চড়িতে জানি না, চড়িবার মত দুরাকাঙ্ক্ষাও আমাদের নাই, তোমরা ভরসা দিলে আমরা তোমাদের চরণ-ছায়ায় উপস্থিত হই। হে মরুপাদপ, আমাদের প্রতি কৃপা কর, জননী ভারতবর্ষ খাদ্যাভাবে মরিতে বসিয়াছেন, দুই-একটি সুপক্ব খর্জুরফল তাঁহার বদনে নিক্ষেপ কর, তিনি বাঁচিয়া উঠুন। আজ প্রায় দুই শত বৎসর আমরা তোমার পাদছায়ায় ঊর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া বসিয়া আছি, আমাদের মধ্যে ভাগ্যবান যাঁহারা তাঁহাদের মস্তকে বায়সভুক্ত দুই-একটি খর্জুরের আঁটি পতিত হইয়াছে। হে কৃপালু ইংরেজ, ভারতমায়ের মুখে কিছু ফল পাতিত কর। আমরা এতকাল অপেক্ষা করিয়াছি, ১৯২৯ পর্যন্তও অপেক্ষা করিব।

মনুমেণ্টের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, মনুমেণ্ট-খর্জুরবৃক্ষ মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। সেই হাস্য অবলোকন করিয়া প্রার্থনারত মডারেট-দল আভূমি প্রণত হইলেন।

কিছুই ভাল লাগিতেছিল না, আবার মনুমেণ্ট-পাদদেশে ফিরিয়া আসিলাম। দেখি, ভগিনী সরোজিনী ও সন্তোষকুমারীর চেষ্টায় ভারত-মাতা অনেকখানি সুস্থ হইয়াছেন, চিত্তরঞ্জন মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। তিনি সকলকে ডাকিয়া হাস্যমধুর কণ্ঠে বলিলেন, আপনারা সকলেই দেখিলেন, ভারতমাতার কিছুই হয় নাই—অন্নাভাবে তিনি কিছু কাতরা আছেন মাত্র। তাঁহাকে অন্ন দিতে হইবে। অন্ন কোথায়? অন্ন ওই ঊর্ধ্বে ইংলণ্ডের গলায় ঝুলিতেছে, সেখান হইতে উহাকে টানিয়া আনিতে হইবে, ওইজন্য অর্থ চাই, লোকবল চাই, আপনারা স্বরাজ-ফণ্ডে চাঁদা

দিন, স্বরাজ-ক্রীতে সহি করুন—স্বরাজ-ফল সরসর করিয়া ভারতমাতার মুখে নামিয়া আসিবে। আর বিলম্ব করিবেন না, অধিক বিলম্বে মায়ের আবার ভিরমি লাগিতে পারে।

সমবেত জনতা আবার চঞ্চল হইল। সকলে চীৎকার করিয়া বলিল, আমরা দরিদ্র, অর্থ কোথায় পাইব? দেশবন্ধু আবার বলিলেন, যাঁহারা দরিদ্র, তাঁহারা কাউন্সিলের জন্ত দণ্ডায়মান স্বরাজ-পার্টির প্রতিনিধিগণকে ভোট দিলেই চলিবে—অবশ্য তাঁহার ভোট দিবার অধিকার থাকা চাই। হয় টাকা, নয় ভোট, ভারতমাতার প্রাণ এই দুইয়ের মধ্যে। ইংরেজকে ঘায়েল করিবার মন্ত্র আমরা জানি, শুধু টাকা চাই, ভোট চাই। আমার সময় হইয়া আসিল; যতীন্দ্র, শ্রীশ, প্রতাপ, বসন্ত রহিল, ভগিনী সন্তোষ-কুমারী রহিলেন, ইহাদের নির্দ্দেশমত চলিলেই ভারতমাতা আবার জন-কুস্তি লড়িতে পারিবেন।—এই বলিয়া দেশবন্ধু যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতিকে আলিঙ্গন করিয়া ধীরপদবিক্ষেপে আকাশমার্গ দিয়া উঠিয়া শূন্যে মিলাইয়া গেলেন। সকলে 'দেশবন্ধুর জয়' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। ভারতমাতা একটু নড়িলেন। কিন্তু খর্জ্জুরবৃক্ষ অচল অটল, মুখে সেই হাসি।

তারপর সেইখানেই ভোট আর চাঁদার পালা পড়িয়া গেল; শুধু 'চিত্তরঞ্জনের জয়' আর 'ভোট দাও' এই রব। আমার একটা ভোট ছিল, কি করিব ভাবিতেছি, হঠাৎ দেখি, আকাশ হইতে ঝুপঝুপ করিয়া কাগজ-বৃষ্টি হইতেছে, একটি তুলিয়া হাতে ধরিয়া দেখি 'ফরোয়ার্ড' অ্যানিভার্সারি নম্বর। চোখে পড়িল—

'Remember your Comrades behind the prison-bars and vote for the Swarajya candidates.'

অবিশ্রাম 'ফরোয়ার্ড'-বৃষ্টিতে ভারতমাতা ডুবিয়া গেলেন, মনুমেণ্ট পর্যন্ত কাগজের স্তূপে অদৃশ্য হইয়া গেল। ক্রমশ নিশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। ছুটিয়া পলাইতে গিয়া হোঁচট খাইয়া পড়িলাম—ঘুম ভাঙিয়া গেল, দেখি, 'ফরোয়ার্ড'খানা নাকের উপর চাপা দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম, ঘামে সেখানা ভিজিয়া গিয়াছে।

সাহিত্য-প্রসঙ্গে টেকচাঁদ

বন্ধু রমেশের মুখে সেদিন হঠাৎ শুনিলাম, প্রাণকান্তবাবু বিদেশ হইতে ফিরিয়াছেন। তাঁহার সহিত দেখা করিবার বাসনা বহুদিন হইতেই ছিল। বিদেশে বাস করিলে কি হইবে, অমন নিষ্ঠাবান বাংলা সাহিত্যিক এ দেশে কম জন্মিয়াছে। তোমরা বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, অচিন্ত্যকুমারের কথা বলিবে জানি। অচিন্ত্যকুমারের নামে আপত্তি করিতেছ? আপত্তি পূর্বে আমিও করিতাম, কিন্তু সেদিন শরৎচন্দ্রের সমভিব্যাহারে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছি। সেই সাক্ষাতের ফলাফল তোমাদের জানাইয়াছি। শরৎচন্দ্র নিজে ঔপন্যাসিক, অচিন্ত্যকুমার সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের উৎসাহের আধিক্য দেখিয়া তিনি হয়তো চটিয়াছেন, কিন্তু আমি তো চটিতে পারি না। বঙ্কিম সত্যই যাহা বিশ্বাস করেন, তাহাই বলিয়াছেন ; সুতরাং অচিন্ত্যকুমারের নাম বাদ দিতে পারি না। যাক, বঙ্কিম মাইকেল প্রভৃতিকে নিষ্ঠাবান সাহিত্যিকের দলে কেন ফেলিলাম না, প্রশ্ন করিতেছ? মাইকেল দীনবন্ধু বহুদিন মরিয়াছেন। শুনিলাম, বাংলা সাহিত্যের মুকুটমণি বঙ্কিমও নাকি সেদিন মারা গিয়াছেন। 'বেদে'র যে জায়গাটায় মাস্টার কর্তৃক আহ্লাদীর গর্ভপাতের অপূর্ব বর্ণনা দেওয়া আছে, বঙ্কিম সেইখানটা পড়িয়া বাস্তবতার মোহে এতদূর উত্তেজিত হইয়াছিলেন যে, হার্ট ফেল করিয়া মারা যান। অত্যন্ত বেদনা পাইয়াছি। রামের মাহাত্ম্য প্রমাণ করিবার জন্য রাবণকে মরিতেই হয়, ইহাই নিয়ম।

রাবণের কথা বলিতে মনে পড়িল, সন্দীপের কথা। সন্দীপ

বলিয়াছিল, রাবণের কাঁচা সঙ্কোচ ছিল। কাঁচা কথাটা এখানে অপ-প্রয়োগ। কাঁচা সঙ্কোচ আবার কি? সন্দীপ কি কাঁচাদের অর্থাৎ তরুণদের সঙ্কোচের কথা বলিতেছে? তরুণদের সঙ্কোচ থাকে, এই নূতন শুনিলাম। সন্দীপ নিজের মনের সঙ্কোচটা তরুণদের ঘাড়ে চাপাইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ ওখানটায় বেড়ে সাইকলজি দেখাইয়াছেন—বৃদ্ধ সন্দীপ নিজে যেখানটায় জোর পাইতেছিল না, সেখানটায় সে নিজের প্রতি দোষারোপ না করিয়া কাঁচাদের ঘাড়ে দোষ চাপাইল। তোমরাও ঠিক তাই করিতেছ। নিজেদের সৃষ্টির ক্ষমতা নাই, যাহারা স্রষ্টা তাহাদের ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া বিনা-পয়সায় ইয়াকি দিয়া লইতেছ। তোমাদের উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়াছি।

হাঁ, রবীন্দ্রনাথের কথা হইতেছিল। শুনিয়াছ কি, রবীন্দ্রনাথ 'বেদে' বইটা সম্বন্ধে একটা মস্ত সার্টিফিকেট দিয়াছেন? দেখিতেছি, আমাদের কাগজে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইণ্টারভিউ'টা ছাপাইয়া ভাল কাজ করিয়াছি। রবীন্দ্রনাথ যেই শুনিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র 'বেদে'র প্রশংসা করিয়াছেন, তিনিও অমনই কলম লইয়া বসিলেন, আমিই কি কম! রবীন্দ্রনাথ নাকি বলিয়াছেন, অচিন্ত্যকুমারের প্রতিভা আছে। ইহার পর তাঁহাকে কোন্ দিন বলিতে শুনিব, শেক্স্পীয়ারেরও প্রতিভা আছে। বাপু হে, প্রতিভা কি এই প্রথম দেখিতেছ? 'গাব আজ আনন্দের গান' পড় নাই? I sing the Body-Electric-এর বাবা। তুমি কি কখনও অমন ইন্‌টেন্‌সিটি-ওয়ালা কবিতা লিখিতে পারিয়াছ? সবে-ধন-নীলমণি তো ওই এক লাইন—'অচেতন হয়ে গেল অসহ্য পুলকে!' যে আনন্দে বিন্দু বিন্দু রক্তপাতে সন্তানের বীজ তৈয়ারি হয়, তাহার কথা কখনও লিখিয়াছ?

রবীন্দ্রনাথ নাকি সার্টিফিকেটটা ছাপাইতে অনুমতি দেন নাই।

ইহাকে কি বলিব? বিশেষণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। সার্টিফিকেট দেওয়ার দরকার কি ছিল? কই, স্বর্গীয় বঙ্কিম তো মানা করেন নাই! আর দুঃখ হয় অচিন্ত্যকুমারের জন্য। তিনি নাকি 'কল্লোল'-অফিসের ভাঙা বেঞ্চের উপর চিত হইয়া শুইয়া রবীন্দ্রনাথের প্রশংসাপত্রখানি বুকে করিয়া বলিয়াছেন, এর পর ম'রে গেলেও আমার দুঃখ নেই। কি আপসোসের কথা, কি আত্মবিস্মৃতি! যদি সত্যই তাহাই হয়, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথকে কখনও ক্ষমা করিব না।

'কল্লোলে'র কথা বলিতে মনে পড়িল, যে কয় সংখ্যায় অচিন্ত্যকুমারের 'বেদে' বাহির হইয়াছে সেই কয় সংখ্যা ডবল ছাপাইয়াও লোকের চাহিদা মিটানো যায় নাই। ইহাই কি অচিন্ত্যবাবুর যথেষ্ট সার্টিফিকেট নহে? রবীন্দ্রনাথের সার্টিফিকেট! তিনি সার্টিফিকেট দেন নাই কাকে? নাম করিবার প্রয়োজন আছে কি?

সার্টিফিকেট কাহাকে বলে? সমব্যবসায়ীরা কি একজন আর একজনকে সার্টিফিকেট দিতে পারে? না, দিলেই সেটা সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে? আমি মানুষকে চিনি। মানুষ মানুষই, দেবতা নয়। তোমার বইখানি বেশি বিক্রয় হইলে আমার বইয়ের কাটতি কম হইবে, এ তো স্বাভাবিক। সার্টিফিকেটের কোন মানে হয় না।

কাটতির কথা বলিয়াই লজ্জায় পড়িতেছি। এদেশে কি আবার বইয়ের কাটতি আছে? না, কেউ বই পড়ে? দিলীপের 'মনের পরশে'-র কয়টা সংস্করণ হইয়াছে, আর 'বেদে'র? শিবরামের 'ছেলে বয়সে' বিলাতে ছাপা হইলে এতদিনে ওয়ান হান্‌ড্রেড থাউজ্যাণ্ড্‌থ ইম্প্রেশন হইয়া যাইত। খবর রাখ কি, ওই বইখানি কয় কপি বিক্রয় হইয়াছে? আমি নিজে এক কপি কিনিয়াছি, সকল ভাল বহিই আমি কিনিয়া থাকি। আমার লাইব্রেরিটা ভাল। একদিন দেখিয়া যাইও।

এ দেশের লাইব্রেরিগুলি দেখিলে মায়া হয়। লোকে নিয়মিত চাঁদা দেয় না। যাহারা চাঁদা দেয়, তাহারা বই সরাইবার যম। আর বই ক্ল্যাসিফিকেশনের নিয়ম অত্যন্ত সেকেলে। একবার একটা নাম-করা লাইব্রেরিতে নম্বর দিয়া বইয়ের নাম লিখিয়া আমি জোলা'র 'পাইপিং হট' বইখানি চাহিয়াছিলাম, তিন ঘণ্টা অনুসন্ধানের পর বেয়ারা নম্বর মিলাইয়া যে বইখানি লইয়া আসিল তাহার নাম 'আউটলাইন অব হিস্ট্রি' —এইচ. জি. ওয়েল্‌সের লেখা। দুইটাই উপন্যাস, এইটুকু যা মিল।

এইচ. জি. ওয়েল্‌সের একখানা নূতন বহি বাহির হইয়াছে, পড়িয়াছ কি? নামটা মনে নাই। সুরেশ ভায়া 'টাইম্‌স লিটারারি সাপ্লিমেণ্টে'র গ্রাহক। উহাতে বইখানার প্রশংসা পড়িয়াছিলাম। উহাদের প্রশংসার দাম আছে। সেদিন আপ্‌টন সিন্‌ক্লেয়ারের 'অয়েল' বইখানার প্রশংসা দেখিয়া একখণ্ড কিনিয়া আনিয়াছি। বিরাট বই, কিন্তু বড্ড ছোট টাইপ, পড়া যায় না।

আচ্ছা, ছোট টাইপে বই ছাপানোর মানে কি? তুমি তো ছাপাখানায় কাজ কর, আমাকে ইহার জবাব দিতে পার? যে বই লোকে পড়িতে চায়, তাহা ছোট টাইপে ছাপা কেন? যে সব বই লোকে পড়ে সেইগুলিই ছাপা হয় ছোট টাইপে, আর যে সব বই লোকে শুধু ঘর সাজাইবার জন্য রাখে, নির্দিষ্ট সংখ্যাগুলি বড় বড় অক্ষরে ছাপানো হয়। ননসাচ প্রেস দান্তের মহাকাব্যখানি কি চমৎকার ছাপিয়াছে! দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। কিন্তু বইখানি পড়িবার জন্য নহে, পড়িতে গেলেই হাতের ময়লা লাগিবে। আর ময়লা লাগিয়াছে কি, যাহার বই সে বলিবে, 'বর্বর'! বইয়ের দামও নাকি উহাতে কমিয়া যায়। ঠিকমত রাখিতে পারিলে পঞ্চাশ গিনির বই ভবিষ্যতে দুশো গিনি পর্যন্ত দাম উঠিতে পারে। কিন্তু যে কেনে, তাহার ভাগ্যে ওই

দাম জোটে না, নাতিনাত্নীদের উপকার হয়। তালগাছ লাগানোর মত ব্যবসা আর কি!

তালগাছের সাহায্যে জার্মানি আজকাল ভাল কাগজ তৈয়ারি করিতেছে। আশ্চর্য নয় কি? জার্মানরা অদ্ভুত জাত। উহারা পারে না এমন কাজ নাই। শুনিলাম, কৃত্রিম ডিম তৈয়ারি করিয়া কৃত্রিমভাবে তা দিয়া তাহা হইতে অকৃত্রিম মুরগী হাঁস প্রভৃতি বাহির করিতেছে। পন্থাটা এ দেশে চলিলে ভাল হয়। মিয়ার দোকানে কাটলেট করে ভাল, কিন্তু একটার দাম তিন আনা, তাও আবার তিনখানার কম একসঙ্গে বিক্রয় করে না। সপ্তাহে একদিন মাত্র খাইতে পারি।

বুড়া মিয়া মরিবার পর দোকানটা দুই ভাগ হইয়াছিল। শুনিলাম, দুটিতে নাকি আবার জোড়া লাগিয়াছে। মিয়ার দোকানেই সেদিন বসন্তের সঙ্গে দেখা হইল। খুব মোটা হইয়াছে। কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তাহার বিবাহ হইয়াছে। আমাদের অতুল ভায়ার একটা বিবাহ দিলে কেমন হয়, দিনে দিনে ও যেরূপ রোগা হইতেছে, আমার ভয় হয়।

মোটের উপর তোমরা কাজটা ভাল করিতেছ না, 'শনিবারের চিঠি' তুলিয়া দাও। রামে মারিলেও মরিবে, রাবণে মারিলেও মরিবে; বাংলা সাহিত্যকে কেহ বাঁচাইতে পারিবে না, নহিলে অচিন্ত্যকুমারকে সার্টিফিকেট দিয়া রবীন্দ্রনাথ তাহা ছাপিতে নিষেধ করেন। মোটের উপর গতিক ভাল নয়।

আদালত-প্রসঙ্গে ঢেকচাঁদ

গরিবের কথা বাসী হইলেই মিষ্ট লাগে। অনেক আগেই তোমাদিগকে সাবধান করিয়াছিলাম, একটু রাখিয়া-ঢাকিয়া, একটু হুঁশিয়ারির সঙ্গে চলিলেই কোন গোল বাধিত না। কেমন, এখন হইল তো? পঞ্চাশ টাকাই বা আসে কোথা হইতে? বিনা কমিশনের দুশো-খানা কাগজ বিক্রয় করিলে তবে পঞ্চাশটা টাকা আসে। যাক, তবু টাকার উপর দিয়া গেল। জেলে যে যাও নাই, সেটা নেহাৎ ভাগ্য বুঝিতে হইবে।

কাগজে দেখিলাম, তোমরা নাকি আদালতে বলিয়াছ যে, সমাজ ধর্ম সাহিত্য ইত্যাদির বুকে যে সকল ফাঁকি-জুয়াচুরি চলিতেছে, তাহা ধরাইয়া দেওয়াই তোমাদের উদ্দেশ্য। সাধু উদ্দেশ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল ফাঁকি ও জুয়াচুরি তোমরা আগে নিজেরা সৃষ্টি করিয়া পরের স্কন্ধে চাপাইয়া পরে সেগুলি ধরাইয়া দিবার ভান করিতেছ, এ কথা তো প্রকাশ করিয়া বল নাই। যাহা হউক, ধর্মের কল আপনিই নড়িয়াছে। এখন মুখে চুন-কালি মাখিয়া পরোপকার করিতে থাক। বাপু হে, আগেই বলিয়াছিলাম, বাড়াবাড়ি জিনিসটা ভাল নয়।

একটা শক্ত কথা বলিয়া ফেলিলাম। জুয়াচুরি ও ফাঁকি তোমরা সৃষ্টি কর, এ কথাটা অপবাদের মত শুনাইল। শক্ত হইলেও কথাটা সত্য। জানই তো, মিথ্যা লইয়া আমি কারবার করি না। প্রমাণ চাও? শ্রদ্ধেয় শরৎচন্দ্র লিখিলেন, চুম্বন-আলিঙ্গনের ধার দিয়াও তিনি যান নাই; তোমরা খানকতক চুম্বন আলিঙ্গন সৃষ্টি করিয়া তাঁহার কাঁধে চাপাইয়া তাঁহার নিন্দা করিলে। নরেশবাবুর ভাষার তিনি প্রশংসা করিলেন, অমনই তোমরা ঝুড়ি ঝুড়ি কুৎসিত ভাষা সৃষ্টি করিয়া

মহেশবাবুর নামে বাজারে চালাইয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিলে। প্রমথ-বাবুকে কি করিয়াছ, তাহা আর কাহারও অবিদিত নাই। এমনও, একটা মিথ্যা চরিত্র সৃষ্টি করিয়া তাহাই প্রমথবাবুর চরিত্র বলিয়া প্রচার করিলে। প্রমথবাবু যে কবিতা লিখিয়াছিলেন, এ কথা কখনও শুনি নাই, তোমরা 'সনেট পঞ্চাশৎ' নামে একখানা মোটা বই সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে লইয়া খুব রসিকতা করিলে। তাঁহার পাণ্ডিত্যের গলদ দেখাইবার জন্য সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে কতকগুলা অতি মোটা ভুল সৃষ্টি করিয়া, তাহা প্রমথবাবুর ভুল বলিয়া নিজেদের পাণ্ডিত্য জাহির করিলে। চারুবাবুর চোর-অপবাদ সম্পূর্ণ তোমাদের সৃষ্টি; যে সকল ভাষার ভুল, কুৎসিত কথা, জঘন্য গল্প চারুবাবুর নামে চালাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের বাহাদুরি আছে স্বীকার করি; কিন্তু তোমরা যে কি চীজ তাহা ভাবিয়াও ভয় পাই। দীনেশবাবুর জীবন-চরিত বলিয়া যাহা খাড়া করিয়াছ, কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন লোকমাত্রেই বুঝিতে পারিবেন যে, কোনও অবিকৃত-মস্তিষ্ক ব্যক্তির জীবন-চরিত উহা হইতেই পারে না। নকুড় ঠাকুরের আশ্রম সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে চাহি না। সহৃদয় ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট এ বিষয়ে তৎপর হইয়াছেন। তরুণ সাহিত্যিকদের আর্ট সৃষ্টি বলিয়া 'মণিমুক্তা' নাম দিয়া যে বীভৎসতার বিষ এতকাল ছড়াইয়া আসিয়াছ, সেগুলি যে কাহার সৃষ্টি তাহা আজ আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। পরের নামে তোমরা পুলিসের চোখে ধূলা দিয়াছ, এজন্য অবশ্য তোমাদিগকে বাহাদুরি দিই। শুনিতেছি, সম্প্রতি তোমরা রবীন্দ্রবাবুকে লইয়া পড়িয়াছ। তোমাদের স্বকপোলকল্পিত কতকগুলি দোষ তাঁহার স্কন্ধে চাপাইয়া তাঁহাকে দেশের লোকের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করিতে চাও। তোমাদের কি ধারণা যে, দেশের লোক সকলেই শুধু ঘাস খাইয়া জীবনধারণ করে? উপরোক্ত সবগুলি ব্যাপারই যে তোমাদের

নিজেদের কীর্তি তাহা জানিতে কাহারও বাকি নাই। বাংলা দেশে কোন্ প্রকৃতিস্থ মানুষ বিশ্বাস করিতে পারে যে, বি. এ. ক্লাসের ছাত্র শ্রীমান বুদ্ধদেব বসু, "রজনী হল উতলা", "চাঁদ", "সাড়া", "ভূত", "অভিনয়" প্রভৃতি গল্প; "রমণী-রমণ-রণে পরাজয় ভিক্ষা মাগি", "কটুগন্ধ অন্ধকারে ডুবিলাম বিধাতার মেলা" ও ছোট ননদীকে পাঠানো বিষয়ক কবিতা লিখিয়াছেন? কোন্ মূর্খ বিশ্বাস করিবে যে, শ্রীমান অচিন্ত্যবাবু, 'বেদে', 'বিবাহের চেয়ে বড়ো' প্রভৃতি গল্প ও "বিন্দু বিন্দু রক্তপাতে" সন্তান গড়ার কবিতা লিখিতে পারেন? সুরেশ চক্রবর্তী মহাশয়কে যাঁহারা জানেন তাঁহারা বলিতে পারিবেন, তাঁহার পক্ষে রমণীর 'বস্ত্রহরণ' করাটা কত বড় অসম্ভব ব্যাপার। নরেন্দ্রবাবু সংকায়স্থের সন্তান, তাঁহার কাজিনের অভাব নাই, তিনি কখনও কাজিনে কাজিনে প্রেমের বান ডাকাইতে পারেন? অক্ষম স্বামী যুবতী পত্নীকে সন্তানলাভের জন্য অন্য পুরুষের সহবাস করিতে ইঙ্গিত করিতেছে, এই গল্প জলধরদাদার 'ভারতবর্ষে' বাহির হইয়াছে, ইহাও কি বিশ্বাস করিতে হইবে? তোমরা পিশাচ, তোমরা ভণ্ড, তোমরা জুয়াচোর, শয়তানের অবতার। তোমাদিগের উপযুক্ত গালি আমার অভিধানে নাই।

আর কতকাল এই ব্যবসা চালাইবে, জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি? এই যে ঘরের খাইয়া মনগড়া বনের মোষ তাড়াইতেছ, ইহাতে কিছু লাভ হইতেছে? অশ্লীলতার অপবাদ দিয়া যাহাদিগকে অপদস্থ করিতে চাহিয়াছিলে, তাহারা তরতর করিয়া ধাপে ধাপে যশের সিঁড়িতে উঠিতেছে; শাস্তি পাইতে তোমরাই পাইলে! ভগবানের মার ঠেকাইবে কেমন করিয়া? মিথ্যা রটাইয়া যাহাদিগকে হেয় করিতে চাহিয়াছিলে, দেশের লোক তাঁহাদিগকে কিরূপ শ্রদ্ধা করে, তাহা কি

চোখ মেলিয়া দেখিয়াছ? চারুবাবু তোমাদের সকল নিন্দাবাদে বাম্পদের আঘাত করিয়া ঢাকায় অধ্যাপনা করিতেছেন। শুনিয়াছি, তাঁহার মাহিনা বৃদ্ধি হইয়াছে। তাঁহার সুবিপুল যশের কণামাত্রও তোমরা গ্রাস করিতে পার নাই। নরেশবাবু এই সেদিনও তোমাদের নাকের উপর মাজু-সাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্য-শাখার সভাপতি হইয়া আসিলেন; তিনি বাংলা লিখিতে জানেন না, তাঁহার সকল লেখা কুৎসিত মনোবৃত্তির পরিচায়ক—বারংবার এই সকল মিথ্যা উক্তির ফল হইল কি? দীনেশবাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলার কর্ণধার হইয়া আজিও বিরাজ করিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের অভাবে সাহিত্য-সম্মেলনের সভাপতিত্বে তোমাদের কাহাকেও না ডাকিয়া তাঁহাকেই ডাকা হইয়াছিল। মিথ্যা-প্রমাণ-প্রয়োগে তাঁহাকে উন্মাদ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা কি সার্থক হইয়াছে? 'বিচিত্রা', 'ভারতবর্ষ' প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর মাসিকপত্র বুদ্ধদেববাবু প্রভৃতির লেখা যত্ন করিয়া ছাপিয়া তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান দিতেছেন, তোমাদের আন্দোলন তাঁহাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই।

মোটের উপর, তোমরা ভাল কাজ করিতেছ না। এখনও সাবধান হইবার সময় আছে। হাতে অন্য কাজ না পাও, পাটের চাষ নিবারণেও তো সাহায্য করিতে পার।

পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ!

দেখ, তুমি একটা অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছ। জানিয়া শুনিয়া কর নাই, ইহাই বিশ্বাস হইতেছে, কিন্তু তবু এরূপ ভুল হওয়া দোষের। একটু বুদ্ধি-বিবেচনা প্রয়োগ করিলেই ভবিষ্যতে এরূপ ভুলভ্রান্তির হাত হইতে রক্ষা পাইতে। সামান্য একটু বিবেচনার অভাবে পৃথিবীতে কত অঘটন ঘটিয়াছে, তাহার হিসাব রাখ কি? ধর," দণ্ডকারণ্যে শ্রীমতী সীতা তাঁহার মগজস্থিত বুদ্ধিবৃত্তির কিঞ্চিৎ পরিচালনা করিয়া যদি দেখিতেন, সোনার হরিণের অস্তিত্ব নিতান্তই প্রকৃতিবিরুদ্ধ, কোথাও কিছু গোলযোগ নিশ্চয়ই আছে, তাহা হইলে অমন লঙ্কা-কাণ্ডটি আর ঘটিত না এবং শ্রীযুক্ত বাল্মীকির মত মহাকবি সামান্য বউচুরির মকদ্দমায় নিজেকে না জড়াইয়া দুই-একটা প্রাণ-মাতানো সাইকলজিক্যাল উপন্যাস রচনা করিয়া যাইতে পারিতেন। মহাভারত, ইলিয়াড ওডিসী সর্বত্রই এরূপ একটা ভুলের কারসাজি দেখা যায়। অত দূরে যাইবার প্রয়োজন নাই, এই সেদিন যে পত্রে তোমাকে স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর আসল কারণ নির্দেশ করিয়াছিলাম, তাহাতেই দেখিতে পাইবে যে, বুদ্ধিমান বঙ্কিম যদি মাথা স্থির রাখিয়া অচিন্ত্যবাবুর 'বেদে' বইখানি উপন্যাস-হিসাবেই দেখিতেন, তাহা হইলে তাঁহাকে অকালে হার্ট-ফেল করিয়া মরিতে হইত না; চাই কি, তিনি মৃত্যুর পূর্বে 'বেদে'র মত এক-আধখান যুগান্তকারী উপন্যাসও বাংলা-সাহিত্যকে উপহার দিয়া যাইতে পারিতেন।

'বেদে' বলিতে মনে পড়িল, পরম্পরায় শুনিলাম, তোমরা নাকি 'বেদে' বইখানি লইয়া অনেক ব্যঙ্গ-ইয়ার্কি করিয়াছ! কথা সত্য হইলে, মর্মান্তিক। এরূপ ভাল জিনিসকে উপহাস যাহারা করে, রবীন্দ্রনাথ তাহাদের সম্বন্ধে কি শাস্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন, জান? জানিবেই বা

কেমন করিয়া ? ভাল জিনিস তো কখনই পড়িলে না। নিজেরা না হয় জান না, কিন্তু যাহারা জানে তাহাদের কাছে পরামর্শ লইবার মত বিনয়ও তো থাকা চাই। টেনিসনের 'ডি প্রোফাণ্ডিস' নামক সুবিখ্যাত কবিতার প্যারডি করিয়া কে একজন 'ডি রোটাণ্ডিস' নামে একটা ব্যঙ্গ-কবিতা ছাপাইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, সেই ব্যক্তির ধোবা-নাপিত বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। শুনিয়াছি, তোমরা রবীন্দ্রনাথ ও অচিন্ত্যকুমার এই দুই বিখ্যাত কবির অনেক ভাল ভাল কবিতাকে একটু এদিক-ওদিক করিয়া ইতরজনের ইতরামির অনেক খোরাক যোগাইয়াছ, তবু তোমাদের কাগজটা বন্ধ হইল না। লোকে পয়সা দিয়াই কেনে নিশ্চয়, কারণ আমাকেই যখন তোমরা অমনই পাঠাও না, অন্য কাহাকেও বিনামূল্যে কাগজ বিলি কর—এরূপ বিশ্বাস করিয়া নিজেকে অপমান করিতে চাহি না। শুনিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ তোমাদের উপর চটিয়াছেন, চটিবারই তো কথা। তাঁহার অমন ভাল ভাল লেখাগুলিকে তছনছ করিবে, আর তিনি চুপ করিয়া সহ্য করিবেন, এরূপ আশা করা অন্যায়।

এ সকল দুর্মতির শাস্তিও তো পাইতেছ শুনিলাম। আমাকে খবরটা দেওয়ারও প্রয়োজন বোধ কর নাই! বড় অহঙ্কার হইয়াছে, না? এলোপাথাড়ি সকলকে চটাইতে থাকিবে, এমনটি হইবে, ইহা তো খুবই স্বাভাবিক। কথাটা শুনিলাম, তোমাদের কে এক সাহিত্যিক, শ্রীবিষ্ণুদের মুখে। ছেলেমানুষ, কিন্তু কি বিনয়ী! ছোকরা বলিল, সে 'ধূপছায়া' 'প্রগতি' 'কল্লোল' প্রভৃতি অনেক কাগজেই লিখিয়া থাকে। অথচ তোমাদের প্রতিও খুব টান আছে। সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে জানাইতে আসিয়াছিল যে, তোমাদের এই রকম একটা বিপদ ঘটিয়াছে; সবিশেষ বেদনা পাইয়াছে মনে হইল।

এমনটি আমিও আশঙ্কা করিয়াছিলাম। খবর লইয়া জানিলাম,

অনেকেই বেশ খুশি হইয়াছেন; খুশি না হইবার কারণ নাই। তরুণ লেখকেরা নাকি খবরটা শুনিয়া গঙ্গাস্নান পর্যন্ত করিয়া আসিয়াছিল। শুনিয়া একটা কথা ভাবিয়া একটু অবাক হইলাম। "সাহিত্যে অশ্লীলতা" বলিয়া একটা ব্যাপার তাহা হইলে তাহারাও মানে দেখিতেছি। তোমরা তো দেখি আমাকে ভুল বুঝাইয়াছিলে। আমি তো বরাবরই বলিতাম যে, যেখানে আর্ট ফর্ আর্ট'স সেক, সেখানে কুৎসিততম লেখাতেও দোষ হয় না। তোমাদের সকল লেখা নাকি উদ্দেশ্যমূলক, তোমরা অশ্লীলতা ন্যাকামি প্রভৃতির উচ্ছেদ চাও। সেখানে আর্ট ক্ষুণ্ণ হয়, সুতরাং লেখা অশ্লীল হইতে বাধে না। দৃষ্টান্ত চাও? বুদ্ধদেববাবুর 'টান' গল্পটাই ধর। বারবনিতালয়ের একটা বীভৎস চিত্র লেখক আঁকিয়াছেন, কিন্তু আর্ট বজায় আছে বলিয়া লেখাটা অশ্লীল হয় নাই। নায়ক হারানো প্রেয়সীর খোঁজে বাহির হইয়াছে। স্বভাবতই তাহাকে বেনামী-বন্দরে সন্ধান করিতে হইবে। খুঁজিতে খুঁজিতে সে যাহার নিকট গিয়া উপস্থিত হইল, ম্লান দীপালোকে তাহাকেই তাহার হারানো প্রিয়া বলিয়া ভ্রম হইল। দরদস্তুরটা আনুষঙ্গিক, আর্টেরই অঙ্গ। তারপর সেই লিকলিকে হাতের বর্ণনা, জামার বোতাম ছেঁড়া এবং অবশেষে স্বপ্নভঙ্গ। সমস্ত ব্যাপারটার মধ্যে একটা সুষ্ঠু কল্পনার পরিচয় পাই। তোমার চেঁচাইলে কি হইবে, ও লেখা অশ্লীল হইতেই পারে না।

তোমরা এই জায়গাটাই তোমাদের কাগজে তুলিয়া এই লেখাটার লাঞ্ছনা করিতে চাহিলেই তোমাদের লেখাটা অশ্লীল হইয়া পড়িবে, কারণ, তখন একটা উদ্দেশ্য আসিয়া পড়িতেছে; আর্ট ফর্ আর্ট'স সেক হইতেছে না। বুঝিতেছি, তোমরা এই রকম একটা কিছু করিয়া থাকিবে। যদি আবশ্যক মনে কর, সঠিক সংবাদটা দিতে ভুলিও না।

লোকে বলে, তোমরা লেখ ভাল। শুনিয়াছি, রবীন্দ্রনাথও নাকি একবার তোমাদিগকে কি সার্টিফিকেট দিয়াছিলেন। প্রাণকান্তবাবুর মুখে শুনিয়াছি, সেজন্য তিনি নাকি এখন লজ্জিত আছেন। তা হোক, তোমরা যে ভাল লেখ তা অনেকেই অস্বীকার করে না। এমন করিয়া ট্যালেণ্ট নষ্ট করিতেছ কেন? গল্প, উপন্যাস, প্রেমের কবিতার এখনও যথেষ্ট অভাব আছে। মাসে মাসে একটা উপন্যাস ছাড়, পয়সা ও যশ দুইই হইবে। বালির বাঁধ দিয়া নদীর স্রোত রোধ করিবার ইচ্ছা যদি করিয়া থাক, তাহা হইলে আমার কিছু বলিবার নাই। 'প্রগতি' উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু 'ভারতবর্ষ'কে ঠেকাইবে কি করিয়া! 'বিচিত্রা' কাগজটি আমি অমনই পাই। 'বিচিত্রা' দেখিয়াছ তো? এরূপ ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া লাভ কি?

গল্প উপন্যাস না আসে, ওমর খায়েমের অনুবাদও তো করিতে পার। বাংলায় ওটা একটা মস্ত ফীল্ড, তবে দাড়িওয়ালা ওমরের ছবি দিতে ভুলিও না। নরেন দেবের 'ওমর খায়েম'খানা দেখিয়া লইও। তা ছাড়া মেঘদূত, গীতগোবিন্দ এসবও তো আছে। লিখিবার বিষয়ের অভাব কি?

এত সব কথা তোমাকে লিখিতাম না। আজ ট্রামে করিয়া ভবানীপুর যাইতেছিলাম, হঠাৎ রাস্তায় দেওয়ালে দেওয়ালে দেখিলাম, ছোট বড় সাইজে, "পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ!"—এই বিজ্ঞাপন দেওয়া হইয়াছে। আমার কেন জানি না মনে হইল, তোমাদের কোনও হিতৈষী তোমাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্যই এই বিজ্ঞাপন দিতেছে। তোমাদের পথ চলিবার ক্ষমতা আছে, শুধু পথ হারাইয়াছ মাত্র। একটি কপালকুণ্ডলার খোঁজ রাখিও। এমনিতে না পাও, 'কল্লোলে'র আড্ডায় যাও, সন্ধ্যার দিকে এম. সি. সরকারের দোকানে হাজির হাও এবং সুবিধা

পাইলে শিশির ভাদুড়ীর নাট্য-মন্দিরে প্রত্যহ বাজি আটটার সময় শান্তভাবে বসিয়া থাকিত। এই সকল স্থানেই সৎসাহিত্যের জন্ম, আর্টের উৎপত্তি। কালিদাস রায়ের আড্ডাতেও যাইতে বলিতে পারিতাম, কিন্তু তাহারা লোক ভাল নয়। বেনামীতে পরিচিত লোককেও গালি দেয়।

যাক্, আসল কথাটাই ভুলিয়া যাইতেছি। না জানিয়া একটা অন্যায় করিয়া ফেলিয়াছি। গতবারের চিঠিটা ছাপানোর মতলবই যদি ছিল, বসন্তের মোটা হওয়ার কথাটা বাদ দিলেই পারিতে। তাহার স্ত্রী না-কি এইজন্য কুরুক্ষেত্র করিতেছে। সাহিত্য করিতে গেলেও মাঝে মাঝে সাধারণ বুদ্ধির প্রয়োজন হয়।

'আনন্দমঠ'-প্রসঙ্গে টেকচাঁদ

গত ১লা আশ্বিন শুক্রবার, সন্ধ্যা আন্দাজ সাতটা হইবে, কোলাঘাটে মাসীর বাড়ি যাইতেছিলাম। সেখানে পরদিন কি কারণে জানি না, একটা বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। মায়ের মন রাখিতে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেখানে যাইতেছিলাম। পূর্বদিন সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্সি কলেজে বঙ্কিম-শরৎ-সমিতিতে শরৎচন্দ্রকে যে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে শরৎচন্দ্র যাহা পাঠ করেন, তাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি কিঞ্চিৎ বিরুদ্ধ ভাবই প্রকাশ পাইয়াছিল। মনটা ভাল ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র মৃত, নিজের পক্ষ সমর্থন করিতে সম্পূর্ণ অপারগ। বাঁচিয়া থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই ইহার একটা উপযুক্ত জবাব দিতেন। ইচ্ছা হইতেছিল, আমিই তাঁহার হইয়া একটা জবাব লিখিয়া ফেলি। অনেকগুলি চোখা চোখা কথাও মনে আসিয়াছিল। কিন্তু মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইতে গিয়া জীবিতকে চটাইতে সাহস হইতেছিল না। কি জানি!

অপ্রসন্ন মনে ট্রেনে চাপিয়া কোনও দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া সদ্য-খরিদ-করা 'বঙ্গবাণী'খানা পড়িতে বসিলাম। দূর ছাই! বড় বড় অক্ষরে সেই কালিকার বঙ্কিম-শরৎ-সমিতির অভিনন্দন-ব্যাপারটা বিবৃত হইয়াছে। কাল হয়তো ভুল শুনিয়া থাকিব—দেখাই যাক না, ইত্যাদি ভাবিয়া শরৎচন্দ্রের বক্তৃতাটি আবার পড়িলাম। না, ভুল হয় নাই। স্পষ্ট ছাপার অক্ষরে লেখা—

> "কিন্তু একটা কথা রবীন্দ্রনাথ বলেন নি। বঙ্কিমের ন্যায় অতবড় সাহিত্যিক প্রতিভা যিনি তখনকার দিনে (?) বাংলা

ভাষার নবরূপ নবকলেবর সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন, 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—বঙ্গসাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ দুটি যিনি বাঙালীকে দান করতে পেরেছিলেন, কিসের জন্ত তিনি কথা-সাহিত্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করে আবার 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' লিখতে গেলেন? প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে স্বকীয় মত প্রচার তো তাঁহার কাছে কঠিন ছিল না। আশা আছে রবীন্দ্রনাথ হয়তো কোন দিন এ সমস্তার মীমাংসা ক'রে দেবেন।"

শরৎচন্দ্রের হঠাৎ এতটা রবীন্দ্র-ভক্তি দেখিয়া বিস্ময় জাগিলেও একটা কারণ খুঁজিয়া পাইয়াছিলাম। যিনি জীবনে একখানিও উপন্তাস বা গল্প কোনও উদ্দেশ্ত প্রণোদিত হইয়া লেখেন নাই, এমন কি, অর্থসংগ্রহের উদ্দেশ্ত লইয়া যিনি আজ পর্যন্ত এক লাইনও লিখিতে সক্ষম হইলেন না, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্তাসে দেশভক্তি ইত্যাদি প্রচারের উদ্দেশ্ত খুঁজিয়া পাইয়া ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হওয়া তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। 'পথের দাবী', 'শেষ প্রশ্ন', 'বামুনের মেয়ে', 'দত্তা' প্রভৃতি পড়িয়া কেহ বলুক তো, নিছক রসসৃষ্টি ছাড়া তাঁহার অন্ত কোনও উদ্দেশ্ত ছিল! শরৎবাবু যে কোনও উদ্দেশ্তমূলক লেখা লেখেন না, শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় ও সতীশ মুখোপাধ্যায় তাহার সাক্ষ্য দিতে পারিবেন।

শরৎবাবুর এই বক্তৃতাটিও সম্পূর্ণ উদ্দেশ্তহীন অর্থাৎ নিছক আর্ট। তাঁহার জন্মের ও তদ্রচিত পুস্তক প্রকাশিত হইবার পরও যে হতভাগ্য বাংলা দেশ বস্তাপচা মৃত বঙ্কিমকেই সাহিত্য-সম্রাট বলিয়া সেলাম করিয়া থাকে, সে তো এ দেশ নিতান্তই কর্তাভজার দেশ বলিয়া। নতুবা আজকালকার উচ্চ-ইংরেজী বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রও বঙ্কিমের চাইতে ভাল বাংলা লিখিয়া থাকে, তাঁহার ভাষা এক হাস্তোদ্রেক ছাড়া আর কিছুই করে না। এহেন বঙ্কিমচন্দ্রকে হীন

প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্য শরৎচন্দ্রের থাকিতেই পারে না—বিশেষত সে 'তখনকার দিনের কথা'।

অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই এমনিতর বহু প্রশ্ন ও তাহার উত্তর মনের ভিতর খেলিয়া গেল। মনে মনে শরৎচন্দ্রকে গালি দিয়া মনের ভার অনেকটা হালকা হইল।

'বঙ্গবাণী'খানা পড়িতে পড়িতেই মগজের ভিতর একটা তোলপাড় হইয়া গেল, লঘুতর মন লইয়া আশেপাশে চাহিয়া দেখিবার অবসর হইল। দেখিলাম, একটি নাতিস্থূল প্রৌঢ় গৌরবর্ণ ভদ্রলোক পিছনের বেঞ্চি হইতে আমার কাঁধের উপরে গলা বাড়াইয়া আমার হস্তস্থিত 'বঙ্গবাণী'র পাতায় দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছেন। ভাবিলাম, কোনও শরৎ-ভক্ত হইবেন, ভারি বিরক্তি বোধ হইল। কোনও কিছু না ভাবিয়াই কাগজটি উল্টাইয়া কোলের উপর রাখিলাম। ভদ্রলোকের মুখে একটু কৌতুকের হাসি খেলিয়া গেল। বলিলেন, কাগজ পড়িয়া আপনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন বোধ হইতেছে। কোথাও কিছু অঘটন ঘটিয়াছে কি ?

রূঢ়কণ্ঠে বলিলাম, আরে না মশায়, কারও পৌষ মাস, কারও সর্বনাশ! চোখ আছে দুটো আপনার ?

নিজের গলার কর্কশতায় নিজেই চমকিয়া উঠিলাম। সেই কামরায় আর দুইজন মাত্র অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক ছোকরা একটা কোণ ঘেঁষিয়া বিশ্রম্ভালাপ করিতেছিল। আমার কণ্ঠস্বরে চমকিত হইয়া আমার দিকে তাহারাও একবার চাহিয়া দেখিল।

আমি একটু অপ্রতিভ হইয়া কহিলাম, হাসির ব্যাপার নয় মশায়, দিনে দিনে এ কি হতে চলল ? শরৎচন্দ্রের মত প্রবীণ সাহিত্যিক বলছেন কিনা 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' সাহিত্য-সৃষ্টিই নয়! আবার রবীন্দ্রনাথের দোহাই দিয়েছেন। রাগ হয় না ?

এতক্ষণে ভদ্রলোকের মুখের দিকে চাহিবার অবকাশ পাইলাম। মুখখানা নিতান্ত চেনা-চেনা বোধ হইল। বলিলাম, আপনাকে কোথায় দেখেছি যেন!

তিনি কহিলেন, আপনার মুখটিও আমার সম্পূর্ণ অপরিচিত নয়। আমাকে চেনা-চেনা বোধ হওয়া খুবই স্বাভাবিক। মাসিক পত্রিকাগুলি—

ও! আপনার বুঝি এজেন্সি আছে? তাই হবে, কোনও কাগজের অফিসেই দেখে থাকব।

ভদ্রলোক একটু গম্ভীর হইলেন। একটু অন্যমনস্ক থাকিয়া বলিলেন, শরৎবাবু ঠিকই বলিয়াছেন। আমিও কাল সেই সভাস্থলে উপস্থিত ছিলাম। শরৎবাবুর বক্তৃতা শুনিয়া তাঁহার প্রতি অপরিমেয় শ্রদ্ধা জাগিয়াছে। এখন কোথায় চলিয়াছি জানেন? শরৎবাবুকে আমার শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে। অভিলাষ পূর্ণ হইবে কি না জানি না।

গতকল্য সন্ধ্যা হইতে যে মনঃপীড়া পাইতেছিলাম এবং ভিতরে গুমরিয়া গুমরিয়া বাহিরে যে গাত্রদাহ অনুভব করিতেছিলাম, এতক্ষণে যেন তাহার উপশমের একটা রাস্তা খুঁজিয়া পাইলাম। একটু ব্যঙ্গমিশ্রিত স্বরে বলিলাম, ও! তাই! শরৎবাবুর সঙ্গে তা হ'লে আপনার পরিচয় আছে?

সাক্ষাৎ-পরিচয় নাই বটে, তবে—

আপনি তাঁর ভক্ত! বেশ হ'ল, আপনার সঙ্গেই একটু বোঝাপড়া করা যাক। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' 'সীতারাম', 'দেবী চৌধুরাণী' সাহিত্য-হিসেবে সার্থক নয় কেন শুনি?

ভদ্রলোক বাহিরের অন্ধকার আকাশের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটু ধরা-গলায় বলিলেন, কারণ ঠিক জানি না। শরৎবাবু বলিয়াছেন, ইহাই যথেষ্ট কারণ নহে কি? আমরা সেকালের লোক,

সাহিত্য-বিচারের নবতম পদ্ধতিগুলির সহিত পরিচিত নহি। গল্প বা ছন্দের ধারাকে অব্যাহত রাখিয়া উপন্যাসে বা কাব্যে যে মতবাদেরই প্রচার করা যাউক না কেন, তাহাতে সাহিত্য-রস বিকৃত হয় না, আমরা এইরূপই জানিতাম। এখন দেখিতেছি, আমাদেরই ভুল। ফুল শুধু গন্ধ বিলাইবার জন্যই ফুটিবে। দৈবক্রমে যদি কবিরাজী ঔষধে সেই ফুল ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে ফুল-হিসাবে তাহার সৃষ্টি অসার্থক জ্ঞান করিতে হইবে। শুধু শরৎবাবু নহেন, কাল শুনিলাম, রবীন্দ্রবাবুরও এই মত। এ ক্ষেত্রে তাঁহাদের মতই নির্বিচারে মানিয়া লওয়া উচিত নহে কি?

আমার মাথায় রক্ত চড়িয়া গেল। উত্তেজিতভাবে বলিলাম, নিজেকে সেকেলে সেকেলে বলছেন, আমি দেখছি, আপনি তরুণস্য তরুণ। লেখার মধ্যে লেখকের যদি কোনও উদ্দেশ্য প্রকাশ পায় এবং সেই কারণে যদি রসসৃষ্টি থেকে সেই লেখাকে বরখাস্ত করতে হয়, তা হ'লে শরৎচন্দ্র এবং শুরু রবীন্দ্রনাথের কোন্ লেখাটা টেঁকে শুনি? 'পল্লীসমাজ' লেখার মধ্যে শরৎবাবুর কোনই উদ্দেশ্য ছিল না? 'দত্তা'র গূঢ় উদ্দেশ্য অত্যন্ত পরিষ্কার। 'বামুনের মেয়ে' যদি উদ্দেশ্যমূলক লেখা না হয়, তা হ'লে উদ্দেশ্যমূলক লেখা আর কি হতে পারে জানি নে। 'পথের দাবী', 'শেষ প্রশ্নে'র কথা বলতে চাই নে সত্যি কথা বললে মার খাওয়ার আশঙ্কা আছে। আর রবীন্দ্রনাথ তিনি উদ্দেশ্য ছাড়া লিখতেই পারেন না। 'গোরা', 'ঘরে বাইরে' 'বিসর্জন', 'মুক্তধারা', 'রক্ত করবী'—'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র যদি শিক্ষক এবং প্রচারক হয়ে থাকেন, তা হ'লে এইসব বইয়ে রবীন্দ্রনাথ খ্রীষ্টান পাদরিরও অধম। আর যদি ধ'রেই নেওয়া যায় যে, 'আনন্দমঠ' 'দেবী চৌধুরাণী', 'সীতারাম' প্রভৃতি 'বিষবৃক্ষ' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'

পরের লেখা এবং নিম্নস্তরের লেখা, তাতেই যা কি এসে যায়! ক্ষুধিত পাষাণ, মেঘ ও রৌদ্র, দুরাশা ও দৃষ্টিদান গল্পের লেখক রবীন্দ্রনাথ যদি বুড়া বয়সে "চিত্রকর" নামক গল্প—'প্রবাসী'তে বেরিয়েছিল—লিখতে পারেন, 'শ্রীকান্ত', 'বিরাজ বউ'য়ের শরৎচন্দ্র যদি 'শেষ প্রশ্ন' নামক আঁস্তাকুড়ের জন্মদাতা হতে পারেন, তা হ'লে 'বিষবৃক্ষে'র লেখক 'আনন্দমঠ' লিখলে অপরাধ হয় না। আসলে মানুষের যখন চক্ষুলজ্জার অভাব হয়—

ভদ্রলোক ধীরে ধীরে মাথা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, উষ্মা প্রকাশ করিয়া ফল কি? বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তিনি তো 'তখনকার দিনে'র উল্লেখ করিয়া শ্রদ্ধাই প্রকাশ করিয়াছেন। তবে আমার মনে হয়, সাহিত্যের সত্যকার মাপকাঠি তখন পর্যন্ত নির্দিষ্ট ছিল না। বঙ্কিম ভুল করিয়াছিলেন।

মনে মনে 'ভুল করিয়াছিলেন' বলিয়া একটা জবাব দিতে যাইব, দেখি, রেউলটি স্টেশনে আসিয়া পড়িয়াছি। ভদ্রলোকটি হঠাৎ ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, হাতে পঞ্চাশ বৎসরের পূর্বে প্রচলিত গ্ল্যাডস্টোন ব্যাগ, বলিলেন, যেরূপ মেঘ করিয়াছে, অন্ধকারে রাস্তা চিনিয়া শরৎবাবুর গৃহ পর্যন্ত পৌঁছানো আমার পক্ষে কষ্টকর হইবে। আমার সঙ্গে গেলে আপনার কি খুব ক্ষতি হইবে? ভাবে মনে হইতেছে, তাঁহার সহিত আপনার পরিচয়ের সৌভাগ্য আছে।

রাগত স্বরে বলিলাম, আপনি চুলোয় যান, তাতে আমার আপত্তি নেই। আমি শরৎবাবুর মুখ দেখতে চাই না।

ছিঃ!—বলিয়া ভদ্রলোকটি আমার স্কন্ধে হাত রাখিয়া দাঁড়াইতেই আমার কেমন যেন ভাববিপর্যয় ঘটিল। নিজের অজ্ঞাতসারেই ভদ্রলোকের অনুসরণ করিয়া ট্রেন হইতে নামিয়া পড়িলাম। একটু

অবাক হইতেছিলাম, বাংলা দেশের জীবিত প্রায় সকল সাহিত্যিককেই চিনিতাম, কিন্তু ইহাকে চিনি না, অথচ ভাবে মনে হইতেছে, সাহিত্যই ইহার পেশা। তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিব কি না ভাবিতেছি, দেখি, তিনি দীর্ঘায়ত দেহ লইয়া ঋজুভাবে স্টেশনের তারের বেড়া টপকাইয়া একেবারে মাঠের আলপথ ধরিলেন। আকাশে তারার চিহ্নমাত্র ছিল না। সূচীভেদ্য অন্ধকার বুঝি ইহাকেই বলে। কর্দমাক্ত, পিচ্ছিল, ঝিল্লি ও ব্যাঙের একটানা কাকলীমুখর সেই অন্ধকার মেঠো পথ দিয়া যাইতে যাইতে আমার মনের অন্ধকার দূর হইয়া গেল। প্রকৃতিকে বড় চমৎকার লাগিল। মাঝে মাঝে ভুল করিয়া আল ছাড়িয়া সদ্যকর্ত্তিত অড়হর-ক্ষেতে নামিয়া ক্ষতবিক্ষত হইতেছিলাম, তবুও ভাল লাগিতেছিল। ভদ্রলোকটি আমার ঠিক সম্মুখে একটি নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপশিখার মত অন্ধকারে ঠিক একটি রেখা টানিয়া চলিতেছিলেন। শরৎচন্দ্র ভুলিয়া গেলাম, রবীন্দ্রনাথ ভুলিলাম। মনে হইল, 'আনন্দমঠে'র সন্তান আমরা, অন্ধকার বনপথে জাতির কল্যাণ ও দেশের মুক্তির মহাউদ্দেশ্য মনে রাখিয়া যাত্রা করিয়াছি। মনে পড়িল—

"শব্দময়ী পৃথিবীর সে নিস্তব্ধ ভাব অনুভব করা যাইতে পারে না; সেই অনন্ত শূন্য অরণ্যমধ্যে, সেই সূচীভেদ্য অন্ধকারময় নিশীথে, সেই অননুভবনীয় নিস্তব্ধতার মধ্যে শব্দ হইল—"আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?""

আমার গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল, মুখ হইতে স্খলিত হইল—"আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না?"

সম্মুখবর্ত্তী ব্যক্তি চকিতে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, গম্ভীর গলায় সেই নিস্তব্ধতা মথিত করিয়া সুরসহযোগে আবৃত্তি করিতে লাগিলেন—

শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীং
ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীং
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
বন্দে মাতরম্।

সেই গম্ভীর স্বরলহরী আমার কর্ণে প্রবেশ করিয়া আমার সমস্ত দেহ স্পন্দিত করিয়া দিল। আমি থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ভূতভবিষ্যৎবর্তমান সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া যেন অনন্তের পথে সেই দীর্ঘায়ত পুরুষকে অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিলাম। আমার কণ্ঠেও ধ্বনিত হইতে লাগিল, বন্দে মাতরম্।

শরৎচন্দ্রের রূপনারায়ণ-আবাসে যখন পৌঁছিলাম, তখন মেঘ কাটিয়া গিয়াছে, ক্ষীণ জ্যোৎস্নায় বর্ষাস্নাত পৃথিবী হাসিতেছে—সে হাসি বড় ম্লান, বড় মধুর। শরৎচন্দ্র সাদরে আমাদিগকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। বলিলেন, লিখবার আর সময় পাই না, পেটের গোলমালে বড় ভুগছি। তাঁহার সম্মুখের টেবিলে সারি সারি ফাউন্টেন-পেন সজ্জিত। দেখিয়া শ্রদ্ধা হইল। প্রত্যেকটি কলমে যদি এক লাইন করিয়া রোজ লেখেন, তাহা হইলে সম্পূর্ণ একখানা উপন্যাস হয়। সঙ্কোচের সঙ্গে বলিলাম, খবর দিয়ে না এসে আপনাকে বড় বিপদে ফেললাম। এই ভদ্রলোকের উপরোধে প'ড়েই—

শরৎবাবু তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, তাতে আর কি! ভালই হ'ল। কাল বক্তৃতা দিয়ে আসা অবধি লোকের সঙ্গ পাবার জন্যে ছটফট করছিলাম। তা, ইনি কে?

কি পরিচয় দিব? বলিলাম, ইনি আপনার একজন ভক্ত। শরৎচন্দ্রের মুখ হাসিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, কালকের বক্তৃতাটা নিয়ে একটু আন্দোলন হবে মনে হয়। আপনি কি বলেন?

ভদ্রলোকটি একটু আমতা আমতা করিয়া বলিলেন, সেই সূত্রেই তো আপনার কাছে আসা। কিন্তু কথাটা একটু গোপনীয়। আর কেহ সেখানে ছিল না। আমিই তৃতীয় ব্যক্তি। শরৎচন্দ্রকে স্থান ত্যাগ করানো অভদ্রতা হইবে ভাবিয়া বলিলাম, আমি একটু নদীর ধারে ঘুরে আসছি, ততক্ষণে আপনারা কথাটা শেষ ক'রে ফেলুন।

শরৎচন্দ্র একটু হাসিয়া বলিলেন, দেখবেন, সাপের বড় ভয়।

কতক্ষণ নদীর ধারে বেড়াইয়াছিলাম মনে নাই, হঠাৎ একটি শীতল করস্পর্শে চমকিয়া উঠিলাম। শুনিলাম, আমার কাজ হইয়া গিয়াছে। এবার ফেরা যাউক।

আমাকে গোপন করিয়া শরৎচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করাতে আমার রাগ হইয়াছিল। বলিলাম, আপনি যান, আমি রাত্রে এইখানেই থাকব, বেঘোরে মাঠে সাপের কামড় খেয়ে মরতে পারব না। হ্যাঁ, বঙ্কিমের বিরুদ্ধে কি ষড়যন্ত্র হ'ল?

ভদ্রলোক কথা কহিলেন না, আমার চোখের উপর স্থির দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন, মামন্থনর।

আমি মন্ত্রাহতের মত আবার তাঁহার পিছু লইলাম, অস্বাভাবিক ভয়ে আমার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল। শরৎচন্দ্রের নিকট বিদায় লওয়ার কথা মনে হইল না। সেই দীর্ঘায়ত পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কর্দমাক্ত পথে নিঃশব্দে চলিতে লাগিলাম।

একটা শৃগাল আমার পাশ দিয়া দ্রুত দৌড়াইয়া গেল। আমি ভয়ে আর্তনাদ করিয়া সম্মুখবর্তী পুরুষের বাহুতে হাত রাখিলাম। দীর্ঘায়ত পুরুষ বলিলেন, ভয় নাই। গন্তব্য স্থানে প্রায় আসিয়া পড়িয়াছি। আমি এখানে কেন আসিয়াছিলাম, প্রশ্ন করিতেছিলে? আমার নাম— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আমিই 'আনন্দমঠে'র লেখক। শরৎবাবু

আমার যে ত্রুটিটা ধরিয়া ফেলিয়াছেন ও গতকল্য নির্দিষ্ট কয়েকটি ব্যক্তির নিকট যাহা প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহা সর্বত্র প্রচারিত হইলে আমার ক্ষতি হইবে, তাই তাঁহাকে অনুরোধ করিতে আসিয়াছিলাম, তিনি যেন এই কথা অপর কাহারও নিকট প্রকাশ না করেন। তিনি স্বীকৃত হইয়াছেন। আমি যাই।

তটস্থ হইয়া বঙ্কিমের মুখের দিকে না চাহিয়া তাঁহার পদধূলি লইবার জন্ত হাত বাড়াইলাম। কাদায় হাত ভরিয়া গেল। কোথায় বঙ্কিমচন্দ্র? অর্ধঅন্ধকার আকাশের তলে পানিত্রাস ও দেউলটির মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ অড়হরের ক্ষেতে আমি একাকী দাঁড়াইয়া আছি। দূরে কাছে জনমানবের চিহ্নমাত্র নাই।

সেদিন কি ঘটিয়াছিল, এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। আমি ট্রেনে চাপিয়া কোলাঘাটে মাসীর বাড়ি যাইতেছিলাম এটাও ঠিক, আবার দেউলটির মাঠে অন্ধকার রাত্রে একাকী দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিলাম, ইহাও ঠিক। ভাবিতেছি, একবার শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিব, কিন্তু তৎপূর্বে একবার গোপনে শরৎচন্দ্রের নিকট খবর লইতে হইবে।

সাহিত্য-ধর্ম'-এর জের *

রবীন্দ্রনাথ ও বেচারাম

১

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু,

মহাশয়, আপনার এ কিরূপ ব্যবহার ? আপনি নিজে সঠিক কোন খবর না জানিয়াই লোকের পিছনে অখ্যাত অনুচর লেলাইয়া দেন কেন ? এই সকল অখ্যাত লোকেদের কাছেই বা কোন বিষয়ে একেবারে অভ্রান্ত না হইয়া কথা বলেন কেন ? সাহস থাকে সামনাসামনি লড়ুন, শক্তিমানের তাল-ঠোকাকে ভয় করিলে চলিবে কেন ?

---

* সাহিত্যের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নাই বলিয়া আমরা এই চিঠিপত্র প্রকাশ করিতে অসম্মত হওয়ায় শ্রীযুক্ত বেচারাম কুণ্ডু মহাশয় তাঁহাদের বাজারের সরকারবাবুকে দিয়া যে জবাব লিখাইয়াছেন, তাহার কিয়দংশ এই—

মহাশয়গণ, আপনাদের বুদ্ধিকে গড় করি, সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক নাই বলিয়া চিঠিপত্রগুলি ফেরত দিয়াছেন। সম্পর্ক নাই কেন শুনি ? ইহার পর শুনিব, আমার সহিত আমার পুত্র শ্রীমান্ ভোঁদার কোন্ সম্পর্ক নাই। ধন্য সাহিত্যিক বুদ্ধি আপনাদের। ভোঁদার মা যে সেদিন বলিতেছিল, 'লেকাপড়া' শিখিলে ছেলে পর হইয়া যাইবে—এ তো তবে সত্য কথা।

বুঝিয়াছি, রবীন্দ্রনাথবাবুকে আপনারা ভয় করেন, তাঁহাকে সাহিত্য-সম্রাট না কি যেন বলেন। সম্রাট আবার কি। আমরা ত এক মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কথাই জানি। ইনি আবার রাজত্ব পাইলেন কবে ? আপনারা খোসামুদি করিয়া তাঁহার প্রজাগিরি করিতে পারেন, আমার কমিনীপতি উকিলের মুহুরি—আমি মহারাণী ছাড়া রাজা মানি না।

সাহিত্যের সঙ্গে আমার চিঠির কোন সম্পর্ক নাই, বলিতেছেন। সম্পর্ক যে আছে,

আমাদের বাজারের 'তোলা'-আদায়কারী বাবুটির নিকট শুনিলাম, আপনি নাকি এরূপ একটি অখ্যাত অনুচরকে দিয়া পা টিপাইয়া লইবার অবসরে আমার সম্বন্ধে যা-তা বলিয়াছেন, সেই লোকটা কিছুকাল যাবৎ যত্র-তত্র আমার নিন্দাবাদ করিয়া লোকের কাছে বড় হইতে চায়। দৈহিক আরামের আবেশে আপনি যাহা বলিয়াছিলেন, সে নাকি সম্প্রতি

তাহার একটি প্রমাণ সেদিন হঠাৎ পাইয়াছি। ভোঁদা যে ঠোঙার করিয়া সেদিন মুড়ি আনিয়াছিল, আমাদের বাজারের সরকারবাবু সেটিতে রবীন্দ্রবাবুর নাম দেখিয়া আমাকে তাহার খানিকটা পড়িয়া শোনাইলেন। 'বঙ্গবাণী' না কি একটা মাসিকের একটি পাতা—খানিকটা শুনিয়া বুঝিলাম, রবীন্দ্রবাবুর স্বভাবই এই। নরেশবাবু না কে একজন ভদ্রলোকের (শুনিলাম, তিনি উকিল, সুতরাং মস্ত লোক নিশ্চয়ই।) সঙ্গে তিনি ঠিক এই খেলাই খেলিয়াছেন। বইয়ের প্রশংসা করিয়া তাহা আবার ফেরত লইয়াছেন। আপনারা যদি তাহা না পড়িয়া থাকেন, খানিকটা তুলিয়া দিলাম, পড়িয়া রবীন্দ্রবাবুর চরিত্তির বুঝুন।—

"আপনার কোনও অখ্যাত অনুচর সম্প্রতি আমাকে গালাগালি দিয়া খ্যাতিলাভের সংক্ষিপ্ত পথ আবিষ্কার করিয়াছে। সে ব্যক্তির সঙ্গে আপনার কিঞ্চিৎ নিবিড় পরিচয় সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে এরূপ পরম্পরায় শ্রুত হইলাম। তার লেখা আমার পড়িবার অবসর হয় নাই; কিন্তু শুনিলাম, সে নাকি লিখিয়াছে যে, আপনি আমার লেখা সম্বন্ধে যে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন তাহা কেবল আমার প্রবন্ধ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, গল্প বা উপন্যাস সম্বন্ধে নয়।

লেখককে যে আপনি এ কথা বলিয়াছেন এবং এ কথা প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ থাকিতে পারে না। কেন আপনি এ কথা বলিতে গিয়াছিলেন আর এ কথা বলিয়া তাহা প্রকাশ করিবার জন্যই বা কেন ব্যগ্র হইয়াছিলেন সেই হেতুটা বুঝিতে পারিলাম না।

কথাটা সত্য কি না বিচার নিষ্প্রয়োজন।...

পরিশেষে নিবেদন করিতেছি যে, যদিও কত ব্যানুরোধে সম্প্রতি আমাকে আপনার অপ্রীতিভাজন হইতে হইয়াছে, তথাপি প্রকাশ্যে আমার গ্রন্থাবলীর বহু স্থানে আপনার

[illegible] অভিমত প্রকাশ করিয়াছে। আমি যে [illegible] নাই,
[illegible] আপনি তাহাই বলেন যে, আমি [illegible] পারি না (এই চিঠি
[illegible] এক যুবক-বন্ধুকে দিয়া লিখাইয়া লইয়াছি)। সে আমি
খিয়াছে যে, আপনি আমার দোকানের যে প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তাহা
ধু আমার পটোল সম্বন্ধে প্রযোজ্য, কচু বা ওল সম্পর্কে নয়।

ম্বন্ধে যে মতামত প্রকাশ করিয়াছি এখনও তার কোনও অংশে বিন্দুমাত্র সংকোচন বা
ত্যাহার করিয়া রত্নাপহারকের প্রত্যবায় অর্জন করিবার কিছুমাত্র আকাঙ্ক্ষা আমার
নাই। আপনার প্রতিভার প্রতি আমার ভক্তি ও শ্রদ্ধা অচলা আছে এবং আশা করি
রদিন থাকিবে।

আর একটা কথা বলি। আমার মত নগণ্য ব্যক্তির উপর যদি আপনার ক্রোধের
ানও কারণ হইয়া থাকে তবে স্বয়ং আঘাত করিতে কি আপনি কুণ্ঠিত? আপনি যদি
াঘাত করিতে ইচ্ছা করেন তাতে নিন্দার কোনও কথা নাই, আর আমিও যদি
থাযথ আত্মরক্ষার চেষ্টা করি তাতেও কেহ দোষ দিতে পারিবে না। কিন্তু যাদের
ম্বন্ধে আমি অস্ত্রধারণে অক্ষম সেই শিখণ্ডীর দল দাঁড় করাইয়া গোপনে অস্ত্রাঘাত
শিষ্ট যুদ্ধনীতি?

এমন একটা ব্যক্তিগত বিষয় লইয়া কাগজে ঘাঁটাঘাঁটি হয় ইহা আমার ইচ্ছা ছিল
। কিন্তু দেখিতে পাইতেছি যে, আপনার অনুচরটি খবরটা অত্যন্ত ছড়াইয়াছে এবং
র চালে হয়তো আমি লোকের কাছে মিথ্যাচারী সাব্যস্ত হইয়া গিয়াছি। সেজন্য এই
খানি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি। আপনার যদি সে বিষয়ে কোন আপত্তি থাকে
র জানাইলে বাধিত হইব।"

এই লেখাটার নাম শুনিলাম 'সাহিত্য-ধর্মের জের'। ইহার পরও যদি বলেন,
হিত্যের সঙ্গে আমার চিঠির সম্বন্ধ নাই, তাহা হইলে আমার লেখা ফেরত দিবেন, আমি
ন্যাশনাল' কাগজে ইংরেজী করিয়া ছাপাইব, শুনিয়াছি—তাঁহারা ভদ্রলোক, গরিব দুঃখীর
বোঝেন।"

ইহার পর আমরা আর বেচারামবাবুর চিঠিগুলি শিরোনামাঙ্ক ছাপিতে আপত্তি

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] হইবে। এরূপ কথা আপনি বলেন কেন, যদি বলেনও তবে প্রকাশ করিবার জন্য আপনি এত ব্যস্তই বা কেন? মনে রাখিবেন, জবাব চাই, আমি সহজে ছাড়িবার লোক নহি।

এ বিষয়ে বিচার নিষ্প্রয়োজন, কারণ আমার ভগিনীপতি উকিলের মুহুরী, সে বলিয়াছে বিচার নিষ্প্রয়োজন। আপনি যখন বাজার-সরকার মারফৎ আমার প্রশংসা করিয়াছিলেন, তখন আমি শুধু আলু বা পটল বেচি না, কচু-ওলও বেচিতাম, এবং স্মরণ আছে, একদিন পটলের সঙ্গে কিছু কচুও আপনার নিকট পাঠাইয়াছিলাম। ইহার পর আপনি জানাইয়াছিলেন যে, আপনি আমার তরিতরকারির কতক আস্বাদন করিয়াছেন এবং আমার দোকানের ব্যবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। উক্ত বাজার-সরকারের নিকট আপনি এরূপও মত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আপনি একদিন আমার সবজি-বাগান দেখিতে আসিবেন। এমন আভাস তো কোথাও দেন নাই যে, আমার দোকানের ব্যবস্থা আপনার ভাল লাগিয়াছে অর্থে—কেবলমাত্র আমার পটল ভাল লাগিয়াছে বুঝিতে হইবে, কচু সম্বন্ধে ও কথা প্রযোজ্য নয়!

সত্য বটে, তখন পর্যন্ত আমার দোকানে মানকচুর আমদানি হয় নাই। মানকচু আসার পর আমার দোকান সম্বন্ধে আপনার মত—মানকচু

করিতে পারিলাম না। ব্যক্তিগত প্রশংসাপত্র সম্বন্ধে ব্যক্তিগত চিঠিপত্র যদি 'সাহিত্য-ধর্মের জের' নামে বাহির হইতে পারে—বিশেষ করিয়া 'বঙ্গবাসী'র মত কাগজের 'অন্তর্জলী' সংখ্যায়, তাহা হইলে আলু ও কচুবিষয়ক পত্রও 'সাহিত্য-ধর্মের জের' নামে বাহির হইতে পারে।

সং—পঃ চিঃ

সম্বন্ধেও চালাইয়া দেওয়া হয়। ইহা আমার অজ্ঞাতসারে ঘটিয়াছিল; আমার এক সহকর্মী আমার অবর্তমানে এই কথা প্রচার করিয়া দেয়। ফিরিয়া আসিয়া, এই সংবাদ কিছু মানকচুর সঙ্গে আপনার নিকট প্রেরণ ও আপনার ক্ষমাভিক্ষা করি। কারণ আমার মনে হইয়াছিল যে, আপনার অভিমত মানকচু সম্বন্ধে প্রয়োগ করিয়া লোককে প্রতারণা করাটা আপনার অভিপ্রেত না হইতে পারে।

ইহাতে আপনি হাঁ বা না কিছুই বলেন নাই এবং মানকচু সম্বন্ধে যে ওই উক্তি প্রয়োগ করা উচিত নয়, ইহারও আভাস দেন নাই।

অনেকদিন পরে আজ হঠাৎ আপনাদের বাড়ির পুরাতন চাকর বিহারীর পুত্র ভজুয়া নতুন বাজারে একটি তরিতরকারির দোকান খুলিয়াছে, এবং আমার দোকানের আজ যে প্রতিষ্ঠা তাহা আপনার প্রশংসার দ্বারাই ঘটিয়াছে এরূপ ভাবিয়া আপনি আপনার প্রশংসা প্রত্যাহার করিতে চাহিতেছেন। আমি ইহা আশ্চর্য বা অন্যায় বলিয়া মনে করি না। দুঃখ এই যে, আপনি নিজে ও কথা আমাকে না জানাইয়া রতা নাপতেকে ওই কথা বলিয়া প্রচার করিবার অনুমতি দিয়াছেন। ইহাতে আমি যে মিথ্যাবাদী ও জুয়াচোর বলিয়া গণ্য হইতে পারি, তাহা কি আপনি ভাবিয়া দেখেন নাই? অন্যায় করিয়া ক্ষমা চাহিবার ফল কি এই?

আপনার নিকট হইতে আমার আলু ও কচুর 'প্রশংসা ও সমাদর লাভে আমার লোভ যতই থাকুক, তাতে আমার কর্তব্যজ্ঞান ক্ষুণ্ণ করিতে পারে না' (ভাষা দেখিয়া হাসিবেন না, আমার ঢাকার যুবক-বন্ধুটি এই স্থানটি ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের লেখা হইতে চুরি করিয়াছে)। সুতরাং আপনি যদি আপনার অভিপ্রায় আমাকে জানাইতেন, তবে আমি স্বয়ং বাজারের মাঝখানে দাঁড়াইয়া আমার ত্রুটি স্বীকার করিতাম। আমার

তরিতরকারির প্রশংসা করিয়া যিনি লজ্জিত, তাঁহার প্রশংসার জন্ত ক্যাংলামো করিব এত বড় বাঁদর আমি নই।

তা ছাড়া আপনার মত সময়ে জানিলে ভাল হইত। সেদিন আমি ভজুয়ার কাছে আপনি আমার ওল সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা কলাও করিয়া বলিয়া ফেলিয়াছি। এজন্ত আজ বোধ হয় বিহারীর নিকট আপনাকে অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিতে হইয়াছে। আপনি সুবিধা বুঝিয়া মত বদলাইবেন জানিলে বিহারীর নিকট আপনাকে অপ্রস্তুত করিয়া আপনার স্নানাহারের এমন বেবন্দোবস্ত ঘটাইয়া আপনাকে কষ্ট দিতাম না।

যাহা হউক, অতঃপর মানকচু সম্বন্ধে আপনার প্রশংসার কথা কাহাকেও বলিব না, যাহা বিক্রয় হইয়া গিয়াছে তাহার উপর আমার হাত নাই, সেজন্ত মার্জনা ভিক্ষা করি।

পরিশেষে নিবেদন করিতেছি যে, যদিও সম্প্রতি আপনি চুলে ক্যাস্থারআইডিন মাখেন, এই সত্য কথাটি (ভজুয়া স্বয়ং বলিয়াছে যে, তাহার বাবা বিহারী আপনার জন্ত নতুন বাজারে ওই তেল কিনিতে আসিয়াছিল) প্রকাশ করিয়া দিয়া আপনার অপ্রীতিভাজন হইয়াছি, তথাপি আমি এতাবৎকাল প্রকাশ্যে আপনার ব্যবহৃত জুতার কালি সম্বন্ধে যে প্রশংসাবাদ করিয়া আসিয়াছি, এখনও তাহা বিন্দুমাত্র নাকচ বা প্রত্যাহার করিয়া কালীঘাটের কুকুর হইবার ইচ্ছা রাখি না। আপনার জুতার কালি ও জামার হাতা সম্বন্ধে আমার মতামত আজিও অক্ষুণ্ণ আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। গত বছর জেলেপাড়ার সং-এ 'পুরোহিত' নামে যে সং দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে আমার কোন হাত ছিল না।

আর একটা কথা। আমার মত নগণ্য লোকের উপর আপনার

জোরের কারণ যদি হইয়াই থাকে, তবে স্বয়ং আসিয়া আমায় তাহা বলিয়া দিলেন না কেন? আপনার হাতে কানমলা খাইতে আমার লজ্জাও নাই, কোনও নিন্দার কারণও তাতে হয় না। তখন আমিও আপনার জুতার ফিতা ছিঁড়িয়া অথবা তাহাতে ধুলা লাগাইয়া প্রতিশোধ লইতে পারিতাম। কিন্তু তাহা না করিয়া মতা নাপতেকে লেলাইয়া দেওয়া আপনার উচিত হয় নাই। সে বেটা অতি নচ্ছার এবং আমাকে বাপ্পারাম বলিয়া যেখানে সেখানে নাকাল করে।

এমন একটা সামান্য ব্যাপার লইয়া ঘাঁটাঘাঁটি আমি পছন্দ করি না; কিন্তু মতা নাপতের মুখ বড় ভয়ঙ্কর। বাজারে আমার ভারি নাম খারাপ হইয়াছে। সুতরাং আমি পত্রখানি কাগজে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইতেছি, আপনার আপত্তি থাকিলে জানাইবেন। ইতি

শ্রীবেচারাম কুণ্ড

(২)

ওঁ

কলিকাতা

বিনয়সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন—

আপনার দোকানের ব্যবস্থা দেখিয়া আমি আপনাকে প্রশংসা করিয়াছি। আমাদের দেশের সকল বিধিব্যবস্থাই কেমন এলোমেলো—বিশেষ করিয়া তরিতরকারির দোকানের ব্যবস্থা। তরিতরকারির যদি কিছু প্রশংসা করিতে হয়, তবে সে স্বাদের। দোকানের ব্যবস্থা ভাল বলিতে পটল মিষ্ট কি কচু সুস্বাদু এরূপ বুঝায় না। সুতরাং যখন শুনিতে পাই আমি নাকি আপনার ওলকচু খাইয়া তারিফ করিয়াছি, তখন বিস্মিত হই ও এ-সম্বন্ধে যে-কেহ আমাকে প্রশ্ন করেন, তাঁহাকেই আসল কথাটা বলিয়া দিই। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কিছু বলিবার কথা আমার মনে হয় নাই।

আপনার মত ঝাল খাইতে পারি না বলিয়া আমি লজ্জিত নহি। 'উর্বশী' কবিতাটি আপনাকে লক্ষ্য করিয়া লেখা নহে। আপনার আলু বা কচু খাইতে কেমন বা তাহা কি দরে বিক্রয় হয়, তাহা আমি জানিও না। যে বেগুনের বীচির আধিক্য দেখিয়া আমি নিন্দা করিয়াছিলাম, তাহা 'হগসাহেবের বাজারে'র বেগুন। বিহারী বহুকাল যাবৎ নতুনবাজারে বাজার-করা ছাড়িয়া দিয়াছে।

যখন অমি কলিকাতার বাহিরে ছিলাম, তখন আপনি আমাদের সদর-দরজায় হোঁচট খাইয়া পড়িয়া আমাদের গালিগালাজ করিয়াছেন, নিজের চলনের দোষ দেখিতে পান নাই। নিজের দোষে লাঞ্ছিত হইয়া পরকে গালি দেওয়াটা অনেকের চরিত্রগত দুর্বলতা। ইতি ২২শে মাঘ

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

(৩)

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু

আপনার পত্র পাইলাম না, আপনি কাপুরুষ। সম্মুখযুদ্ধে আসুন— কচু-বেচা বলিয়া ঘৃণা করিবেন না। কচুর নামটা খারাপ হইলেও কচু খাইতে অতীব সুস্বাদু, বিশেষ করিয়া আমার দোকানের কচু— খাস সুন্দরবনের আমদানি। আমার ভগিনীপতি উকিলের মুহুরী, ভারি চালাক। সুতরাং আমার সহিত চালাকি খেলিবেন না। যদি পারেন কচু সম্বন্ধে একটা কবিতা লিখিয়া সব মিটমাট করিয়া ফেলিবেন। ইতি

প্রণত

শ্রীবেচারাম কুণ্ড

---

* এই চিঠিখানি রবীন্দ্রনাথ লেখেন নাই।

নাপিত

কোৰিকা

সে কামাতো দাড়ি।

তার খোদ্দেরের সামনে কখনো বোসতো, কখনো দাঁড়াতো সে··· তার ক্ষুর ছুটতো দামিনীর জীবন্ত প্রতিমূর্তি হোয়ে, শুধু তার ঝলকটুকু মাত্র দেখা যেতো···। আর তার মুখ ছুটতো অনর্গল···শ্রাবণের মেঘের মতো—

*   *   *   *

ক্ষুরটি ছিলো তার প্রাণ, তাকে সে শীর্ণ হাতের পরশ দিয়ে সজীব কোরে তুলতো; কী যে আরাম লাগতো তার ক্ষুরের চঞ্চল পোঁচে পাঁচে!—

*   *   *   *

ক্রমে সে হোয়ে এলো রুগো—জীর্ণ-শীর্ণ অবসন্ন—বুড়ো। তার ওস্তাদ আঙুলে ধোরলো কাঁপুনি! কিন্তু তবু সে চায় তেমনিটি কোরে খোদ্দেরের সামনে দাঁড়িয়ে কামাতে। কিন্তু পারে না সে—সে পারে না···তার চোখ ফেটে লোনা জল বেরোয়, বুকটা ফুলে ফুলে ওঠে, তবু—পেট তো মানে না!—তাই—সে তার তেরো বছরের কচি ছেলেটিকে বসিয়েছিলো এক শুকনো বটগাছের তলায়—বড়ো রাস্তার মোড়ে। তার কোমল মুখখানি কী বেদনামাখা—তার ড্যাবরা ড্যাবরা চোখ কী মিনতিভরা! যে তাকে দেখতো সেই কামাতো তার কাছে—সেও খুলতো তার বাপের দেওয়া ক্ষুরটিকে সার্থক কোরে···। দিন যায়···

*   *   *   *

সেদিন শীতের সকাল। কোয়াশায় চারিদিক ছিলো ছেয়ে; এট্টুখানি ফ্যাক্‌শা রোদ্দুর চুঁইয়ে চুঁইয়ে পোড়ছিলো মেঘের ফাটল দিয়ে। ছেলেটি তার পুঁটলিটি খুলে বোসে ছিলো তার অভ্যস্ত জায়গায়; শীতে সে বাঁশপাতার মতো হিহি কোরে কাঁপছিলো—নাক দিয়ে তার ঝোরছিলো সোর্দি—দশটার পরে কলের থেকে জলের ফোঁটার মতো। তার ক্ষুরটিকে শান্ দিয়ে সে আশায় আশায় রোইলো বোসে। ছোট্ট মুখখানিতে তার উঠলো সুস্পষ্ট হোয়ে বেদনা। সে ভাবলো, উঠে যায়, কিন্তু যদি কেউ এখুনি আসে! তার আর ওঠা হোলো না…সে যে নাপিত।

হঠাৎ তার মুখে এক অপরিসীম আনন্দের রেখা ব্যথাক্লিষ্ট শুক্‌নো ঠোঁটের ওপর ভেসে উঠলো—খোদ্দের এসেছে! খাপ থেকে ক্ষুরটিকে বের কোরে সে দেখলে, সেই কোয়াশার ভেতরেও যেন সে ঝক্‌ঝক্ কোচ্ছে—তেমনি চোখা, তেমনি উজ্জ্বল…

ধীরে ধীরে কোয়াশা মিলিয়ে যেতে লাগলো…মানময়ী প্রমোদার ভ্রূকুঞ্চনের মতোই। সে কামাতে লাগলো। এমন চমৎকার সে বহুকাল কামায় নি—তার মন গর্বে ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো।

হঠাৎ কাঁপুনিতে তার হাত একটু নোড়ে গিয়ে এট্টু কেটে গেলো…

তার পর…একটি চড়—আচম্‌কা…তার মাথা ঝিমঝিমিয়ে উঠলো।…

চোলে গেলো পয়সা না দিয়ে…কোয়াশার অন্তরালে…

* * * *

সে বোসেই রোইলো…ক্ষুরটিতে যত্নে শান্ দিয়ে…

সে যে নাপিত!

"স্বরাজ্য-জ্যামিতি"

এই পুঁথিটি বহু পুরাতন হইলেও সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা
সনাচার্যের লেখা অথবা ভাস্করাচার্যের লেখা, ইহা লইয়া কিছুদিন পূর্বে
লনগরে আহূত পণ্ডিতমণ্ডলীর সভায় ঘোরতর বিবাদ বাধিয়াছিল।
খ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক গজেন্দ্রবাবু ইহাকে কণাদের লেখনীপ্রসূত
লিয়াছেন; তবে সূত্রগুলির দুই-একটি যে প্রক্ষিপ্ত, এ কথা তিনি
স্বীকার করিতে পারেন নাই। ভারতের বহু স্থলে মন্দিরগাত্রে,
স্তগাত্রে ও ইতস্তত-বিক্ষিপ্ত শিলা বা ইষ্টক-লিপিতে এই পুঁথির স্থান
শেষ উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়; স্থানভেদে কিছু কিছু পাঠান্তর ঘটিয়াছে। এই
স্তকের ঐতিহাসিকত্ব লইয়া পণ্ডিতেরা আরও কত কাল বিবাদ
রিবেন, তাহা জানা যায় নাই; সুতরাং ইহার কালনির্ণয় এতাবৎকাল
য় নাই। শুনা যাইতেছে, মেক্সিকোতে কালীমন্দিরের গায়ে এই
্যামিতির কয়েকটি সংজ্ঞা লিখিত আছে। সম্পূর্ণ পুস্তকখানি সম্ভবত
তিপূর্বে আর কোথাও আবিষ্কৃত হয় নাই, তবে ভট্ট মোক্ষমূলর বার্লিনের
হত্তম গ্রন্থালয়ে এক অপূর্ব ভারতীয় জ্যামিতির অবস্থানের কথা
াহার একটি বিখ্যাত পুস্তকের পাদটীকায় লিখিয়াছেন, সম্ভবত ইহা এই
স্তকই হইবে; এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান বিশেষ আবশ্যক।

অসম্পূর্ণ ও কীটদষ্ট অবস্থায় পুস্তকখানি নাগপুর, এলাহাবাদ, গয়া ও
ানপুরে কিছুকাল পূর্বে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন নিখুঁত অবস্থা
ার কোনটির নাই। আলোচ্য পুস্তকখানি কিছুকাল পূর্বে কলিকাতার
বানীপুরে এক শিবমন্দিরের অভ্যন্তরে বেলপত্রাদির অন্তরালে আবিষ্কৃত
ইয়াছে। স্থানে স্থানে ছাড় পড়াতে পাঠোদ্ধার করা না গেলেও

[illegible]লোট কাগজের তুলা ঠিক আছে। বিখ্যাত পণ্ডিতপোষক রসময়বাবু [illegible] পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া জ্যামিতিটির পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই মহৎকার্য সুসম্পন্ন হওয়ার পূর্বেই তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন। দেশের পক্ষে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

পুস্তকখানি নানা হাত ঘুরিয়া অবশেষে আমাদের হস্তে উপস্থিত হইয়াছে। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া ইহার কিছু কিছু পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছি। ক্রমশ অনেক অবোধ্য সূত্রও স্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। আশা করি, আমরা ধীরে ধীরে সমগ্র পুঁথিখানি বাংলার [illegible]তিকসমাজকে উপহার দিতে পারিব; এই উপহারের জন্য আমাদের প্রকাশিত কোনও দৈনিকের বার্ষিক গ্রাহক হইতে হইবে না। যতটুকু পাঠোদ্ধার করিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহা দেওয়া গেল। প্রারম্ভেই [illegible]লিয়া দেওয়া কর্তব্য বোধ করিতেছি যে, ধারাবাহিকভাবে পুস্তকখানির অনুবাদ দেওয়া আমাদের সাধ্যাতীত। প্রথম পৃষ্ঠায় কোনও সংজ্ঞার পরেই হয়তো ৪০ পৃষ্ঠার কোনও সূত্রের অনুবাদ দেওয়া হইবে। মধ্যবর্তী পৃষ্ঠাসমূহের পাঠোদ্ধার হয় নাই বুঝিতে হইবে। আবিষ্কৃত পুঁথিখানি ডিমাই আটপেজী সাইজের ১৯২ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ, তন্মধ্যে ২৩টি পৃষ্ঠার লেখা কালপ্রভাবে লেপিয়া মুছিয়া গিয়াছে। মূল সংস্কৃত সূত্রগুলি উদ্ধৃত করিলাম না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গ্রন্থখানির প্রথম কয়েক পৃষ্ঠা প্রায় অবিকৃত আছে, সম্ভবত উহা বিষপত্রের কীট-প্রতিরোধক শক্তির প্রভাবে।

পুঁথি আরম্ভ

পূর্ব-বন্দনা

সূর্যকে নমস্কার, তিনি কিরণ দান করেন ও দিবসে নক্ষত্রপুঞ্জের জটিলতা হইতে আমাদিগকে রক্ষা করেন। ১।

সূর্য্যকে নমস্কার, তিনি মেঘের জনয়িতা ও হরিদ্বর্ণকে নিরন্তর রক্ষা করিয়া চক্ষুর প্রীতিসাধন করেন। ২।

সূর্য্যকে নমস্কার, তিনি আবর্ত্তন করেন ও আবর্ত্তন করান। ৩।

উপক্রমণিকা

রেখা ও বিন্দুর সমষ্টি এই ধরিত্রী। রেখা ও বিন্দুর বিভিন্ন সমাবেশেই জ্যামিতির উদ্ভব। ৪।

রেখা ও বিন্দু বস্তুবিষয়ক। এই জ্যামিতিও বস্তুবিষয়ক। ৫।

বস্তু-বিষয়ে যেমন রেখা ও বিন্দু, রাজনীতিক্ষেত্রে তেমনই মন্ত্রিত্ব ও ভোট। ৬।

বিন্দুর সংযোগে রেখা; ভোটের সংযোগে মন্ত্রিত্ব। ৭।

মন্ত্রিত্ব অধিগত হইলেই স্বরাজ্য অধিগত হয়। ৮।

স্বরাজ্য কাহাকে বলে? বিহ্লনাচার্য বলেন, স্বর বা বক্তৃতাদির দ্বারা পরিচালিত যে রাজত্ব, তাহাকেই স্বরাজ্য বলে। কীলকভট্টের ভিন্ন মত। তিনি লিখিয়াছেন, স্বরাজ্য; যেখানে কৌশলে স্বর্বাধি সরানো হইয়া থাকে, সেখানেই স্বরাজ্য স্থাপিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। আমরা স্বরাজ্যের ভিন্ন সংজ্ঞা দিতেছি। কোনও জীবের এক কর্ণ ইংরেজের করধৃত ও অন্য কর্ণ মুসলমানের করধৃত হইলে এবং সম্মুখবর্ত্তী বিচালির পশ্চাৎ পশ্চাৎ নিমীলিত নেত্রে ও লুব্ধ জিহ্বায় সুবোধ বালকের ন্যায় ধাবিত হইয়াও মনে মনে স্বাধীনতার কল্পনা করিলে সে স্বরাজ্য পাইয়াছে বুঝিতে হইবে। ৯।

মৃত ও কয়েদীকৃত লোকের দোহাই পাড়িয়া কাজ হাসিল করার নাম স্বরাজ্য-কৌশল বা স্বরাজ্য-প্যাক্ট। ১০।

স্বরাজ্যের Locus বা নির্দ্ধারিত পথ কি?—তিন বৎসর অন্তর অন্তর

অঘটনঘটনপটিয়সী ম্যানিফেস্টো জারি করা, গ্রামে গ্রামে ও পার্কে পার্কে বক্তৃতায় উচ্ছ্বসিত দেশপ্রীতি ব্যক্ত করা, রাজবন্দীদের জন্য ক্রন্দন করা এবং স্ত্রীলোককে রথাগ্রে স্থাপন করিয়া ভোট-সংগ্রহের জন্য সদরে বাহির হওয়াই হইতেছে—স্বরাজ্যের নির্ধারিত পথ। সুতরাং স্বরাজ্যের Locus বা নির্ধারিত পথ হইতেছে—একটি বৃত্ত। ১১।

স্বরাজ্যবৃত্ত—কোনও মৃতব্যক্তিকে কেন্দ্র করিয়া আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরের পয়সায় বা স্বরাজ্য-ফণ্ডের টাকায় সেকেণ্ড ক্লাসে ভ্রমণ করিয়া যথালভ্য গৃহে আনিতে পারিলে স্বরাজ্যবৃত্ত অঙ্কিত হয়। ১২।

ভোট-বিন্দুর যথাযথ সংযোগে মেম্বর-রেখা অঙ্কিত হয়। ১৩।

মেম্বর-রেখা সরল ও অসরল ভেদে দুই প্রকার। ১৪।

ভোট-বিন্দু ও মেম্বর-রেখার বিবিধ ও বিচিত্র সমাবেশসাধন করিয়া স্বরাজ্য ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, বহুকোণ, লম্ব, বৃত্ত প্রভৃতি অঙ্কন করিয়া কতকগুলি উপপাদ্য (Theorem) ও সম্পাদ্য (Problem) যথারীতি প্রমাণীকৃত করা স্বরাজ্য-জ্যামিতির কার্য। ১৫।

এই হেতু কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধ স্বতই গ্রাহ্য হইয়াছে। ১৬।

স্বরাজ্য-জ্যামিতির উপপাদ্য সংখ্যা দ্বাত্রিংশ; সম্পাদ্যের সংখ্যা ঊনবিংশ।

স্বরাজ্য-স্বতঃসিদ্ধ (Axioms)

১। প্রত্যেক স্বরাজ্য-মেম্বর সমান বিবাদ এবং প্রত্যেকেই মৃত দলপতির সমান।

২। সদরে বহির্গমনকালে ও বক্তৃতামঞ্চে বিশুদ্ধ খদ্দর অপরিহার্য, অন্দরে বিলাতী মদের দোকান রাখাও দোষাবহ নহে।

৩। স্বরাজ্য-ফণ্ডের কোনও টাকা কখনই গরমিল হইতে পারে না—যে টাকার হিসাব পাওয়া যায় না তাহা Village Organisation Scheme-এ খরচ হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

৪। স্বরাজ্য-ফণ্ডে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিবার প্রতিশ্রুতিই উক্ত পরিমাণ টাকা দেওয়ার সমান।

৫। বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার টাকা বেতনভোগী কর্মচারী সুবিধামত স্বরাজ্য-মেম্বর বলিয়া গণ্য হইতে পারে। স্বরাজ্য-ম্যানিফেস্টোতে সহি করিবার প্রয়োজন নাই।

৬। স্বরাজ্য-ম্যানিফেস্টোতে বারংবার সহি করিতে অস্বীকার করিয়াও কোনও ব্যক্তির স্বরাজ্যদলের একজন ধুরন্ধর হইবার বাধা নাই, তবে সেই ব্যক্তির শৈলাবাসে শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য বিদেশিনী পরিচারিকা রাখা আবশ্যক।

৭। রাস্তার জেলে অবস্থানরূপ সুবিধা লইয়া প্রত্যেক রাজারই নেতৃরূপে দাঁড়াইবার অধিকার আছে।

৮। স্বরাজ্য-পার্টির বিরুদ্ধে মত পোষণ করিয়া স্বরাজ্যদলের পরিচালিত কোনও ইংরাজী দৈনিক পত্রের অফিসের বেতনভোগী কর্মচারী অধুনা-খালাস কোনও রাজবন্দী স্বরাজ্য-পার্টির জন্য যদি চেষ্টিত হন, তাহা হইলে তিনি ঘুষ লইয়াছেন এরূপ কল্পনা করা অন্যায় হইবে। তাঁহাকে পূর্ববৎ সম্মান করিতে হইবে।

৯। ১৯২১ সাল হইতে এতাবৎকাল যিনি রায় বাহাদুর খেতাব সগর্বে ধারণ করিতেছিলেন, এমন কোন ব্যক্তি যদি ১৯২৬ সালে সহসা খেতাব পরিত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি খাঁটি স্বরাজিস্ট—ইহাতে সন্দেহ নাই।

১০। কলিকাতা কর্পোরেশন স্বরাজীদের হাতে আসিয়া যেমন পাকা ভিতের উপর দাঁড়াইয়াছে (কলিকাতার রাস্তা-ঘাট, জলের ব্যবস্থা, ময়লা জলের অকস্মাৎ তিরোধান প্রভৃতি দ্রষ্টব্য), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কেও সেইরূপ পাকা ভিত্তির উপর দাঁড় করাইতে হইবে, সুতরাং স্বরাজীয় দাবি স্মরণ করিতে হইবে।

১১। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায়, রাজবন্দীদের দুঃখ-দুর্দশায় পথে ঘাটে ট্রেনে স্টীমারে বিচারের শিলের মত স্বরাজ্য-পার্টির কথা উল্লেখ করিতে হইবে।

১২। ফরোয়ার্ডের সাম্বাৎসরিক উৎসবে খদ্দরের উপর নিমন্ত্রণ-লিপি পাঠাইতে হইবে, অন্ততঃ তিন বৎসর পর পর।

প্রতিভা

পরম্পরায় শুনিতে পাই, আধুনিক বাংলা সাহিত্যে নাকি অনেক কটি প্রতিভার আবির্ভাব হইয়াছে; কাহারও লোকাতীত প্রতিভা, কাহারও গোল্লোকাতীত, কেহ বা কাঁচা আণ্ডার-গ্র্যাজুয়েট প্রতিভা, কেহ বা বুড়ো ডক্টরেটোত্তর প্রতিভা; ছোট বড় মাঝারি অনেক কিসমের প্রতিভাই নাকি সম্প্রতি স্বদেশীয় সাহিত্যে গজাইয়াছে। প্রতিভাবীরও (ব্যাকরণ ভুল হইলে মাফ করিবেন) অভাব নাই।

এ সব কথা শুনিলে আনন্দ হয়। কিন্তু, 'বানরে সঙ্গীত গায়, জলে ভাসে শিলা'র ন্যায় প্রত্যয় হয় না। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে প্রতিভা বলিতে আমরা তিনটিকে বুঝিতাম,—বঙ্কিম, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথ। বিংশ শতাব্দীতে ভেক-ছত্রের ন্যায় প্রতিভা সুলভ হইয়া গেল। কিন্তু ইহাতে আশ্চর্য হইতেছি কেন? ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এরোপ্লেন একখানিও ছিল না, আর আজ? সেদিন একটি বিলাতী পত্রিকায় দেখিলাম, শুক্রমঙ্গল-সন্ধিসংবাদে, এরোপ্লেনগুলিকে ব্রণবিহারী মক্ষিকা কল্পনা করিয়া বুড়া ঘেয়ো পৃথিবীর জন্য তাঁহারা শোকপ্রকাশ করিতেছেন। প্রতিভাও তেমন কিছু হইতে পারে।

কিন্তু প্রতিভা কি? কাহাকে বলে? পূর্বে অনেকে ইহার অনেক প্রকার সংজ্ঞা দিয়াছেন। সেগুলি লইয়া আলোচনা করিব না, ইহার কারণ প্রাগ্‌বিংশ শতাব্দীর সকল বস্তুই সম্প্রতি বাতিল হইয়া গিয়াছে। বিংশ শতাব্দীর কোনও নির্দিষ্ট পুঁথি বা পত্রিকাগত সংজ্ঞার কথা আমি অবগত নই। এই যুগের সাহিত্য-প্রতিভার কতকগুলি উদাহরণ মুদ্রিত পুস্তক ও পত্রিকায় অথবা প্রতিভাশালী লোকেদের জবান মারফত প্রাপ্ত হইয়াছি। বিভিন্ন উদাহরণ হইতে আধুনিক প্রতিভার বিভিন্ন সংজ্ঞা

নির্দেশ করিতেছি। সংজ্ঞাগুলি আমারই না হইলে দোষ আমার, যাহারা উদাহরণ যোগাইয়াছেন তাঁহাদের নহে।

১। আলিঙ্গন তো দূরের কথা, চুম্বন কথাটাও বইয়ের মধ্যে কোথাও না দিয়া যুগান্তকারী উপন্যাস সৃষ্টি করিতে পারার ক্ষমতা থাকিলে ছোটসম্রাট-প্রতিভা আছে বুঝিতে হইবে।

২। নর-নারীর প্রেমের ব্যাপারে, প্রচলিত সুনির্দিষ্ট রাস্তা লেখার মধ্যে অতিক্রম করিয়া যাওয়া—প্রতিভা।

৩। যার তার লেখা পড়িবার অবসর পাওয়া ও পড়িয়া অনেক স্থানেই প্রতিভার ভাস্বর দীপ্তি দেখিয়া মুগ্ধ হওয়া, লক্ষ্মীর তকমা না থাকা ও উদরান্নের জন্য দেশ-(native district)-ত্যাগী হওয়া—এইগুলি লোকাতীত প্রতিভার লক্ষণ।

৪। অনেক পয়লা নম্বরের এম. এ. যে বই পড়িতে পারেন নাই এবং চৌদ্দ বছরের একটি স্কুলের মেয়ে যাহা তিনবার পড়িয়া ফেরত দিয়াছে, সেই বইয়ের লেখক এবং সমালোচক উভয়েই—প্রতিভা।

৫। পমেটম মাখিয়া অসমছন্দের বিদ্রোহ-কবিতায় ও গজল গানে প্রথম রিপুর প্রচার করাটা—'অত্যন্ত' প্রতিভা (very genius)।

৬। বিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কেহ যদি সাহিত্য-চর্চা করে, তাহা হইলে সে—প্রতিভা।

৭। পাঁচজনে যাহা করে তাহার বিরুদ্ধে মত দেওয়া, লোকে যাহাকে পূজা করে তাহাকে ছুয়ো দেওয়া, লোকে যাহাকে কিছু নয় বলিয়া জানে তাহাকে পূজা করা, উল্টা করিয়া জামা গায়ে দিয়া অথবা উলঙ্গ হইয়া রাস্তায় বাহির হওয়া—প্রতিভা।

উপরি-উদ্ধৃত সাতটি সংজ্ঞার মধ্যে প্রথম ছয়টি সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু সপ্তম, অর্থাৎ শেষেরটি যে বিংশ শতাব্দীর প্রতিভার

যথার্থ সংজ্ঞা সে বিষয়ে আমার সন্দেহমাত্র নাই। এই সংজ্ঞাটি দেখিতে একটু বড়, কিন্তু আসলে সব কয়টিই এক অর্থ বহন করিতেছে। এ বিষয়ে টুর্গেনিভ দাদার একটি গল্পের নজির আছে। তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর লোক হইলেও 'রাশ্যা' তীর্থে জন্মগ্রহণ করা বিধায় আধুনিকেরা তাঁহার কথা অগ্রাহ্য করিবে না, আমার এইরূপ বিশ্বাস।

টুর্গেনিভের গল্পটি এইরূপ—

এক ছিল আকাট মূর্খ। মূর্খ হয়েও সে বেশ সুখে শান্তিতেই ছিল, কিন্তু একদিন মূর্খতা সম্বন্ধে অপবাদ তার কানে গেল।

তার ভারি দুঃখ হ'ল। সেই অবস্থাতেই সে ভাবতে লাগল, কি ক'রে এ কুৎসিত নিন্দার হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়!

হঠাৎ তার খালি মাথায় এক মতলব এল, এবং মতলব অনুযায়ী কাজ করতেও সে দেরি করলে না।

রাস্তায় বার হতেই এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। কথায় কথায় বন্ধুটি এক প্রাচীন চিত্র-শিল্পী সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুরু করলে।

আমাদের মূর্খ একটু মাথা নেড়ে বললে, মাফ করবেন, যে শিল্পীর কথা বলছেন সে তো বহুদিন হ'ল বাতিল হয়ে গেছে, আপনি জানেন না বুঝি? আপনার কাছে থেকে এটা আশা করি নি, আপনি দেখছি একটু পিছিয়ে আছেন!

বন্ধুটি একটু বিপদগ্রস্ত হয়ে তৎক্ষণাৎ তার কথায় সায় দিলে।

আর একজন পরিচিত লোক মূর্খকে কথায় কথায় বললে, দেখ, আজকে একটা ভারি চমৎকার বই পড়লাম, ব'লেই বইটার নাম করলে।

মূর্খ একটু চমকে উঠে বললে, সত্যি বলছ, না ঠাট্টা করছ? সত্যি? ছি ছি, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত নিজের রুচি দেখে। যে বইটার

প্রায় করলে তার দাম কানাকড়িও নয়, একেবারে নিলামী ইস্তাহার! এটা তোমার জানা উচিত ছিল। তুমি যে দেখছি ভারি পিছিয়ে আছ হে!

ভয় পেয়ে বন্ধুটি মূর্খের কথায় সায় দিতে পথ পায় না।

আর একজন পরিচিত ব্যক্তি বললে, 'ক'বাবুকে চেনো না বুঝি, ভারি ভাল লোক, এমন উদার প্রাণ কম দেখেছি।

মূর্খ চীৎকার ক'রে বললে, থাম থাম, 'ক'বাবুটি একটি চীজ, পাজীর পা-ঝাড়া, ওর কাছে ঠকে নি এমন বন্ধু ওর নেই। এখনও লোক চিনলে না হে?

এই তৃতীয় বন্ধুটিও আতঙ্কিত হয়ে মূর্খের কথা মেনে নিলে। 'ক'-বাবু সম্বন্ধে তার উৎসাহ চ'লে গেল।

এই ভাবে যে কেউ পুরাতন যা কিছু সম্বন্ধে তার কাছে একটু প্রশংসা করতে এল, মূর্খ সেগুলিকে নিন্দা ক'রে তাদের দাবিয়ে দিলে। দু-একজনকে সে একটু হতাশার ভান ক'রে অনুযোগের স্বরে বলতে লাগল, তা হ'লে তুমিও দেখছি কর্তাভজার দলে (believer in authority)!

মূর্খ সম্বন্ধে চারদিকে আলোচনা চলতে লাগল। বন্ধুরা বলাবলি করে, কঠিন লোক হে, কারও ভাল দেখে না। পুরোনো সব কিছুই এর কাছে বাতিল। কিন্তু লোকটার কি মাথা!

জিবখানাই কি কম বাবা, হ্যাঁ, লোকটার প্রতিভা আছে!

এর জের গিয়ে পৌঁছল এক মাসিকের আপিসে। মাসিকের সম্পাদক মূর্খকে তাঁর কাগজের মাসিক সাহিত্য-সমালোচনা ও মাসিকী বিভাগের কর্তা ক'রে দিলেন।

আমাদের মূর্খ তখন সকলের সব লেখাকে নিজের খেয়ালমত উড়িয়ে দিতে লাগল।

এইভাবে যে 'অথরিটি' মানত না, সে নিজেই একজন মস্ত 'অথরিটি' হয়ে উঠল, লোকে তাকে ভয় ও শ্রদ্ধার চোখে দেখতে শুরু করলে।

আজকের দিনের বেচারা তরুণরা করবে কি?—সকলকে শ্রদ্ধা করবে? সত্যি কথা বলতে কি, শ্রদ্ধা জিনিসটা পুরোনো হয়ে গেছে। তারা কিছুকে যদি শ্রদ্ধা করতে না পারে, তা হ'লেই শিক্ষা-দীক্ষায় কাল্‌চারে শ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য হবে।

ভীরু অর্বাচীনের দলে মূর্খের প্রভাব কি প্রচণ্ড!"

বাংলা-সাহিত্যক্ষেত্রে দেখিতেছি টুর্গেনিভের এই বীজ-মন্ত্রটি কাজে লাগিতেছে। লোকে শ্লীলতার দোহাই দেয়, চালাও বেপরোয়া অশ্লীলতা, তোমার যশ মারে কে? সমাজ, ভগবান, প্রেমকে লোকে মানিয়া চলে, লেখার তোড়ে ওইগুলি উড়াইয়া দাও। দেখ, সকলে তোমাকে মাথায় করিয়া নাচে কি না! কালিদাস শেক্সপীয়ার বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে সকলেই শ্রদ্ধা করে, তুমি শ্রদ্ধা কর বেচারাম কিংবা আর কাহাকেও, সর্বজননিন্দিত কুৎসিত গল্পে আর্টের মহিমা দেখাও, পুরাণের পুনর্জন্ম ঘটাও, এম. এ. পাস 'বেদে'র জীবনকাহিনী বিবৃত কর, নিদেনপক্ষে প্রভু যীশুখ্রীষ্টের মত সর্বংসহ মূর্তিতে সম্পাদকীয় আসনে উপবিষ্ট হও—তোমার প্রতিভা অক্ষয় বটের মত অনন্তকাল বিরাজ করিবে।

এক আনার ডাক-টিকিট

পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণ ঠিকমত হয় নাই, স্বীকার করিতেছি, তবু উদ্বাহকালে সহধর্মিণীর প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে যে গুরুতর একটা কিছু প্রতিশ্রুতি দিতেছি, তাহা বুঝিয়াছিলাম। সাত বৎসরের অবিশ্রাম ব্যবহারে সেই সুবৃহৎ প্রতিজ্ঞাটি ক্ষইয়া ক্ষইয়া কি ভাবে এক আনার ডাক-টিকিটে পর্যবসিত হইয়াছিল, আমার এই গল্পটি তাহারই ইতিহাস। তবে গোড়াতেই বলিয়া রাখা ভাল যে, গল্পটি কেবলমাত্র আইবুড়া ছেলে এবং মেয়েদের জন্ম (যাহাদের 'কখনও বিবাহ করিব না' প্রতিজ্ঞা চিরদিন অটল থাকিবে বলিয়া এখনও বিশ্বাস আছে) লিখিত, বিবাহকামী অনূঢ়া ও প্রাপ্তবয়স্কা বিবাহিতা মহিলারা যেন গল্পটি পাঠ না করেন, তাহাতে অকারণ অনেক দুঃখের হাত হইতে তাঁহারা রক্ষা পাইবেন। বিবাহকালের মন্ত্রে বর্ণিত স্বামীদের অবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহারা মনে মনে যে গর্ব ও সুখানুভব করিয়া থাকেন, এই অধম লেখকের তাহা নষ্ট করিতে বাসনা নাই। তবু নেহাত গল্প যখন একটা লিখিতেই হইবে এবং হাতের কাছে তেমন সুরসাল কোনও প্লট দেখিতেছি না (একটা বিদেশী গল্পের বই, কি ম্যাগাজিনও ছাই কাছে নাই যে মহাজনদের পন্থা অনুসরণ করিয়া প্লট চুরি করিয়া বাহবা লইব, বিদ্যাটা অবশ্য এখনও তেমন জুৎমত আয়ত্ত করিতে পারি নাই)। তখন অগত্যা বিবাহিত পুরুষ-জীবনের একটা গূঢ় রহস্যই না হয় উদ্ঘাটন করিয়া ফেলি, আর কিছু না হউক, গল্পচ্ছলে সত্য-প্রচারের পুণ্যটাও অর্জন করা হইবে। বিবাহিত পুরুষদের কাছে আমার এই গল্পের কোন মূল্য তো নাই-ই, সময়ের যৎকিঞ্চিৎ অপব্যবহার করিয়া গল্প পড়িয়া দেখিলে তাঁহারা বুঝিবেন যে, ইহা তাঁহাদেরও বিবাহিত

জীবনের একটা সত্য ইতিবৃত্তমাত্র। তাঁহাদের নিকট লেখকের নিবেদন এই যে, তাঁহারা যেন বিশ্বাস করেন, অ্যাক্রভার হইয়া আত্মরক্ষা করা আমার কল্পনাতেও ছিল না। নেহাত বেগতিকে পড়িয়া এই অপ্রিয় কার্য করিতে বাধ্য হইয়াছি।

আষাঢ় মাসে বিবাহ হইয়াছিল, শ্রাবণের মাঝামাঝি প্রেয়সী পিত্রালয়ে গেলেন। অল্প কয়েকদিন শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিয়া প্রেয়সীর কিশোর চিত্ত পাড়ার বোকা ঠাকুরঝিদের এবং বুদ্ধিমান ঠাকুরপোদের কাছ হইতে এমন কয়েকটি সংবাদ আহরণ করিয়াছিল, যাহা আমার পক্ষে মানহানিকর। শ্রাবণের প্রাবৃটকালে একদা যখন মধ্য-রজনীর অন্ধকার গাঢ়তর হইয়াছে, আকাশের তারারাজি সম্পূর্ণ অবলুপ্ত, মুহুর্মুহু বিদ্যুৎস্ফুরণে বাতায়নপার্শ্বস্থ তরুশির চকিতে উদ্ভাসিত হইয়া নিবিড়তর তমিস্রায় বিলীন হইতেছে, বজ্রনিনাদে আতঙ্কিত প্রেয়সী সদ্য-বিবাহের লজ্জার মাথা খাইয়া কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠ হইয়া পাশে শয়ন করিয়াছেন, প্রেয়সীর ঠাকুরঝিদের আড়ি-পাতনের প্রবৃত্তি পর্যন্ত তিরোহিত হইয়াছে এবং একটানা দর্দুর-কাকলীতে বৈষ্ণব-কবিদের আঙুরের মত টসটসে পদগুলি মনের মধ্যে গুঞ্জন তুলিতে শুরু করিয়াছে, হঠাৎ প্রশ্ন করিলাম, সরি, (আমার সহধর্মিণীর নাম সরমা) সেখানে গিয়ে আমাকে মনে থাকবে তো?

কোনও জবাব নাই। মেঘাবৃত শ্রাবণ-নিশীথের জবাব-না-দেওয়া প্রেয়সীর বর্ণনা কোন কাব্যে নাই, একটু আহত হইয়া তাহার গায়ে হাত দিয়া বলিলাম, ঘুমুলে নাকি?

প্রেয়সী তবুও নিরুত্তর। হঠাৎ বিদ্যুতালোকে দেখিলাম, সরমার দৃষ্টি আয়ত, কিন্তু চোখে জল। মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের মত সন্দেহ-নিরসনার্থ 'বিদ্যুৎ আর একবার' বলিতে ইচ্ছা হইল না, বিস্মিত হইয়া

প্রশ্ন করিলাম, সখি, তুমি কাঁদছ? অন্থুর জন্যে মন কেমন করছে? অন্থু সরমার ছোট ভাই।

জবাব পাইলাম না বটে, কিন্তু অনুভবে বুঝিলাম, প্রেয়সী ও আমার মধ্যের ব্যবধান কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইল। হাল ছাড়িয়া দিয়া ঘুমাইয়া পড়িব কি না ভাবিতেছি, হঠাৎ প্রেয়সীর অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ নিশীথ-নীরবতা ভঙ্গ করিল।

এই বুঝি তুমি আমাকে ভালবাস? তবে যে সবাই বললে,. ও-বাড়ির প্রতিভার সঙ্গে—

স্মরণ হইল, স্ত্রীলোকের সহিত এক শয্যায় শয়ন করিয়া আছি। রাগ যে হয় নাই, তাহা নহে। সদ্যবিবাহিতা পত্নীর মুখ হইতে এরূপ অপবাদ শুনিব, ইহা আমার সুদূরবর্তী কল্পনাতেও ছিল না। একবার ইচ্ছা হইল বলি, কন্যে, একদা সূত্রহিবুকযোগে তোমাকে বিবাহ-বন্ধনে বদ্ধ করিয়াছি বলিয়া বিবাহের পূর্বজীবনও যে তোমাকে উইল করিয়া দিয়াছি, এরূপ মনে করিও না। কিন্তু আকাশে মেঘ থমথম করিতেছিল এবং রাত্রি ছিল অন্ধকার। প্রেয়সীকে বাহুপাশে বাঁধিয়া কাছে টানিয়া বলিলাম, পাগলী, কে দুষ্টুমি ক'রে তোমাকে রাগাবার জন্যে এসব কথা বলেছে, ওই কালকিসিন্দে মেয়েটার সঙ্গে আমি— ! ছিঃ, তুমি এ কথা বিশ্বাস করতে পারলে?

বুঝিলাম, বিশ্বাস শিথিল হইতেছে, ব্যবধান কমিতেছে।

কেন, মেজদিও তো বললেন, তোমাদের বিয়ের সব ঠিক হয়েছিল। তোমাকে দেখলে প্রতিভা ঘোমটা—

হাসিয়া বলিলাম, সখি, আড়াপুরের চৌধুরীদের মেজোছেলের সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ হয় নি? রামজীবনপুরের মেলায় তাকে দেখে তুমি জিব কাটো নি? তবে কি তুমি—

য্যাঃ।

মুখখানা বুকের কাছাকাছি আসিল। বলিলাম, মেজদি হচ্ছেন একজন গেজেট, মিথ্যের চুপড়ি, ওঁর কোন কথা বিশ্বাস ক'রো না। করলেই ঠকবে।

বাস্‌, গোলমাল চুকিয়া গেল। কিন্তু আসলে মেজদি মিথ্যা বলেন নাই। প্রতিভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা একটু বেশি ঘনিষ্ঠই হইয়াছিল। কিন্তু সে ইতিহাস আমার বিবাহিতা পত্নীর পক্ষে সত্য নয়।

এই হইল শুরু। তখনও কুড়ি দিন বিবাহ হয় নাই।

সরমার বাবা বড় ডাক্তার। একদা কোন বেকার মুহূর্তে তিনি কন্যার নিকট ধূমপানের অপকারিতা সম্বন্ধে কোনও গবেষণামূলক কথা বলিয়া থাকিবেন। পিত্রালয়-প্রত্যাবৃত্ত প্রেয়সীর দ্বিতীয় চিঠিতেই প্রথম জানিতে পারিলাম যে, সিগারেট খাইলে নির্ঘাত যক্ষ্মারোগ হয়। সুতরাং সিগারেট খাওয়া আমাকে ছাড়িতে হইবে। এজন্য সে তাহার নিজের মস্তকসংক্রান্ত একটা দিব্য দিয়া বসিয়াছিল। এগারো বৎসর বয়সে ইস্কুল পলাইয়া নতুন পুকুরের বাঁশ-ঝাড়ে গা-ঢাকা দিয়া বিড়ি খাইতে শিখিয়াছিলাম, চব্বিশ বৎসর বয়সে প্রেয়সীর মাথা সম্বন্ধে এমন মমতা হইবার কথা নয় যে, সে অভ্যাস চট করিয়া ছাড়িয়া দিব। সুতরাং ফেরত ডাকে দিব্য মানিয়া লইয়া লিখিলাম যে, বহুকালের অভ্যাস ছাড়িয়া খুব কষ্ট হইতেছে বটে, কিন্তু যাহাকে ভালবাসি তাহার কথার জন্য সে কষ্ট সহিয়াও সুখ আছে। দিব্য বজায় রহিল এবং আমিও এদিকে দিব্য সিগারেট খাইতে লাগিলাম।

এই হইল দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি-পালন। গোড়ার কয়েকটাই মনে আছে, কিন্তু তার পর এত অধিকবার এই প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছি যে, স্মৃতিশক্তি ভারাক্রান্ত হওয়াতে অনেক কিছুই আর স্মরণে নাই।

সেবার ভাদ্র মাসের গুমট গরমে যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত, এক দিনের বেশি দুই দিন এক জামা গায়ে দেওয়া অসম্ভব, আকাশ বাতাস ও মাটি শুকাইয়া খটখট করিতেছে, প্রেয়সীকে বিদ্যাপতির একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া লিখিলাম—

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।

সুরমা, দরদী কবির এই অপরূপ শ্লোকটি আজ বার বার আমার মনে জাগছে। বর্ষাশেষের বারিবর্ষণে আজ চারিদিক পরিপূর্ণ, আমার বুকই শূন্য শুধু। তাই এই নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে কবির সুরে সুর মিলিয়ে তোমাকে স্মরণ ক'রে গাইছি—

শূন্য মন্দির মোর।

সখি, আমার সমস্ত মন উদাস হয়ে গেছে, কোনও কাজে মন বসছে না। জানলার ধারে চুপচাপ বাইরের বহুরূপী আকাশের দিকে চেয়ে ব'সে আছি। ঘরের বার হতে ইচ্ছে করে না। তুমি এখনও ছেলেমানুষ, আমার মনের এই অবস্থার কথা বুঝবে না। হয়তো হৈ-চৈ হট্টগোল ক'রে তাস খেলে তোমার দিন ভালই কাটছে—আমার দুঃখ জানিয়ে তোমার হালকা মনকে মুহূর্তের জন্যও ভারাক্রান্ত করতে ইচ্ছে করে না। তবু কেন জানি না, আজ বার বার মনে হচ্ছে—

শূন্য মন্দির মোর।

চিঠিটা ভজার হাতে ডাক-বাক্সে ফেলিতে পাঠাইয়া বউদির নিকট এক কৌটা পান ও নিজের ড্রয়ার হইতে সিগারেটের টিনটা সংগ্রহ করিয়া তখনই যে বন্ধুবাড়ির বৈঠকখানায় কর্ণার্জুনের রিহার্সাল দিতে

ছুটিয়াছিলাম, সহধর্মিণীকে তাহা জানাইবার কি কোনও আবশ্যকতা ছিল? না, তাহা করিলেই বিবাহের মন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করা হইত?

তারপর কয়েক বৎসর অতীত হইয়াছে। আজ কিশোরী প্রেয়সী 'স্কুল-ফ্রেণ্ড' গৃহিণী-পদে প্রমোশন পাইয়াছেন, সম্প্রতি তাঁহার অঙ্কে একটি শিশু-চন্দ্রের উদয় হইয়াছে। এ কথা অস্বীকার করিব কেমন করিয়া যে, বিবাহের প্রারম্ভে কথাবার্তায় এবং চিঠিপত্রে নানা মিথ্যাচারের আশ্রয় লইয়াছিলাম বলিয়াই জীবন আজ সহজ, সরল, অনাবিল শান্তিপূর্ণ। ছোট ছোট মিথ্যার সাহায্যেই অপরিচিতা পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হইয়াছে, পরিচয় প্রেমে পর্যবসিত হইয়াছে। যদি একটি দিনের তরেও সহধর্মিণীর সহিত ধর্মাচরণের চেষ্টা করিয়া নিছক সত্যের পূজা করিতাম, তাহা হইলে প্রেয়সীর মুখাকাশের কালো মেঘ আজিও অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিত, সংসারধর্ম পালনের ইচ্ছা বহুদিন বিসর্জন দিয়া সন্ন্যাস লইয়া পণ্ডিচারী আশ্রমে পলাইয়া বাঁচিতে হইত। ভাবিতে ইচ্ছা হয় না বটে, কিন্তু এ কথাও কখনও কখনও চকিতে মনে হইয়াছে যে, আমার মত আমার প্রেয়সীকেও হয়তো আমার মুখ চাহিয়া অনেক মিথ্যার আশ্রয় লইতে হইয়াছে। হয়তো কোনদিন তাঁহার শরীরের এমন অবস্থা যে, শয্যা-আশ্রয় না করিলেই শরীরধর্মের অবমাননা করা হয়, অফিস হইতে ফিরিয়া দেখিলাম, নিয়মিত যত্নসহকারে বৈকালিক আহার্য প্রস্তুত, প্রেয়সী পাশে বসিয়া নিত্যকার মত পাখার বাতাস করিতে করিতে সহজ সুরে গল্প করিতেছেন। তাঁহার মুখ শুষ্ক দেখাইতেছে কেন?—এই প্রশ্নের উত্তরে সেই চিরপরিচিত জবাব—তোমার যত বাড়াবাড়ি, তুমি রোজই আমার শরীর খারাপ দেখছ। কিন্তু মশাই, নিজের চেহারাটা একবার আয়নায় দেখা হয় কি? গলার হাড় বেরোচ্ছে যে! মাসকাবারি টাকা না পাইয়া মুদী হয়তো প্রাতে তাঁহাকে কিছু কড়া কথা শুনাইয়া

গিয়াছে, কিন্তু আমার মুখ চাহিয়া তিনি নির্বিবাদে তাহা হজম করিয়াছেন, আমাকে বিন্দুবিসর্গও জানিতে দেন নাই। যে যাহাই বলুক, এখন দেখিতেছি মিথ্যাটাই সংসারধর্ম-পালনের মূল কথা।

পরস্পরের কাছে কিছু গোপন রাখিব না, বিবাহ-রাত্রে এরূপ ধরনের কি একটা মন্ত্র আওড়াইতে হয় শুনিয়াছি। এই মন্ত্রটি বিবাহ-জীবনের সহজ বিকাশের যে কত বড় প্রতিবন্ধক, তাহা বিবাহিত ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। আমার পত্নীকে এ কথা জ্ঞাপন করিয়া কি কোনও লাভ আছে যে, আমারই কারণে পাশের বাড়ির কোনও মেয়ের ঘন ঘন ফিট হয়, সংসার অচল হইলে কোনও বন্ধুপত্নী গোপনে সাহায্য ভিক্ষা করিয়া পত্র লিখিয়া থাকেন। এমন যদি হয় যে, আমার প্রেয়সীর প্রেমে পড়িয়া বাঁড়ুজ্জেদের ননীগোপাল আজীবন কৌমার্যব্রতই গ্রহণ করিল, নিরুপায় প্রেয়সী তাহার মন ফিরাইতে পারিলেন না—কথাটার মধ্যে অন্যায় হয়তো কিছু নাই, কিন্তু এরূপ কথা স্ত্রীর মুখে শুনিলে কোনও সুস্থ সবল স্বামী নিখিলেশের মত কাব্য করিয়া 'তোমাকে ছুটি দিলাম' বলিয়া এমিয়েলের জার্নাল খুলিয়া বসিবে না। ইহা অবগত হইয়া প্রেয়সী যদি সে সংবাদ চাপিয়া যান, তাহা হইলে কি অন্যায় হইবে? আসলে আমি গল্প লিখিতেছি না, আমার মনে একটা সমস্যা জাগিয়াছে, পাঠকসাধারণের নিকট তাহাই উপস্থাপিত করিতেছি।

সমস্যা বলিতে আর একটা কথা মনে পড়িল, সরমা একবার তাহার মাসতুতো বোনের বিবাহে ধানবাদ গিয়াছিল; কথা ছিল, সে মাস ছয়েক সেখানে থাকিয়া শরীরটা একটু চাঙ্গা করিয়া আসিবে। তখন আমি কলিকাতায় চাকুরি লইয়াছি এবং তালতলা লেনে বাসা বাঁধিয়া নিরুপদ্রবে বাস করিতেছি। রাজভোগের মত রসভরা ভারী ভারী চিঠিপত্র লেখা

নিতেছে, মনে কবিতার বান ডাকিয়াছে, দুই-একটি পত্র কবিতাতেও লিখিয়াছিলাম। একটার একটুখানি মনে আছে—

তুমি এখন থানবাদে,
বিরহেতে প্রাণ কাঁদে,
ব'সে ঘরের হাফ-ছাদে
চোখ রাখি দূর জান্‌লাতে,
শুনি পাশের বাড়ির মেয়ে
বেসুরো গান যাচ্ছে গেয়ে,
আমার পানে কভু চেয়ে
শুছায় কাপড় আল্‌নাতে।
সেদিক থেকে ফিরাই আঁখি,
তোমার তরে ব্যাকুল থাকি—
মনে কতই ছবি আঁকি—
জেগেই দেখি স্বপ্ন যে,
তুমি এখন ছাঁদনাতলায়
ব্যস্ত যে কার কর্ণমলায়,
গানের লহর খেলছে গলায়—
ভেবেই শুধু মন মজে···

কিন্তু মানুষের মন এক অদ্ভুত পদার্থ। কি করিতে কি হইল বলিতে পারি না, এক দিন সেই দূরের জানালার মেয়েটিকেই বে লাগিল। তারপর চোখাচোখি, পরিচয়, কিন্তু সে স্বতন্ত্র ইতিহাস তারও পরে, পরিচয় জমাট বাঁধিয়াছে, অবস্থা উপহার-বিনিময় পর্য

গড়াইয়াছে এবং নিতান্ত বেহুঁশ করিয়া সেই নায়িকা সম্বন্ধে একটা গল্প লিখিয়া মাসিকে ছাপাইয়াও দিয়াছি। এক দিন প্রাতে দেখিলাম, বলা নাই, কহা নাই, প্রেয়সী আসিয়া হাজির আমার এক বেকার শ্যালককে সঙ্গে করিয়া। একেবারে চমকিয়া উঠিলাম। জানালায় নায়িকা-মূর্তি গভীর ঔৎসুক্যের সহিত আমার পত্নীকে দেখিতে লাগিল, আমি দাঁড়াইয়া ঘামিতে লাগিলাম। শুষ্ককণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম, হঠাৎ এলে যে! একটা খবরও তো দিতে হয়! পত্নী হাসিমুখে গায়ের আলোয়ানখানা খুলিয়া বিছানার উপর রাখিয়া ভাঁজ করিতে করিতে বলিলেন, নিজের বাড়িতে আসব তার জন্যে কি আবার 'টুর-প্রোগ্রাম' ছাপতে হবে না-কি? আহা, কি চেহারা বেরিয়েছে তোমার! বিরহের জ্বালায় খাওয়া-দাওয়াও ছেড়ে দিয়েছ নাকি?

কথাটা সহজ সুরে বলা, না, ভিতরে কোনও তীব্র পরিহাস ছিল বুঝিতে পারিলাম না। হায় রে, প্রেমটা প্রায় দানা বাঁধিয়া আসিয়াছিল, এমন সময়—

প্রেয়সী অত্যন্ত সহজভাবে সংসারের ভার স্কন্ধে লইয়া যেন আজীবন সেখানেই বাস করিতেছেন, এরূপভাবে চলিতে লাগিলেন। কোনও বিষয়ে একটি প্রশ্নও জিজ্ঞাসা করিলেন না। একদিন হঠাৎ বলিলেন, অমুক গল্পটার সবাই প্রশংসা করছিলেন, ললিতবাবুর সেই ব্যাপারটা লিখেছ বুঝি? আহা বেচারা!

এমন 'কোল্ড ব্লাডে' খুন করিতে মেয়েরাই পারে। ইহার পরই তিনি বলিলেন, শ্যামবাবুর বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে তোমার যে আলাপ হয়েছে, তা আমাকে বল নি তো! আজ দুপুরে এসে তাঁরা তোমার কত প্রশংসা ক'রে গেলেন। মাধুরী মেয়েটি বেশ। আমার কাছে রোজ গান শিখতে আসবে বলছিল। কি বল, আসতে বলব? পাংশু মুখে

রক্ত আনিবার জন্য ধোপার হিসাবের খাতাটা লইয়া বসিলাম। বহু কষ্টে বলিলাম, তোমার কি সময় হবে?

তা আর হবে না? আমার আবার কাজ কি? খাচ্ছি দাচ্ছি, পায়ের ওপর পা দিয়ে ব'সে আছি। তবু পুরোনো গানগুলো ঝালিয়ে নেওয়া হবে। সব ভুলে মেরে দিচ্ছি যে!

মাধুরী গান শিখিতে আসিতে লাগিল, কিন্তু আমার ও তাহার সম্পর্কে একটা সুবৃহৎ দাঁড়ি পড়িয়া গেল।

ব্যাপারটা যত সহজে চুকিল ভাবিলাম, আসলে তত সহজে চুকে নাই। পরে সমস্তটা জানিয়া যুগপৎ লজ্জিত ও আনন্দিত হইয়াছিলাম। প্রেয়সী মিথ্যার আশ্রয় না লইয়া নারীসুলভ ক্রোধে যদি সেদিন কোন 'সিন' করিয়া বসিতেন, তাহা হইলে আজও হয়তো গোপনে মাধুরীর নামে কবিতা লিখিতে থাকিতাম।

ব্যাপারটা হইয়াছিল এই, মনিহারী দোকানে প্রেয়সীর ফর্দমত চাকরে গিয়া জিনিস লইয়া আসিত, আমিও কালেভদ্রে এটা-সেটা আনাইতাম। দোকানী মাসের শেষে তাঁহার নামেই ডাকে বিল পাঠাইত। প্রিয়ার অনুপস্থিতিতে আমি যে সকল দ্রব্য খরিদ করিয়াছিলাম, নিয়মমত তাহার ফর্দ ও বিল প্রেয়সীর নামেই আসিয়াছিল, খেয়াল না করিয়া আমি তাহা রিডাইরেক্ট করিয়াছিলাম। গল্প পড়িয়াও তিনি যাহা বুঝিতে পারেন নাই, দোকানের ফর্দ দেখিয়া তাহাই তাঁহার নিকট স্পষ্ট হইয়াছিল। বাড়িতে কখনও কুন্তলীন ছাড়া অন্য কোনও তেল আসিত না, মাধুরীর নির্দেশমত অন্য কি একটা তেলের নাম ফর্দে করা হইয়াছে, ইহা ছাড়াও আরও দুই-একটা কি অস্বাভাবিক জিনিসের নাম ফর্দে ধরা ছিল। বাস্, আর কোনও প্রশ্নের প্রয়োজন হয় নাই। প্রেয়সী বুঝিতে পারিলেন, একটা গোলযোগ ঘটিতেছে, সুতরাং অবিলম্বে

[illegible] বলিয়াছেন যদি দিলেন, এবং আমরা [illegible]
[illegible] সবার গোপন [illegible]
[illegible] তিনি [illegible]

তাই বলিয়াছিলাম, একেবারে খাপ-খোলা তরবারির মত সব[illegible] লইয়া কারবার করিলে পৃথিবীতে বাস করা কঠিন, রক্তপাত অনিবার্য। সেই তরবারিকেই খাপে ঢাকিয়া প্রয়োজনমত কৌশলে যাহারা ব্যবহার করিতে পারে, তাহারাই শান্তিতে বাস করিতে থাকে।

তারপর, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া জীবনস্রোতকে একটা বাঁধা খাতে প্রবাহিত করাইয়াছি, বর্ষার জল সেই খাতে ঢুকিয়া মাঝে মাঝে যে কূল ছাপাইয়া যায় নাই তাহা নহে, কিন্তু যথাসময়ে জল নামিয়া গিয়াছে, সেই চিরন্তন খাতেই জীবনের স্রোত একটানা বহিয়া চলিতেছে। ইহাই হইল আমাদের জীবন, সুন্দরও বলা যায়, আবার কুৎসিতও বলা যায়, যে যেভাবে গ্রহণ করে।

বয়স যত বাড়িতেছে, প্রেয়সীর প্রতি প্রেমও তত গাঢ় হইতেছে। প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষই নিজেদের এলিক্সির অফ লাইফের একটা বাঁধা ফর্মুলা আবিষ্কার করিয়া নির্বিবাদে কালাতিপাত করিতেছে। আমারও ফর্মুলা আমি পাইয়াছি। কিন্তু সেটা প্রকাশ করিয়া দেওয়া কি ঠিক হইবে? গল্প লিখিবার উদ্দেশ্য অর্বাচীনকে শিক্ষা দেওয়া। সেই কাজের ভার যখন লইয়াছি, তখন গোপন করিব না।

প্রারম্ভে যেমনই হউক, বয়সে একটু পাক ধরিলেই প্রত্যেক বিবাহিত-বিবাহিতার জীবন দুইটি ভাগে ভাগ হইয়া যায়, এক—পরস্পর যখন কাছে থাকে—

> কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষচূড়ে
> বাঁধি নীড় থাকে সুখে—

[illegible] সঙ্গে।

এমন স্বামী, লোকভেদে বিভিন্ন হইতে পারে, কোনও স্বামী সওদাগরী আপিস হইতে সন্ধ্যায় ফিরিয়া স্ত্রীর সযত্নরক্ষিত গামছা-সাবানের সাহায্যে হাতমুখ প্রক্ষালন করিয়া জলখাবার খাইয়া বেড়াইতে বাহির হয়, আবার রাত্রি আটটা-নয়টার সময় বাড়ি ফিরিয়া যেমন জোটে আহার করিয়া পান চিবাইতে চিবাইতে ও মাসিকের পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে ঘুমাইয়া পড়ে। সাধ্বী পত্নী স্বামীর পাতে আহার করিয়া পরের দিন ভোরের বাজার ব্যবস্থা ঠিক করিয়া হাতপাখা লইয়া স্বামীকে ব্যজন করিতে করিতে সংসারের প্রয়োজনীয় দুই-চারিটি কথা এবং কচিৎ-কদাচিৎ মুখুজ্জেবাড়ির বউয়ের নূতন গলার হার কিংবা আর কাহারও জামার ছিটের বর্ণনা দিতে দিতে স্বামীর পাশে শুইয়া পড়ে। হাতের পাখা ক্রমশ ভারী হইয়া আসিতে থাকে। পরের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন।

কোন স্বামীর জীবনে আহার্য ও আরামই বড় হইয়া উঠে, স্ত্রীর অন্য কোনও বিশেষ সত্তা নাই, ভাল আহার ও ভাল শয়নের ব্যবস্থা করিলেই স্বামী সন্তুষ্ট। লাউয়ের তরকারিতে নুন বেশি হইলেই কিংবা বুটের ডালটা ধরিয়া গেলেই এই সকল স্বামী স্ত্রীর কর্তব্যহানির অনুযোগ করিয়া থাকে। প্রভাতে উঠিয়া গরম চায়ের সহিত মুলকো লুচি ও কুমড়োর ছোকা পরিপাটি করিয়া আহার করিয়া ইহারা নিজেরাই বাজার করিতে ছোটে। বাজার করাটাই ইহাদের বিলাস। সস্তায় ভাল মাছ আনিতে পারিলে ইহারা যে আনন্দ পায়, ভাল একটি কবিতা লিখিয়াও কবিরা সেরূপ আনন্দ পান না। কোথায় ভাল পাঁপর পাওয়া যায়, কোথায় পাঁঠার মাংস কচি, গঙ্গার ইলিশ কিনিতে হইলে কোন্ বাজারে যাওয়া দরকার, ইহারা সে খবর ভাল করিয়াই রাখিয়া থাকে।

রান্নাঘরের ভিতর দিয়াই স্বামী ও স্ত্রীর প্রেম গাঢ় হইতে থাকে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সুখ-দুঃখের কথা যে হয় না তাহা নয়, হয়তো মুখোমুখি বসিয়াও থাকে—স্বামী বলে, মেসের বাবুদের জ্বালায় কি কিছু কেনবার জো আছে! আজ পাকা সোনামাছের দরটা এক টাকা ছ আনায় নামিয়েছিলাম, মেসের এক নবাব-পুত্তুর এসে পাঁচ সিকে সেরে পাঁচ সের মাছ নিয়ে চ'লে গেল। সংসার তো করতে হয় না, তা'লে বাছাধনরা টের পেতেন। স্ত্রী বলে, কাল কিছু মুগডাল এনো, ও-বাড়ির সেজো-বউয়ের কাছে মুগডালের সন্দেশ করতে শিখেছি। ছাদে জ্যোৎস্না কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিতে থাকে, খাঁচায় পোষা কোকিল শুধু ভুল করিয়া ডাকিয়া সারা হয়।

কোনও স্বামী-স্ত্রী চাকর বামুন ও আয়ার হাতে খাওয়া শোওয়া ও সন্তান-প্রতিপালনের দায়িত্ব ছাড়িয়া দিয়া সন্ধ্যার পর গ্রামোফোনে বা রেডিওতে গান শুনিয়া প্রেমচর্চা করে, বায়োস্কোপে গিয়া বায়োস্কোপের নায়ক-নায়িকাকে পরস্পর চুম্বন করিতে দেখিয়া চুমু খাইবার ইচ্ছা অনুভব করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, ফিটনে চাপিয়া মোটরে চাপার স্বপ্ন দেখে এবং সপ্তাহে একদিন রেড রোডের ধারে বেড়াইয়া বিবাহিত জীবনের চরমতম সাধ মিটাইয়া লয়। ভাল-কাপড়-জামা-পরা ফিটফাট ছেলেমেয়েকে মধ্যস্থ রাখিয়া ইহাদের প্রেম বিকশিত হয়; আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব বাড়িতে বেড়াইতে আসিলে তাহাদিগকে জানালার পরদা, দেওয়ালের ছবি, চীনামাটির বাসন, বিলাতী পুতুল, বিছানা মশারি দেখাইয়া নূতন রেকর্ড শুনাইয়া অথবা অ্যাল্‌বামে সজ্জিত খোকার নূতন তোলা ফোটোগ্রাফ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বিবাহিত জীবনে যে ইহারা সুখী, নানাভাবে তাহাই প্রকাশ করিয়া দেয়।

ইহারই ঊর্ধ্বতন স্তরের যাহারা, তাহাদের কথা নাই বলিলাম।

তাহাদের প্রেম ড্রইং-রুমে, মোটরে, ফার্স্টক্লাস রিজার্ভ ট্রেনে, দার্জিলিঙে, ওয়ালটারে অথবা জাহাজের কেবিনে। ইহাদের প্রেম নাইট-গাউনে, ইলেকট্রিক ফ্যানে, পিয়ানোর টুংটাঙে।

আমি ও আমার প্রেয়সী গৃহিণী পরস্পর একত্র থাকিয়া যখন সংসার-যাত্রা নির্বাহ করি, তখন উপরোক্ত যে কোন একটি শ্রেণীর জীবই হইয়া যাই—খুঁটিনাটিতে কিছু তফাত থাকিতে পারে। কবিতা গল্প উপন্যাস লিখি, মাসিকে ছাপাইয়াও থাকি; কিন্তু সেগুলি মোটেই সর্বস্বত্ব-সংরক্ষিত নয়। আমি আমার গৃহিণীর এতই পরিচিত (অন্তত তিনি তাহাই ভাবেন) যে, আমার লেখায় নূতন কিছু পাইবেন না, এই আশঙ্কায় তিনি সেগুলি পড়িতে পারেন না। আমার স্ত্রী ভাল গাহিতে পারেন। বিবাহের পূর্বে তাঁহার গান শুনিয়া আমি পাগল হইতাম, বিবাহের পরে তাঁহার গানে সে উন্মাদনা অনুভব করি নাই। নিস্তব্ধ মধ্যাহ্নে আমার অবর্তমানে তিনি হয়তো মনের আবেগে

ওরে সাবধানী পথিক, বারেক

পথ ভুলে মর্ ফিরে—

গাহিয়া পাড়ার বাতাস করুণ করিয়া তোলেন, কিন্তু আমার কাছে তাঁহার সেই আবেগ রুদ্ধ হইয়া যায়। ভাবিতে বসি, কেন এমন হয়! একটা কারণও আমি মনে মনে বাহির করিয়াছি। Idea of possession—অধিকারের ভাব বা স্বামিত্বের ভাবটাই পৃথিবীতে মারাত্মক। যে সকল বই আমার নিজের আছে, আজ পর্যন্ত সেগুলি ভাল করিয়া পড়িয়া উঠিতে পারিলাম না। পরের কাছ হইতে বই ধার করিয়া আনিয়া ভাল করিয়া পড়িয়াছি, মজিয়াছি। এও বুঝি সেই রকম। স্ত্রী মনে করেন, স্বামীর কবিতা, ও তো আমারই সম্পত্তি, সেই আনন্দটুকুই যথেষ্ট, পড়িয়া আনন্দ পাইবার প্রয়োজন কি? স্বামী ভাবেন, স্ত্রীর

[illegible]? সে তো একান্ত আমারই—ইহা অপেক্ষা অন্যের [illegible] লাভ আছে। এই স্বামিত্বের ভাব হইতেই পৃথিবীতে সকল পরিবারে ভয়াবহ ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হইতেছে। বিবাহের পূর্বে যাহারা একান্ত আত্মীয় ছিল, বিবাহের পরে তাহারা বিচ্ছিন্ন ও অপরিচিত থাকিয়া যাইতেছে।

কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিলাম, বিবাহিত জীবনের অবস্থা বর্ণনা করিতে বসিয়া দর্শনের অবতারণা করিলাম। আসলে বস্তুটা এত ডেলিকেট যে, আমি কিছুতেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া কিছু বলিতে পারিতেছি না। পৃথিবীতে অধিকাংশ স্বামী-স্ত্রীই হয়তো সুখে আছেন, ট্র্যাজেডির ভাবটা জাগিয়াছে আমার মনে। আমি তাঁহাদের জীবনেও তাহা আরোপ করিতেছি।

কিন্তু সত্যই কি তাই? ট্র্যাজেডিই যদি না থাকিবে, তবে এত মিথ্যার প্রয়োজন কেন? সামান্য স্খলন-ত্রুটিতে এত ক্রোধ কেন? রামের স্ত্রী আমাকে হয়তো মোহাবিষ্ট করিয়াছে, তাহার স্বর যদি কখনও কর্কশ হইয়া উঠে, কোনও ইতর কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইতে শুনি, আমার রাগ হয় না কেন? অথচ নিজের স্ত্রী সম্বন্ধে নেশা কাটিয়া যায় বলিয়াই দোষগুলি চোখে পড়ে। নেশার অভাবটাই মিথ্যা দিয়া ঢাকিতে হয়। যেদিন আমার মনে অধিকারের ভাব, অর্থাৎ আমি আমার স্ত্রীর স্বামী হইলাম—এই ভাব জাগ্রত হয়, সেদিন হইতেই বিবাহের মন্ত্রের অবমাননা শুরু হয়।

কিন্তু এমনও শোনা যায় যে, স্ত্রীর জন্য দুই সহোদর ভাইয়ে পৃথক হইয়া গেল, ছেলে বাপকে ছাড়িয়া ভিন্ন সংসার পাতিল। সকল স্থলেই যে স্ত্রীরা দোষী এমন নাও হইতে পারে, কিন্তু সত্যই যেখানে স্ত্রীরা

দেবী, সেখানে তাহারা ভাগ্যবতী। তাহাদের স্বামীদের অক্ষয় প্রেম, এক আনার ডাক-টিকিট পর্যন্ত তাহাদের অধঃপতন হয় না।

নিজের কথা বলিতেছিলাম, গল্প বলিতেছিলাম, তথ্যে আসিয়া পৌঁছিলাম। তথ্যাংশের জন্য পাঠক মাপ করিবেন।

দ্বিতীয় অবস্থা—বিরহের অবস্থা, এই অবস্থার প্রকারভেদ নাই। বেদবর্ণিত পুরুরবা, রামায়ণে বর্ণিত রাম, মেঘদূতে বর্ণিত যক্ষ সকলেই প্রিয়াবিরহে উন্মত্ত হইয়াছেন, কাঁদিয়াছেন। রাম সীতার স্বামী ছিলেন। উর্বশী পুরুরবার এবং যক্ষপ্রিয়া যক্ষের বিবাহিতা পত্নী ছিলেন কি না জানা নাই, ইহাদিগকে স্বামী-স্ত্রী বলিয়া ধরিয়া লইলেও এ কথা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায় যে, প্রাচীনতম বিরহী পুরুরবা ও আধুনিকতম বিরহী ফণীন্দ্রনাথ সকলেই উচ্ছ্বাসের অন্তরালে গা-ঢাকা দিয়া কাজ সারিয়াছেন। মেঘদূতের যক্ষ মেঘকে দূত করিয়া যে কথা বলিতে চাহিয়াছেন, আমাদের ফণীন্দ্রনাথও এক আনার ডাক-টিকিটের সাহায্যে প্রেয়সীকে সেই কথাই বলিতে চাহিতেছেন। বিরহের অবস্থার ফাঁকি অত্যন্ত সিস্টেমেটিক এবং গতানুগতিক। যাক, আরও কিছুকাল অতীত হইয়াছে। তালতলা হইতে বাসা বদলাইয়া মানিকতলায় আসিয়াছি। এবারের বাড়িটি গৃহিণীর পছন্দ-মাফিক হইলেও প্রথম দিনই ঘর-দুয়ার জিনিস-পত্র গুছাইয়া ছাদে গিয়া তিনি ঝুনা সেনা-নায়কের মত চতুর্দিকে একবার চাহিয়া লইলেন, কোথায় কতদূরে কি ধরনের শত্রু বিরাজ করিতেছে, সমস্ত নির্ধারণ করিয়া আসিয়া তিনি গুম হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, বাড়িটা বিশ্রী।

সভয়ে জিজ্ঞাসা করিলাম, কেন? বাড়ি বদলানোর হাঙ্গামা যে কতখানি, সম্প্রতি বুঝিয়াছি।

প্রেয়সী শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, বাড়ির ছাদটা ভাল ছিল, কিন্তু ছাদে বেড়াবার জো নেই—

এ বিষয়ে বেশি ঔৎসুক্য প্রদর্শন ঠিক নহে ভাবিয়া চুপ করিয়া গেলাম। বুঝিলাম, বুদ্ধিমতী প্রেয়সী শীঘ্রই একটা বিহিত করিয়া ফেলিবেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ অশান্তি থাকিবে।

নূতন বাড়িতে শীঘ্রই পাকাপাকি রকম বাসা বাঁধিলাম। প্রতিবেশীদের সহিত প্রেয়সীর আলাপ জমিয়া গেল, কেউ দিদি, কেউ খুড়ী, কেউ মাসী। আমার চাল বিগড়াইবার সুবিধা পাইল না।

যেদিন সন্ধ্যার কিছু পূর্বে অফিস হইতে ফিরিতাম ও গায়ে ঠাণ্ডা বাতাস লাগাইবার জন্য ছাদে যাইবার ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতাম, প্রেয়সী বলিতেন, যাও না, মাঠে একটু বেড়িয়ে এস, মেয়েরা তো আর তোমাদের মত হুট ক'রে বাইরে হাওয়া খেতে বের হতে পারে না, ওই ছাদটুকুই সম্বল। তাও কি কেড়ে নেবে?

আমি বিনা বাক্যব্যয়ে চাটুজ্জেদের ছাদের উপর গুম্ফমণ্ডিত একটি যুবকের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া মাঠে বেড়াইতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতাম।

বৈশাখে বাড়ি বদলাইয়াছিলাম, পূজার ছুটি আসিয়া পড়িল। সরলা তাহার মায়ের সহিত কিছুকাল তাহার পিত্রালয়-প্রবাসী হইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিল। আমরা জনকয়েক বন্ধু মিলিয়া পুরী যাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম, সরলার নিকট প্রকাশ করি নাই। কারণ তাহাকে জানাইলে সেও সঙ্গী হইতে চাহিত। পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য, নহিলে খরচ বাড়ে, এ উক্তি সে মানিত না। সুতরাং একটু অভিমানের ভাব দেখাইয়া কিছু অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া শেষে সম্মত হইলাম।

সেদিন হাওড়া স্টেশনে প্রেয়সীকে বিদায়সম্ভাষণ জানাইয়া আসিয়া

আসিয়া একটি সুদীর্ঘ আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া ছাদে ইজিচেয়ারে বসিয়া চুরুট ধরাইলাম। নারিকেলপত্রের মর্মরধ্বনি শুনিতে শুনিতে মনটা উদাস হইয়া গেল; আকাশে মেঘের আবরণ নাই, সুনীল আকাশ, মুক্তির আনন্দে যেন হাসিতেছে। আমিও একটা অপূর্ব মুক্তির আস্বাদ অনুভব করিলাম। উত্তরের কোনও বাড়ি হইতে নারীকণ্ঠের সুমিষ্ট সঙ্গীত ভাসিয়া আসিতেছিল—

মধুর মধুর রাতি—

অনুভব করিলাম, বিবাহ করা ইস্তক জীবন ভারী হইয়া উঠিয়াছে, মনের লঘুতা হারাইয়াছি। ইজিচেয়ারে শুইয়া শুইয়া বিবাহের বিরুদ্ধে একটা প্রবন্ধ ফাঁদিয়া ফেলিলাম। মনে পড়িল, ইসাডোরা ডান্‌কান তাঁহার জীবনীতে মেয়েদের তরফ হইতে এ বিষয়ে একটা সুন্দর এবং গভীর আলোচনা করিয়াছেন। নীচে আসিয়া তাঁহার বইখানা লইয়া পড়িলাম—

No woman has ever told the whole truth of her life. The autobiographies of most famous women are a series of accounts of the outward existence, of petty details and anecdotes which give no realisation of their real life. For the great moments of joy or agony they remain strangely silent.

তিনি নিজে সর্বপ্রথমে নারীর কথা বলিতে চাহিয়াছেন—

I enquired into the marriage-laws and was indignant to learn of the slavish condition of women. I began to look enquiringly at the faces of the married women friends of my mother, and I felt on each was the mark of the green-eyed monster and the stigma of

the slave...the ethics of the marriage-code are an impossible proposition for a free-spirited woman to accede to.

পুরুষদের তরফ হইতে আমারও সেদিন বলিতে ইচ্ছা হইল যে, নারীকে বিবাহ করিয়া পুরুষও কম দাসত্ব-বন্ধন স্বীকার করে না। কোনও পুরুষ এ কথা মুখ ফুটিয়া বলিয়াছেন কি না জানি না, কিন্তু দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় আমরা প্রত্যহ প্রত্যেকে অনুভব করি যে, পুরুষ যেদিন নারীকে বিবাহ করিয়া তাহার গৃহশোভা বর্ধন করিবার জন্য আপনার গৃহে আনিয়া হাজির করিয়াছে, সেইদিনই তাহার মুক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

প্রবন্ধ খানিকটা লেখা হইতেই ভয়ানক ঘুম পাইতে লাগিল। আলো নিবাইয়া দিয়া শয্যার আশ্রয় লইতে অকস্মাৎ মনে হইল, ঘরটা ভয়ানক খালি, একেবারে শূন্য যেন। মনে হইল, শয্যা খালি—বুকের খানিকটাও খালি-খালি ঠেকিতে লাগিল। আমি ভাল বিছানায় শুইতে ভালবাসি, প্রেয়সী তাহা জানিতেন। বিছানাটি তিনি অতীব যত্নের সহিত প্রস্তুত করিতেন। আজ মনে হইল, বিছানায় যেন ধুলা কিচকিচ করিতেছে—পিপীলিকারা সারবন্দী হইয়া চলাফেরা করিতেছে। ঘুম আসিল না। একটা অতি-পরিচিত বধূর স্পর্শের জন্য চিত্ত লালায়িত হইয়া উঠিল। মনে হইল, মিথ্যা প্রবন্ধ, মিথ্যা ইসাডোরা-ডান্‌কানের জীবনী। তারপর কখন ঘুমাইয়া পড়িয়া প্রেয়সীকে স্বপ্নে দেখিতে লাগিলাম।

পরদিন দল বাঁধিয়া হৈ-হৈ রৈ-রৈ করিতে করিতে পুরী যাত্রা করিলাম। সমুদ্র ও মন্দির দেখার ক্ষুধা মিটিতে একদিনের অধিক দেরি হইল না। সমুদ্রতীরের হোটেলে সমুদ্রের দিকে পিছন ফিরিয়া কলিকাতার হোটেল-বাসী আমরা তাস খেলিয়া সময় কাটাইতে লাগিলাম, এবং রবিঠাকুর

বিশ্বাস করিবেন না, পাঁচদিনের দিন পুরী ত্যাগ করিয়া পুনরায় কলিকাতায় দর্শন দিলাম। আসিবার সময় নিজের জন্ত কিছু সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্তি হইল না, প্রেয়সীর জন্ত কর্পূরের মালা, জগন্নাথের পট ও মহাপ্রসাদ এবং সমুদ্রের কড়ি ও ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া আনিলাম।

কলিকাতায় ফিরিয়া সপ্তাহখানেকের মধ্যে নূতন করিয়া প্রেমে পড়িলাম। এখনও সেই বাড়িতে বাস করিতেছি বলিয়া ভরসা করিয়া নাম ঠিকানা দিতে পারিতেছি না, কিন্তু এবারকার প্রেমটা যেন একটু বেশি গাঢ়, বেশি গভীর মনে হইল।

নূতন নায়িকার হাতের সাজা পান খাইবার লোভে তাহাদের এঁদো ঘরের নোংরা বিছানায় চিত হইয়া পড়িয়া আমার মত স্বপ্নবিলাসী কবি এবং সাহিত্যিক যে কেমন করিয়া ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দিত, তাহা ভাবিলে আজিও অবাক হই। সেই বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আসিয়া নির্বিবাদে কোলে পিঠে চাপিয়া কাপড় নোংরা করিয়া অত্যাচার করিতে লাগিল, অম্লানবদনে তাহাদের সর্দি মুছাইয়া দিয়া আদর দেখাইতে লাগিলাম। বস্তুত, বুড়া বয়সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, প্রেমের পথ কণ্টকাকীর্ণ।

নেশায় এমন মত্ত হইয়াছিলাম যে, প্রেয়সীকে সপ্তাহে একখানি চিঠি লিখিবার সময়ও কষ্টে করিয়া উঠিতে পারিতাম। প্রেমচর্চায় নিত্যনূতন পন্থা আবিষ্কারের চিন্তায় মশগুল থাকিয়া প্রেয়সীকে লিখিতাম—

সত্যি সখি, আর পারি না। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা লোকে বোঝে না। তুমি কাছে না থাকলে আমার কি দুর্দশা হয়, তুমি কল্পনাও করতে পারবে না। এক লাইন কিছু লিখতে পারছি না। বিছানায় চুপচাপ প'ড়ে আছি আর ভাবছি, কবে তুমি এসে আমার এই ছোট্ট ঘরখানি ভ'রে তুলবে। আকাশ আমায় শত্রুতা করছে, বাতাস

অত্যাচার শুরু করেছে, নারকেলবাগানের পাড়াশুদ্ধো পর্যন্ত হই-
করতে ছাড়ছে না।

আর কতদিন তুমি বাইরে থাকবে? একদিনের ছুটিও পাচ্ছি
যে, আমার নয়িকে দেখে আসব। ভাবছি, এ ছাই চাকরি ছেড়ে দে
তারপর এক আনার একটি ডাক-টিকিট সংগ্রহ করার অপেক্ষামাত্র
বিবাহিত জীবনের বিরহকালের কর্তব্য শেষ!

এদিকে বেকার আইবুড়ো বন্ধুর দল খালি পাইয়া আমার বাড়ি
এমন অবস্থা করিল যে, ভয় হইতে লাগিল, পাড়ার লোকের নালিশে
বাড়িওয়ালা বুঝি নোটিসই দেয়! চা আর চুরুট, হল্লা গান। আমি
থাকি আর নাই থাকি, সমানে আড্ডা চলিতে লাগিল। বিশেষ কার্য
পাশের বাড়িতে গিয়া আমি যখন ছেঁড়া তেলচিটচিটে মাদুরে শুই
কড়ি-বরগা সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছি, শুনিতে পাইতাম, আমার শোবা
ঘরে বন্ধুজন সমবেত হইয়া কোনও দুর্বল মুহূর্তে রচিত আমার
একটি ইংরেজী গান তারস্বরে গাহিতেছে—

Oh, had our wives
Known the lives
  In separation we are leading,
The wild oats we sow,
If they should know,
  How 'll they love us, when readin
The letters we write
From love's high height—

আমার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইবার উপক্রম হইত। প্রেমের
অবস্থা এবং বন্ধুদের অত্যাচার ক্রমশ সঙিন হইতে লাগিল। জীবনে
কখনও নিজের বাড়ির বাজার করি নাই, আমার নায়িকার বাড়ির
বাজার করিতে গিয়া নাকাল হইতে লাগিলাম। শেষকালে যখন
এমন অবস্থা হইল যে, এক আনার ডাক-টিকিটও খুঁজিয়া পাওয়া যায়

তখন একবার কঠিন রোগে শয্যাশায়ী হইলাম। কোথায় বন্ধুজন, কোথায় নূতন প্রেমের নায়িকা! চাকরে শিয়রে বসিয়া বাতাস করে, পাশের বাড়ি ডিঙাইয়া বহুদূরে ছুটিয়া যায়। মধুর স্নেহের স্পর্শের জন্ত ললাট ঘামিয়া উঠে, ম্লানমুখী প্রেয়সীকে পাশে দেখিবার জন্ত মন কাঁদিতে থাকে।

প্রেয়সীর চিঠিতে ব্যাকুলতা, আমার কি হইয়াছে, শরীরটা কেমন আছে, এক ছত্র লিখিয়াও কি জানাইতে পারি না! শিশিরার্দ্র শিউলিফুলের কথা তাহাতে নাই, আকাশের নীলিমার কোনও আভাস নাই—তবু ভাল লাগে।

জ্বরের ঘোরে অজ্ঞান হইয়া থাকিতাম। পাশের বাড়ির কর্তা আমাকে দেখিতে আসিয়া আমার অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইলেন এবং কখন তিনি তাঁহার কন্যাকে দিয়া এক আনার ডাক-টিকিটের সাহায্যে আমার গৃহিণীকে সংবাদ দিলেন, জানিতে পারি নাই। তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে নিতান্ত অসুস্থ দেহে অনুভব করিলাম, আমার অন্ধকার গৃহ হাসিতেছে। পথক্লান্ত প্রেয়সী আমার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িয়া আমার ললাটের উত্তাপ পরীক্ষা করিতেছেন। অত্যন্ত আরামে 'আঃ' বলিয়া তাঁহার একটি হাত আমার শীর্ণ হাতের মুঠির মধ্যে ধরিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পাশ ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়িলাম।

যখন জাগিয়া উঠিলাম, তখন প্রথমেই নজরে পড়িল, সদ্যস্নাতা আলুলায়িতকুন্তলা প্রেয়সী মেঝেয় বসিয়া অত্যন্ত যত্নে সাবুর সহিত লেবুর রস মিশাইতেছেন। আমার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে।

সেই দিন হইতে বুঝিতে পারিয়াছি, মানুষ দার্শনিক নহে, মানুষ মানুষই।

শেষ